প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৬

গৌরচন্দ্রিকা

'নক্‌শা' একটি বিশেষ সাহিত্যিক 'কর্ম'। আরবি ভাষা থেকে শব্দটি বাঙলায় এসেছে। উনবিংশ শতকেই শব্দটি সাধারণ কথ্য ভাষায় হাস্য-কৌতুক রঙ্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। এখনও সাধারণ মানুষ এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করে। 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা' বইতেই প্রথম নক্‌শা শব্দটি লিখিত সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, তার আগে এটির লিখিত প্রয়োগ সম্ভবত হয়নি। 'হুতোম' তখনকার উত্তর কলকাতার সাধারণ কথাবার্তার ভাষাতে তাঁর বই লিখেছিলেন, কাজেই কথ্য ভাষাতে যে অর্থে বাঙালী করত, সেই অর্থেই তিনি শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয়ত, 'হুতোম' যে হেঁয়ালিমূলক আরবি বাক্যটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রে প্রদান করেছিলেন, তার থেকে অনুমান হয়, আরবি 'নক্‌শা' শব্দটিও এক বিশেষ অর্থে তাঁর কাছে পরিচিত ছিল।

বাংলা সাহিত্যে 'নক্‌শা শব্দটি কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'নক্‌শা' এই বানান করা হয়েছে। 'নক্‌শা' বানান লিখে হুতোম ঠিক কাজই করেছিলেন।

বাঙলা নক্‌শা প্রধানত সাময়িক পত্রিকাকে ভিত্তি করেই গড়ে বেড়ে উঠেছে, যদিও অনেক নক্‌শা স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপেও লিখিত হয়েছে। সমসাময়িক কালের নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ঘটনাই নক্‌শার মূল বিষয়। এই জন্যে নক্‌শা একদিকে সাংবাদিকতা অপরদিকে সমসাময়িকতার প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত একটি সাহিত্য সামগ্রী।

সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গুল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন২ নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পব্লিক ডিনরের্ সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, গর্জ্জন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এবং পথিকের ভীতি-বিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন ;—

"সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ! এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ!

মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে যে অঙ্গ যে যে অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে একপ্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে, এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কাল প্রভাবে লাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ আপন আপন মুখ চাটিলেন) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে। অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান বা শৃঙ্গাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ সংসার ব্যাঘ্রজাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা রক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ দন্ত শৃঙ্গাদি বর্জ্জিত, গমনে-মন্থর এবং কোমল প্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কিজন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাঘ্রজাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্যজাতিকে বড় ভালবাসি। দৃষ্টি মাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি

দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ। একজাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রা নামে একজন উদ্ধত-স্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষয় কর্ম্মটা কি" ?

বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, "বিষয় কর্ম্ম আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষণকে বিষয় কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয় কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্তলোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয় কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি ; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা ; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহৃত হয় না ; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ড প্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা ; যে দস্যুর দণ্ড প্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা, যখন সভ্য সমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নাম বৈচিত্র্য স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই ; এক উদর-পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ করুন। মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।"

মহাদংষ্ট্রা পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু ?"

বৃহল্লাঙ্গুল কহিলেন, "তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত ; মনুষ্যদিগেরই হৃদয় শোণিত পান করিত ; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মারা গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বাধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তর মধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক,

আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর বাসস্থান মাতলায় বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশ-মণ্ডপ মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদানার্থ মণ্ডপমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশমাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতকগুলি মনুষ্য তৎপরে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য, পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার আকারে প্রশংসা করিতেছিল, কেহ আমার দন্তের কেহ নখের, কেহ লাঙ্গুলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে আমাকে সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভরে আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমল-শ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এজন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটরোহণ করিয়া, ছাগ মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। এবং লৌহদণ্ডাদি ভূষিত এক সুরম্য গৃহ মধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগমেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশবিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ, সুন্দরবন। আমি কি কখনো তোমায় ভুলিতে পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত তখন আমি ছাগ মাংস ত্যাগ করিতাম, মেষ মাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্মমাত্র ত্যাগ করিতাম) —এবং সর্ব্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম।

হে জন্মভূমি! যতদিন আমি তোমাকে দেখি নাই, ততদিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই, দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব? পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।"

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রু পতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ে প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেক্‌চরর তখন ধৈর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুল ক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য একদিন আমার মন্দির-মার্জ্জনান্তে, দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্য চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আমার কথায় আপনারা বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ, মনুষ্য সম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করিনা। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীবী হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐরূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐ রূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব আমার বোধহয়, তাহারা যেসকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যজাতি তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।*

---

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেম্‌স মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা রূঢ় ভাষা। বস্তুত এই ব্যাঘ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। —সম্পাদক।

মনুষ্যজন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী এবং ফলমূলও আহার করে। বড় বড় গাছ খাইতে পারে না; ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহার চাষ করিয়া ঘিরিয়া রাখে। ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে খেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা ফলমূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কিনা, বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান মনুষ্যেরা বহুযত্নে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? এরূপ আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখেও শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, 'দেশটা উচ্ছন্ন গেল,—যত সায়েব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে'। সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই'? আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতিযত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে, অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জনাদি করিয়া দেয়। বোধহয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। গো সম্পর্কে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে; তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্বকালের ব্যাঘ্র পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোনকালে গোরুর বৎস ছিল। আমি ততদূর বলিনা, কিন্তু এই কারণেই বোধকরি, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল এমনকি পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবাপ্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধহয়, বংশমর্য্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ।

মনুষ্য চরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। এতদ্ভিন্ন, তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমেই তাহা বিবৃত করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর দূরে, একটি হরিণ শিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধ পাঠক কিছু ক্ষুন্ন হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এক বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়াইয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলোত্থিত করিয়া, যে যেদিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেকৃচররও এই বিদ্যার্থীদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে সেদিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

পরে তাহারা অন্য একদিন, সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সেদিন নির্ব্বিঘ্নে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ করিব।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ, ১২৭৯। পৃষ্ঠা ৫২ হইতে ৫৯।

২

ইংরাজ স্তোত্র

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১ ॥

তুমি নানা গুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্ত বিশিষ্ট, বহুল সম্পদযুক্ত অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২ ॥

তুমি হর্ত্তা—শত্রুদলের ; তুমি কর্ত্তা—আইনাদির ; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির। অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৩ ॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী,—শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা চাম্‌চে ধারী ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৪ ॥

তুমি একরূপে রাজপুরী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর ; আর একরূপে পণ্য বীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর : আর একরূপে কাছাড়ে চার চাষ কর ; অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৫ ॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার গ্রন্থাদিতে প্রকাশ : তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্রাদিতে প্রকাশ।—অতএব হে ত্রিগুণাত্মক ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৬ ॥

তুমি আছ, এই জন্যই তুমি সৎ। তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিত ; এবং তুমি উমেদারবর্গের আনন্দ ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ তোমাকে প্রণাম করি। ৭ ॥

তুমি ব্রহ্মা, কেননা তুমি প্রজাপতি ; তুমি বিষ্ণু, কেননা কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন ; এবং তুমি মহেশ্বর, কেননা তোমার গৃহিণী গৌরী। অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৮ ॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র ; তুমি চন্দ্র, ইন্‌কম টেক্‌শ তোমার কলঙ্ক ; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন ; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৯ ॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে ; তুমিই অগ্নি, কেননা সব খাও , তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের। ১০ ॥

তুমি বেদ, আর ঋক্‌যজুষাদি মানিনা ; তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছি ; তুমি দর্শন—ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ ! তোমাকে প্রণাম করি। ১১ ॥

হে শ্বেতকান্ত ! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদ-শুভ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১২ ॥

তোমার হরিতকপিষ পিঙ্গল লোহিত কৃষ্ণশুভ্রাদি নানা বর্ণ শোভিত, বস্ত্র বঞ্চিত, ভল্লুক মেদ মার্জ্জিত, কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব ; অতএব হে ইংরাজ আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩ ॥

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া ; পেণ্টুলন সেই ধড়া,—আর হুইপ যেন সেই মোহন মুরালী—অতএব হে গোপীবল্লভ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪ ॥

হে বরদ ! আমাকে বর দাও। আমি শাম্‌লা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫ ॥

হে শুভঙ্কর ! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোষামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব। তোমার মন রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬ ॥

হে মানদ ! আমাকে টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও ;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭ ॥

হে ভক্তবৎসল ! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোক মণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্ত লিখিত দুই-একখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি—অতএব হে ইংরাজ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮ ॥

হে অন্তর্যামিন ! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি ; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি ; তুমি বিদ্বান বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি। অতএব হে ইংরাজ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৯ ॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সারি করিব, তোমার প্রীত্যর্থে স্কুল করিব ; তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০ ॥

হে সৌম্য ! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চসমা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২১ ॥

হে মিষ্ট ভাষিণ ! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব ; পৈতৃকধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব, বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২ ॥

হে সু ভোজক ! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাউরুটি খাই, নিষিদ্ধ মাংস নাহলে আমার ভোজন হয় না ; কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ ! আমাকে চরণে রাখিও : আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৩ ॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব ; কুলীনের জাতি মারিব ; জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেননা তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৭ ॥

হে সর্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও ; আমার সর্ব বাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫ ॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্ হোমে নিমন্ত্রণ কর ; বড় বড় কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জষ্টিস্ কর, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬।

আমার স্পীচ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে সমস্ত মুসলমান সমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭ ॥

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন! আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। ২৮।

বঙ্গদর্শন। অগ্রহায়ণ, ১২৭৯। পৃষ্ঠা ৫০১ হইতে ৫০৯।

৩

বাবু

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর, আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি আহার নিদ্রা-কুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চষমা-অলঙ্কৃত, উদার চরিত্র, বহুভাষী, সন্দেসপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্, যাহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিত কুন্তল এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষা-পারদর্শী, মাতৃভাষা-বিরোধী, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম;—হস্ত দুর্বল হইলেও লেখনী ধারণে এবং বেতন গ্রহণে সুপটু;—চর্ম কোমল হইলেও সাগরপার নির্মিত দ্রব্য বিশেষের প্রহার সহিষ্ণু; যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষের রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট বাবু অর্থে কেরানী বা বাজার সরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকট 'বাবু' শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট 'বাবু' অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক, কেবল বাবু জন্ম-নির্বাহাভিলাষী কতকগুলি মনুষ্য জন্মিবেন। আমি কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার এই মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল হইবে। তিনি গো জন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফটিক পাত্র ইঁহাদিগের গণ্ডুষ। অগ্নি ইঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—'তামাকু' এবং 'চুরুট' নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া দিনরাত্র ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইঁহাদিগের যেমন মুখে আগুন, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন, এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। ইঁহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি "মদন আগুন" এবং "মনাগুণ" রূপে পরিণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মত ইঁহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন। বায়ুকে ইঁহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্য্যের নাম রাখিবেন, "বায়ু সেবন"। চন্দ্র ইঁহাদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষ রাত্রে শুক্ল পক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য্য ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইঁহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমারদিগকে ইঁহারা পূজা করিবেন। অশ্বিনী কুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে "আস্তাবল।"

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সংগীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্যে শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই

বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে সর্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু। যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্মে জড় ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করিবেন এবং পাঁঠার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস এবং আহার কদলী দগ্ধ, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজা দিসৃক্ষ, এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলাপটু, তিনিই বাবু। হে কুরুকুল ভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁরাও অনন্ত শয্যাশায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁদিগেরও দশ অবতার— যথা কেরানী, মাষ্টর, ষ্টেশন মাষ্টর, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমিদার, এবং নিষ্কর্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁরা সকল অবতারেই অমিতবল পরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরানী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টর অবতারে বধ্য ছাত্র, ষ্টেশন মাষ্টর অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলা প্রত্যাশী পুরোহিত; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বনিক্ ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকীল অবতারে বধ্য মোয়াক্কল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমীদার অবতারে বধ্য প্রজা; এবং নিষ্কর্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

মহাশয়! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে এক গুণ, মুখে দশ গুণ পৃষ্ঠে শত গুণ, এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, এবং বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা বেদ দেশী সম্বাদ পত্র, এবং তীর্থ "নেশ্যানাল থিয়েটর," তিনিই বাবু। যিনি মিশনরির নিকট খ্রীষ্টীয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে শুধু জল খান, বন্ধু গৃহে মদ খান, বেশ্যা গৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রা" কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।

হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস

জন্মিবে, যে আমরা তাম্বুল চর্বন করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনি পুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন্।

বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন, ১২৭৯। পৃষ্ঠা ৬৯২ হইতে ৬৯৫।

৪

সুবর্ণ গোলক

কৈলাস শিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দ্দূল চর্মাসনে বসিয়া হরপার্বতী পাশা খেলিতেছিলেন। বাজি একটি স্বর্ণ গোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্র মন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু,—প্রমাণ পৃথিবীতে তাঁহার তিনদিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়া, কেননা তিনিই আদ্যাশক্তি। মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোহা বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চন গোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া পঞ্চানন, ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?"

উমা কহিলেন, "প্রভো! আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু এবং আমি এই তিনজনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতেছি তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলীর বলেই ঘটিবে। কাঞ্চন গোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গ দোষে

লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর।

কালীকান্ত বসু বড়বাবু। বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল পুনর্বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্তবাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্তীর গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমান্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্তবাবু দেখিলেন একটি স্বর্ণ গোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, "এটা সোনার দেখিতেছি। কেহ হারাইয়া থাকিবে। যদি কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ্।"

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমান্টো নামাইল। পরে কালীকান্তবাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমান্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্তবাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে রামা।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা?" রামা বলিল, "তুই বড় বে-আদব, দেখিস্ যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়া বে-আদবি করিস্ না। তারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বে-আদবি করিতে পারি?"

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণ গোলকের কি গুণ এ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্ত বিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু; কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর। কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে কালীকান্তবাবু।"

কালীকান্তবাবু যখন শ্বশুরবাড়ী পৌছিলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপুরে কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও

খানসামাজি, তোম্ হুঁয়া মৎ বইঠিও—তোম্ হামরা পাশ আও।" শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে, "যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোর আপনার কাজ করগে।"

দ্বারবান পোর্টম্যাণ্টো নামাইয়া দিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ানজি, বাবুকে অমন করিয়া অপমান করিও না। উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান জামাইবাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, যেখানে জামাইবাবুই "ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড়লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্বাদ করিয়া বলিল, "গোলাম কি কসুর মাফ কিজিয়ে!" রামা কহিল, "আচ্ছা তামাকু ভেজ দেও।"

শ্বশুরবাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, "দাদাঠাকুর এ কি এ?" কালীকান্ত কহিল, "ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি?"

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্তাকে সম্বাদ দিল, "জামাইবাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।"

কর্তা নীলরতন বাবু শীঘ্র বহির্ব্বাটিতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, "সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে—তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতেছি।

নীলরতন বাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথাবার্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, "বাপরে আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি। আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তারপর আমার হবে এখন। আমি, মা ঠাকরুণ, আপনাদের খাচ্ছিইত।"

"মাঠাকরুণ" শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন, আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বইত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন মানুষ চিনতে পারেন—

কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।” অতএব বিন্দী চাকরানী জামাইবাবুর ওপর বড় খুশী হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, যে “জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল সঙ্গের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও তবে জামাই খাবেন।”

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, “সে উপরি লোক তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান যাইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা, তার জায়গা হউক, বাহিরে; আর জামাইয়ের জায়গা হউক, ভিতরে। গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।” রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল “একি অলৌকিকতা! এদিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইল বলিল, “আমাকে ঘরের ভিতরে কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই। শুনিয়া শ্যালীরা বলিল, “বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।” কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, “আজ্ঞে আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?” একজন প্রাচীনা ঠাকুরানীদিদি বলিল, “আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য তার কাছে চল।” এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল; কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া, চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, “ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট্ শিখিয়া আসিয়াছ?” শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, “আজ্ঞে আমার সঙ্গে এমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি মুনিব।”

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, “তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যতদিন আমার বয়স আছে ততদিন এ সম্পর্কেই থাকিবে। এখন জল খাও।”

কালীকান্ত মনে করিল, “বাবা, এর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখ্‌তে পাই! তা আমার সরাই ভাল।” এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পালাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল, বলিল, “ওরে আমার সোনার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মানিক! আমার কাছে থেকে আর পলাতে হয় না।” এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিগে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই বৌঠাকুরানী, আপনার মাও দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।" কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে চরিত্রের লোক আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।"

কালীকান্ত বলিল, "যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন—আমায় ছাড়িয়া দিন।"

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়, মনে করিল, যে এ একতর নূতন রসিকতা বটে। বলিল, "প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।" এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণ মাত্র, কালীকান্ত সর্বনাশ হইল মনে করিয়া "বাবারে, গেলামরে, এগোরে, আমায় মেরে ফেল্লেরে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়াইয়া আইল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া, কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লা কামী—জামাই অমন করে উঠলো কেন? তুই কি মেরেছিস?"

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্মপীড়িতা হইয়া কহিল, "মারিব কেন। আমি মারিব কেন—আমার যেমন পোড়া কপাল!" ক্রমে ক্রমে স্বর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল— "আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করিয়াছে—" বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, "হাঁ তুই মেরেছিস্ নহিলে অমন কোরে কাতরাবে কেন?" এই বলিয়া সকলে, কামকে "পাপিষ্ঠা" "ডাইনী" "রাক্ষসী" ইত্যাদি কথায় ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভৎর্সিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল, যে বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরত্ন বাবু স্বয়ং এবং দ্বারবান্ ও উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে; কিল, লাথি, চড়, চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল কহিতেছে, "ছেড়েদেরে বাবারে জামাই মারে, এমন কথন শুনি নাই। আমার কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী করতে হবে।" নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাকরাণী হাসিতেছে, সে সর্বদা কালীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত

করিত, সে রামচাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্তবাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "কি সর্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।" ইহা দেখিয়া নীলরত্নবাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, "তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্—মার বেটাকে জুতো"। এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দোষী রামার উপর প্রহার বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণ গোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাক্‌রাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরত্নবাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ওমিন্সে চোর! দেখুন ও একটা সোণার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।" "দেখি" বলিয়া নীলরত্নবাবু স্বর্ণ গোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন; তরঙ্গ ও মাথার কাপড় খুলিয়া,, কোচা করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগি বলিতেছিস্?" উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরত্নবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন দেখি কর্ত্তা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে জুতা মারে!" কর্ত্তা তখন, একটুখানি ঘোমটা টানিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, তা মেরেছেন, মেরেছেন্, তুমি রাগ করিও না। মুনিব—মারতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব—ও ও চাকর, আমিও চাকর! আপনি এখনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না।"

শুনিয়া কর্ত্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া, বলিলেন, "মরণ আর কি, বুড়ো বয়সে মিন্সের রস দেখ? আমার চাকর—আবার তুমি কিসে হতে গেলে?"

উদ্ধব অবাক হইল, মনে করিল "আজ কি পচালের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?" উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, তুমি উহার ভিতর

যাইও না।" গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কাণে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগি, তোর হায়া নেই" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া, তরঙ্গ বলিল, "গোবরা তুইও কি পাগল হইয়াছিস না কি? যা গোরুর জাব দিগে যা।" শুনিয়া গোবর্দ্ধন তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতন বাবু বলিলেন, "যা! পোড়া কপালে মিন্সে কর্ত্তাকে ঠেঙ্গিয়া খুন করলে। এদিগে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া, "আমার গায়ে হাত তুলিস" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল।

শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। *রাম মুখোপাধ্যায় একটা স্বর্ণ গোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয় এটা কি?"*

কৈলাসে পার্বতী বলিলেন, "প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন! গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা, তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে। এদিগে রাম মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া তাহার অন্তঃপুরে গিয়া তাহার ভার্য্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্ত্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন।"

মহাদেব বলিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে; প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোক হিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবী মধ্যে প্রচারিত করিবে।

বঙ্গদর্শন। চৈত্র, ১২৮০। পৃষ্ঠা ৬১৬ হইতে ৬২২।

রামায়ণের সমালোচনা

শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজ শ্রীমন্মাহামর্কট প্রণীত

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্য গ্রন্থখানির মূল তাৎপর্য্য, বানরদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন। বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। বানরদিগের কীর্তি সম্যকরূপে বর্ণনা করা, সামান্য কবিত্বের কার্য্য নহে। গ্রন্থকার যে এতদূর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমত আমরা বলিতে পারি না; তবে তিনি যে কিয়দ্দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

রামায়ণে অনেক নীতিগর্ভ কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে কত দোষ, তাহা ইহাতে উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে। এক নির্বোধ প্রাচীন রাজার যুবতী ভার্য্যা ছিল। বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নতির জন্য, নির্বোধ বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে রাজার জ্যৈষ্ঠপুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল। জ্যৈষ্ঠপুত্রও ততোধিক মূর্খ; আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। তা, একাই যাউক, তাহা নহে, আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। "পথে নারী বিবর্জিতা," এটা সামান্য কথা; ইহাও তাহার ঘটে আসিল না। তাহাতে যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিল। স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ সীতা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সীতা অন্তঃপুরে থাকিলে, এতটা ঘটিত না। সীতা দুশ্চরিত্রা হইলেও ঘরে থাকিত; বনে গিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিল; এবং অন্যের সংসর্গ সুসাধ্য হইয়াছিল, এজন্য এমত ঘটিয়াছিল। এক্ষণে যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কলহ করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

লক্ষ্মণ আর একটি গণ্ড মূর্খ। তাহার চরিত্র এরূপে চিত্রিত হইয়াছে যে, তদ্বারা লক্ষ্মণকে কর্মক্ষম বোধ হয়। মনে করিলে সে একজন বড়লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার একদিনের জন্যও সেদিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল বুদ্ধিহীনতার ফল।

আর একটি গণ্ড মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ মূর্খলোকের ইতিহাসে পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য;

রাম পত্নীকে হারাইলে আমার বন্দনীয় পূর্বপুরুষ তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতাকে কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিলেন। কিন্তু মূর্খের মূর্খতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সেদিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দিন মাত্র সুখে ছিল। পরে বুদ্ধিহীনতা বশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে, সীতা খাইতে না পাইয়া রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া, রাগ করিয়া, মাটিতে পুতিয়া ফেলিল। বুদ্ধি না থাকিলে এইরূপই ঘটে। রামায়ণের মূল তাৎপর্য্য এই। ইহার প্রণেতা কে, তাহা, সহজে স্থির করা যায় না। কিম্বদন্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কিনা, তদ্বিষয়ে সংশয়। বল্মীক হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বল্মীক মধ্যে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল, ইহা কাহারও প্রণীত নহে।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কীর্ত্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাল্মীকি রামায়ণ কীর্ত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কীর্ত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কীর্ত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে; ইহা স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। "রামায়ণ" শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধহয় "রামায়ণ" শব্দটি 'রামা যবন' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল 'ব'কার লুপ্ত হইয়াছে। রামাযবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কীর্ত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীক মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত আদিরস ঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, এসকল আদিরস ঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণ রসের অতি বিরল প্রচার। বানরগণ কর্ত্তৃক সমুদ্র বন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণ রসাশ্রিত বিষয়। লক্ষ্মণ ভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে। বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে। রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে "অযোদ্ধা কাণ্ড"। গ্রন্থকার তাহা "অযোদ্ধা কাণ্ড" না লিখিয়া "অযোধ্যা কাণ্ড" লিখিয়াছেন। ইহা কি সামান্য মূর্খতা? এই একটি দোষেই এই গ্রন্থখানি সাধারণের পরিহার্য হইয়াছে।

ভরসা করি, পাঠক সকলে, এই কদর্য গ্রন্থখানি পড়া ত্যাগ করিবেন। আমি একখানি নূতন রামায়ণ রচনা করিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে তাহাই সকলে পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আমার প্রণীত রামায়ণ যে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য কেন না আমি ত বাল্মীকির ন্যায় কবিত্ববিহীন এবং বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য নহি। সেই কথা বলাই এ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অলমতি বিস্তরেণ।

মহামর্কট। পুনশ্চ। আমার প্রণীত রামায়ণ আমার ভদ্রাসন বৃক্ষের নিম্ন-শাখায় পাওয়া যায়। মূল্য এক এক ছড়া সুপক্ক মর্তমান রম্ভা।

বঙ্গদর্শন। পৌষ, ১২৭৯। পৃষ্ঠা ৫৬৯ হইতে ৫৭১

৬

কুৎসা

গ্রীষ্মকালের দীর্ঘদিনে, গৃহকার্য্য সমুদয় সুসম্পন্ন করিয়া, পাড়ার দশ বাড়ীর দশজন, কুটুম্ব সম্পর্কে আগত পাঁচজন, আর বাড়ীর কয়েকজন রমণী অপরাহ্নে অন্দর মহলের রোয়াকে বসিয়া বিস্রম্ভালাপ করিতেছেন। ইহাদের অধিকাংশই বিধবা, এবং কাহারই বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের ন্যূন নহে। আলুলায়িত কুন্তলাগণ মাথা দেখাইতেছেন, সংমিতকেশা কয়েকজন সেই মাথাগুলি—এক একজন এক একজনের—দেখিতেছেন। কেহ দীপবর্ত্তিকা প্রস্তুত করণে ব্যাপৃতা, কেহ শিশুর কন্থা সীবনে ব্যস্তা, কথার উপর কথা পড়িতেছে, নানা কথার আন্দোলন হইতেছে।—"অমুকের স্বামী অমুককে ভালবাসে না, লোকটার স্বভাব চরিত্র বড়ই মন্দ।"—"ভালবাসিবেই বা কি? ভালবাসা ত মুখের কথা নয়, যে লোকের দোষ দিলেই হইল। মাগীর ঐ ত রূপ, গুণের আবার অন্ত নাই; ভয় নাই, মুখে মিষ্ট কথা নাই; কাঠঠোকরা লোককে যেমন সুখ দেয়, আপনিও তেমনি সুখ পায়। আমরাও ত মা স্বামীর ঘর করিয়াছি, দশ পরকে লইয়া বাস

করিয়াছি, শাশুড়ী, ননদ, জা সতীনের মন যোগাইয়াছি"—(বিবাহের রাত্রিতে বাসরঘরে বক্ত্রীর স্বামী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন, সুতরাং কল্যাণীর কখনও শ্বশুরালয় দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই)—"কিন্তু এমন কোথায়ও দেখি নাই। মরুক মাগী, আমি উহাকে দুটী চক্ষে দেখিতে পারি না।"—

"যে আপনি ভাল, তাহার জগৎ ভাল। স্বামীর যদি এতই গুণ, তিনি যদি এমনিই ভাল মানুষ, তাহা হইলে কি একটা মেয়ে মানুষের মন নরম করিতে পারেন না, ভাল-বাসাইয়া লইতে পারেন না, তাহাকে ভাল করিতে পারেন না? হরগুণ নাই, বরগুণ আছে, পরের বাছার চক্ষের জল না দেখিয়া জলগ্রহণ করেন না। লজ্জার কথা বলিব কি গুণবান্ কথায় ক্ষান্ত দেন না, তাঁহার হাতও মধ্যে মধ্যে চলে। আবার ইহার উপর, যদি একদিন শেষ রাত্রিতে বাড়ী আইসেন, তবে দশ দিনের মত অন্তর্দ্ধান; কথার উক্তি করিলেই সর্বনাশ! মরুক মিনসে, গলায় দড়িও জোড়ে না!"—

"যত দোষ, নন্দ ঘোষ; কেবল পুরুষের কথা বলিলেই ত হয় না। ছি ছি! বলিতে লজ্জা, শুনিতে লজ্জা, লোকের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা। পাড়ার ভিতর বলিলেই হয়, পর নয়, অমুক মাসীই ত অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। তবু যদি এক তিল লজ্জা থাকে! চাবি শিকলি ঝুলাইয়া, আঁচলের খুঁটে রিঙ্‌ভরা চাবি দোলাইয়া মাগী যখন হাত নাড়িয়া বাহির হয়, তখন ইচ্ছা করে ঝাঁটার বাড়ীতে জন্মের মত বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিই।"

সূত্র ধরিয়া একে একে (উপস্থিত দল বাদ দিয়া) এ পাড়া, ও পাড়া, গ্রাম, বহির্গ্রাম, সর্বত্রের স্ত্রী-পুরুষের স্বভাব-চরিত্র, রূপ-গুণ, আয়-ব্যয়, খাদ্যাখাদ্যের বিচার চলিতেছে। যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহারা শান্তভাবে, বিনাপক্ষপাতে, প্রমাণের উল্লেখ বা মীমাংসার অপেক্ষা না করিয়া স্বার্থসম্পদশূন্য হইয়া স্ব স্ব হৃদয় ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া তাহার শোভা দেখাইতেছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ উঠিয়া গেলে, আবার তিনি, তাঁহার আত্মীয়স্বজন প্রসঙ্গাধীন বিচারাধীন হইতেছেন। চক্ষু আছে, অথচ এ দৃশ্য দেখে নাই এমন লোক কোথায়?

পঞ্চানন স্বর্ণকার আপন দোকানে বসিয়া রামহরি রায়ের তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর পঁয়তাল্লিশ ভরির সোনার চন্দ্রহারে ডায়মন কাটিতেছে, শিক্ষার্থী একটি বালক মুহুর্মুহু তামাক সাজিতেছে, আর পঞ্চাননের খুড়া, ঠাকুর, দাদাঠাকুর প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্র-সন্তান জলপূর্ণ গাড়ু নামাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। চন্দ্রহারের প্রসঙ্গে, রামহরি দারপরিগ্রহের তৃতীয় সংস্করণ করিয়া যে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তদ্ধেতুক যে ভোগ ভুগিতেছেন, তাহার আলোচনা

হইতেছে। রামহরির নির্বুদ্ধিতা হইতে তাহার চরিত্র, সেই চরিত্র সম্পর্কে তদীয়া প্রথমাগপত্নীর জ্যেষ্ঠপুত্রের ব্যবহার, তাহার পর সেই পুত্রের বয়স্যবর্গের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বিবিধ কথা যথাক্রমে তর্কের বিষয়ীভূত হইতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় বহুদর্শিতার গরিমা করে, সে বাতুল।

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, অথচ অযোধ্যাবাসী না জানিয়া, না শুনিয়া, তথাপি খুঁটিয়া খুঁটিয়া পরিশেষে রামচন্দ্রকে যে অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়াছিল ও জানকী সতীকে যে বিপাকে ফেলিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর, বিরলে বসিয়া কবি "বিদ্যাসুন্দর" লিখিয়াছেন পঞ্চাননের দোকানে বসিবার অবসর পান নাই বলিয়া নবাখ্যা—লেখক "বিষবৃক্ষে" মনের সাধ মিটাইয়াছেন। সম্পাদক এবং পাঠক ভারতবর্ষে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বিলাত হইতে সংবাদ পাঠাইতেছেন অমুক লর্ডের অমুক সম্পর্কীয়া এবং তাঁহার অশ্বপাল একত্র অদৃশ্য হইয়াছেন! কুৎসা নাই কোথায়? কুৎসা কে না করে?

বাস্তবিক কুৎসা কালের সীমা, স্থানের সীমা, ব্যক্তির সীমা জানে না, বা মানে না। তুমি বিজ্ঞতার ভান করিয়া গণ্ডস্ফীত করিয়া, নাসিকাগ্র কাঁপাইয়া আমার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া আরক্তিম চক্ষু দেখাইও না, কারণ তুমিও কুৎসায় লিপ্ত,—হাসিতে হাসিতে কুৎসা করিয়া থাক, কুৎসা শুনিতে তোমার আমোদ হয়। যখন অমানুষীই বিজ্ঞতা তোমার স্কন্ধে আরূঢ় হয়, কেবল তখনই তোমার ঐ গভীর ভঙ্গী। কুৎসা করিতেছি বলিয়া আমার নিন্দা, আমাকে তিরস্কার করিও না। করিলে ফল হইবে না, আমিও উপহাস করিতে জানি, হাসিয়া তোমার কথা উড়াইয়া দিব।

আমি মনুষ্য নামে আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকি, প্রকৃতিকে যথাসাধ্য বা যথাপ্রবৃত্তি শাসন করিয়া থাকি, আহার নিদ্রা প্রভৃতি জীব সাধারণ ধর্মের অনুসরণ বিষয়ে স্থান কালাদির নিয়ম সংস্থাপন করি, অথবা অপরের নিয়ন্ত্রিত মত আত্মচালনা করি; দান বিশেষ কার্য্য কর্তব্য কিনা, বিশেষ পন্থা অনুসরণীয় কিনা বিষয় বিশেষ হইতে আমার পরাঙ্‌মুখ থাকা বা প্রতিনিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক কি না সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমার আছে; অনেক স্থলে সে ক্ষমতার প্রয়োগ করি না, সত্য; কিন্তু ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারি বলিয়া যে অভিমান, তাহা তিলার্দ্ধও আমার চিত্ত হইতে অবসারিত হয় না। এই প্রকৃতি শাসন, নিয়মসংস্থাপন, কর্তব্যাধারণের সমষ্টিকে আমরা মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি; আমাদের গঠনবৈচিত্র্যহেতুক যে রূপ, এই মনুষ্যত্ব হেতুকও তথাবিধ অপরাপর জীব হইতে আমরা বিভিন্ন। কিন্তু প্রধানতঃ এ মনুষ্যত্বের নিদান কোথায়, ইহার নিয়ামক কে? আমি বলি—কুৎসা। নেত্র বিস্ফারিত করিও না, তোমার অধরপ্রান্তের হাসি

অধরেই ধরিয়া রাখ; আমি শিক্ষক, তুমি শিশু, আমি পণ্ডিত, তুমি মূর্খ, আমার কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি; কিন্তু বিদেশীর এক মহাবাক্যও এস্থলে তোমাকে শুনাইয়া রাখি—"আমি বুঝাইতে পারি কিন্তু বোধশক্তি দিতে পারি না।"

জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, স্বার্থসাধন করিতে গিয়াই হউক বা পরের হিতচেষ্টাতেই হউক, মনুষ্যমাত্রেই অহরহ সমাজের উপকার সাধন করিতেছে। নরহন্তা, এবং বিচারাসনে বসিয়া যিনি সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড করেন, এই উভয়ের মধ্যে কে সংসারের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতেছে, সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না বটে, তথাপি উভয়েই যে সমাজ শিক্ষক, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া উভয়েই সংসারকে উপদেশ দিতেছে, এবং সংসার সেই উপদেশ পাইয়া পরমুহূর্ত হইতে নূতনভাবে আত্মব্যবহারকে সঞ্চালিত, বিপর্য্যস্ত, বিশোধিত মার্জিত বা পরিবর্তিত করিতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। নরহন্তা ও তাহার দণ্ডবিধাতা উভয়েই হয় ত ভ্রান্ত; ফলতঃ ভ্রম একের হউক বা উভয়েরই হউক ভ্রমও আমাদের শিক্ষার উপকরণ। নরহন্তা স্বীয় কার্য্যের ফলাফল ভাবিয়া তাহার পর নরহত্যা করিয়াছে, বিচারকও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। আমরা বহিস্থঃ লোক, অসম্পৃক্ত ব্যক্তি, এক্ষণে দলে দলে বিভক্ত হইয়া কেহ নরহন্তার কেহ বা বিচারকের, অপর কেহ বা উভয়েরই দোষ দিতেছি। এখন নরহন্তা, বিচারক ও আমরা সকলেই ত এ উহার দোষ দিলাম; বল দেখি, পূর্ববর্ণিত অন্তঃপুর বিহারিণীর দল এবং পঞ্চাননের কর্মশালাস্থ ব্যক্তিগণ কি ইহা ভিন্ন অন্যকিছু করিতেছিলেন? পূর্বে যে কুৎসা, এখানেও সেই কুৎসা! পূর্বে যে সমাজ সমালোচনা, এখানেও তাহাই। প্রভেদের মধ্যে কেহ না বুঝিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতেছে, কেহ বা বুঝিয়া করিতেছে। সমালোচনার শিক্ষা, শিক্ষায় ইষ্টসিদ্ধি, এ কথা যে না বুঝে কেবল সেই ব্যক্তি কুৎসার দোষ দেখে। কুৎসিতের কুৎসা কেন করিব না? আর কুৎসা করিতে হইলে, পরোক্ষে করি বলিয়াই বা দোষ কি গৌণেও কি তাহার ফল সমাজে ফলে না?

তবে, এক কথা স্বীকার করিতে আমিও প্রস্তুত;—কুৎসার প্রণালীতে কুৎসাকারির শিক্ষা ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং যে ব্যক্তি সুশিক্ষা এবং সুরুচির অধিকারী বলিয়া অভিমান করে, স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কুৎসার মূর্ত্তিভেদ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। মার্জিত, বিশোধিত, সুরুচি সম্মোদিত কুৎসার নাম, সমালোচনা! যাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, যাহার কাছে তুমি অন্তর খুলিয়া দিতে পার না, তাহার সমক্ষে মনুষ্যের চরিত্রের বা মনুষ্যের কার্য্যের "সমালোচনা" করিও, কেহ তাহাকে কুৎসা বলিবে না।

* ভাদ্র ১২৮৪

আবহমানকালে কুৎসা চলিয়া আসিতেছে, অনন্তকালের সঙ্গে কুৎসা চলিবে, কুৎসার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহুক, কুৎসার জয় হউক।

বিশ্বনিন্দুক।

আর্যদর্শন ॥ ভাদ্র, ১২৮৪। পৃ. ২২২-২২৫।

৭
বাঙ্গালি স্তব

হে বাঙ্গালিন্! কলিকালে তুমি মহাদেবতা, তোমাকে নমস্কার।

তুমি ব্রহ্মা, নিরন্তর প্রজা বৃদ্ধি করাই তোমার একমাত্র কার্য্য, তোমাকে নমস্কার।

তুমি বিষ্ণু, আজীবন তুমি কুপোষ্য প্রতিপালন কর, তোমাকে নমস্কার।

তুমি মহেশ্বর, অনুক্ষণ তুমি কাল সংহার কর, তোমাকে নমস্কার।

হে চতুর্ম্মুখ! চারিমুখে তুমি চারি প্রকার কথা কহিয়া থাক; তোমার বৃদ্ধ হংসটি কালে লয় পাইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার পুচ্ছটি অবলম্বন করিয়া তুমি দুস্তর ভবসাগর পার হইয়া থাক। সহধর্ম্মিণী তোমার গায়ত্রী, তাঁহার বাক্যই তোমার নিকট বেদবাক্য, তুমি নানা ছন্দোবন্দে তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া থাক। সরস্বতী তোমার দুহিতা, কন্যাদায়ে তুমি সদাই বিব্রত, তাহাকে অন্যের ঘাড়ে ফেলিতে পারিলেই তুমি দায় হইতে নিষ্কৃতি পাও, তোমাকে নমস্কার।

হে লোকপালক! তুমিই এই জগৎ সংসারের আহার যোগাইতেছ; তোমারই প্রসাদাৎ উকীল মোক্তারগণ খাইতে পাইতেছে, আবগরী বিভাগ চলিতেছে, ডাক্তারগণ পয়সা করিতেছে। হে লোকরঞ্জক! তুমি নানারূপে জীবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাক; থিয়েটারে ভূত সাজিয়া, কাছারীতে বেটো ঘোড়া সাজিয়া, আফিসে গর্দ্দভ সাজিয়া লোকের তুষ্টি সাধন কর। হে অনন্ত মায়াময়! ভ্রান্ত মানবগণ তোমার মহামায়ার কি বুঝিবে? তুমি মায়াবলে হ্যাট্‌কোট পরিয়া সাহেব সাজিয়া থাক, ব্রাহ্ম সমাজে চক্ষু মুদিয়া থাক, শৌণ্ডিকালয়ে গ্লাস ধরিয়া থাক; সভাস্থলে গলাবাজে ইংরাজ দূর কর, রাত্রে গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহের বাহির হও; কাগজ কলমে একত্র করিয়া বিধবার বিবাহ দেও, জাতিভেদ উঠাইয়া দেও, বাল্য বিবাহ রহিত কর, আবার গ্রামে গিয়া দলাদলী কর। হে ক্ষীরোদ-বাসিন্! তোমার স্ত্রী সতত চঞ্চলা, তোমার গৃহে সদাই অন্নাভাব।

হে বিভো! তোমার দশ অবতার; প্রথম অবতারে রেলের বাবুরূপে অবস্থান করিতেছ, তোমার দ্বিতীয় অবতার কাছারীর আমলা, তৃতীয় অবতার লাইসেন্সের এসেসর, চতুর্থ ও পঞ্চম পোষ্টমাষ্টার ও পুলিশ ইন্সেপেক্টর। পরন্তু রামাবতারে তুমি পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃ মুণ্ডচ্ছেদন করিয়াছিলে, সম্প্রতি তুমি কলি অবতারে স্ত্রীর আজ্ঞায় মার ভাত বন্ধ করিয়াছ। তুমি বুদ্ধবতার, তোমার নিশ্বাসে ঈশ্বর উড়িয়া যান, শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ থাকে না; অহিংসা তোমার পরম ধর্ম, বুট প্রহারেও তোমার হিংসাবৃত্তি উত্তেজিত হয় না; বেশ্যাগৃহতোমার মঠ, সেখানে থাকিয়া যখন তুমি সন্ন্যাস অবলম্বন কর, তখন সংসার মায়া তোমাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না, স্ত্রী পুত্রের নয়ন জল তোমাকে ফিরাইতে পারে না; তুমি সেখানে থাকিতে থাকিতে নির্বাণ প্রাপ্ত হও। তুমি শ্রীকৃষ্ণাবতার, বিদ্যালয়ে শিশুর পাল চরাইয়া থাক; অপরে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া যে নবনীতটুকু বাহির করেন; তুমি বেমালুম সেটুকু চুরী করিয়া থাক; তোমার লীলা খেলায় জনগণ স্বাধীন প্রেম শিক্ষা করে। হে কৃষ্ণ! তোমার ভিতর বাহির সমান; তোমার চক্রে যে একবার পড়িয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই। হে নারায়ণ! তোমার দশম ও শেষ অবতার ঘরজামাই ও পোষ্যপুত্র; তোমার মহিমা অপার।

হে মহাদেব! যে তোমার সংহার মূর্ত্তি না দেখিয়াছে, ভৃত্যবর্গের মধ্যে তোমার তর্জন ও বিষাণ নির্ঘোষ না শুনিয়াছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর সে নর কিরূপে তোমার মহিমা বুঝিবে? হে ভূতনাথ! তুমি ভূতগণের শ্রেষ্ঠ, প্রেতগণ তোমার অনুচর, সদনুষ্ঠান ও সংকার্য্যে সততই তুমি বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাক। তুমি তমোময়, তমঃ প্রভাবে তুমি ত্রি-সংসারে কাহাকেও দৃক্‌পাত কর না। হে নীলকণ্ঠ! তোমার কণ্ঠে যে হলাহল রহিয়াছে, তাহা উদ্‌গীরণ করিয়া তুমি সদাই পরনিন্দা গান করিয়া আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া থাক।

হে মহেশ্বর! তুমি সদাসিব, গৃহিণীর পদতলে তুমি সততই অবস্থিতি কর। তুমি ভোলানাথ, পুস্তক চাহিয়া ফিরাইয়া দিতে তোমার মনে থাকে না, আর্যদর্শনের পয়সা দিতে তুমি ভুলিয়া যাও; পরকৃত উপকার তোমার স্মৃতি হইতে শীঘ্রই বিলোপ পায়। হে আশুতোষ! তুমি স্বতঃই সন্তুষ্ট, ৩০ টাকার চাকুরী হইলেই তুমি আপ্যায়িত হও। পরিহিত সূক্ষ্ম বস্ত্রে তুমি দিগম্বর, গৃহিণীও দিগম্বরী। ত্রিশূল তোমার বেত্র যষ্টিতে পরিণত হইয়াছে, কুঞ্চিত কেশাবলীতে তোমার জটা পরিলক্ষিত হয়, সীমন্ত-রেখাতে তন্নিবদ্ধা ভাগীরথীর প্রবাহ প্রতীতি হয়, গলবিলম্বী উড়ুনীতে সর্পজ্ঞান হয়; হাড়মালা তোমার চেইনে পরিণত হইয়াছে, ঝুলি তোমার রুমালত্ব পাইয়াছে, বিষাণ তোমার চুরুটত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তৃতীয় নয়ন তোমার নাসিকার উপর আসিয়া চসমারূপ

ধরিয়াছে হে বৃষভ বাহন ! তুমি বাহন-পৃষ্ঠে একবার আবির্ভূত হও ! হে সিদ্ধিদাতঃ তুমি রায় বাহাদুর হও, রাজাবাহাদুর হও, আমায় সিদ্ধি দান কর ; তুমি ভোজ দাও, বল্ দাও, রেসফণ্ডে টাকা দাও, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি।

তুমি ইন্দ্র, পরছিদ্রান্বেষণে তুমি সহস্র চক্ষু। তুমি অসুরারি, যেহেতু পাওনাদার ভয়োইন্দ্রত্ব ছাড়িয়া তোমাকে মাঝে মাঝে ডুব মারিতে হয়। তুমি শতক্রতু, যেহেতু তুমি শত উমেদারী করিয়া তোমার চাকুরী পাইয়াছ। তুমি সোমপায়ী, তুমি যজ্ঞভাক্, যে যাহা করে, তাহাতেই তুমি ভাগ বসাও। তুমি ত্রিদিব নিবাসী, তোমার বড় কেহই নাই এই ভাবিয়া মাটিতে তোমার পা পড়ে না। সমালোচনা তোমার বজ্র ; হে মেঘবাহন ! যখন মেঘান্তরালে থাকিয়া এই বজ্র ছাড়, তখন শতশত নিরীহ গ্রন্থকার দগ্ধ হইয়া যায়।

তুমি অগ্নি, তুমি যে স্থানে যাও জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক করিয়া দাও। তুমি সর্বভুক্, ত্রিসংসারে তোমার কিছুই অখাদ্য নাই। হে তেজাধার তোমার উত্তাপ ন্যাশন্যাল থিয়েটারে নটবৃন্দ, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী, ও হকার বাহিত পুস্তক রাশির মধ্য হইতে স্ফুরিত হইয়া ভারত তাতাইয়া তুলিয়াছে, অচিরাৎ প্রজ্জলিত হইবে, অতএব তোমাকে সঘৃত মাংস আহুতি দিতেছি, হে হুতাসন ! আমাকে সে অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা কর।

তুমি বায়ু, লঘুত্ব তোমার গুণ, পরিবর্তন তোমার ধর্ম, শৈত্যই তোমার স্বভাব। তুমি জগতের প্রাণভূত, তোমার চাকরী না হইলে জগৎ এক দণ্ডও চলে না। সংবাদপত্র তোমার বাহন, তাহাতে আরোহণ করিয়া তুমি প্রবল ঝড় তুলিয়া থাক।

তুমি বরুণ ; বারুণী তোমার বিলাসিনী। তোমার অমোঘ পাশে বঙ্গ স্ত্রীপুঞ্জ যে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ আছে, স্বয়ং শক্তি আসিলেও তাহা ছেদন করিতে অসমর্থ। হে জলেশ ! তোমার ইচ্ছা হইলে পিটিসন বৃষ্টি করিয়া জগৎ সংসার ভাসাইয়া দিতে পার, তাহাতে ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া যায়।

তুমি সূর্য্য, তোমার উদয়াস্ত রুটিন বাঁধা, দশটায় আইস পাঁচটায় যাও। তোমার ভয়ে পেচকগণ কোটরে লুকায় ! হে লোকলোচন ! তুমি বঙ্গের অন্ধকার হরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ।

তুমি যম, তোমার প্রাসাদাৎ অজ ও মোরগকুল নির্মূল হইয়াছে ; স্বয়ং ভগবতীই তোমার ভয়ে শশব্যস্ত ! তোমাকে নমস্কার।

তুমি কার্ত্তিকেয়, তোমার শৌর্য্যবীর্য্য ত্রিলোক-প্রথিত, তোমাকে নমস্কার।

হে সর্ব দেবাত্মন্! ভক্তিভাবে তোমার স্তব করিলাম। অযথোক্তি যদি কিছু থাকে, সে গুলি অজ্ঞানকৃত বলিয়া জানিও, আমি তোমাকে পুনরায় অভিবাদন করি।

"শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ"

আর্যদর্শন। বৈশাখ, ১২৮৫। পৃঃ ৯-১৫।

৮

রমণী হৃদয় ও বিড়াল শাবক

এ সংসারে রমণীর হৃদয় কয়জন চেনে ও কয়জন জানে? রমণীর হৃদয়ে অনন্ত প্রেম, অনন্ত স্নেহ, অনন্ত মমতা। কে বলিবে এ সংসারে যাহা কিছু কোমল, যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু দুঃখের স্মৃতি লোপ করিতে পারে, চিত্তের বিভ্রম জন্মাইতে পারে, তাহারই অন্তঃসার লইয়া রমণী হৃদয় গঠিত হয় নাই? রমণীর মত ভালবাসিতে কে জানে? রমণীর প্রেমের অন্ত কে কবে পাইয়াছে? জীবন ব্যবসায়ে ভালবাসাই রমণীর একমাত্র মূলধন। রমণীর এই মূলধনে বঞ্চিত হইলেন, অমনি তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিল, তাঁহার ব্যবসায় ফুরাইল। তুমি পুরুষ, তোমার ব্যবসায় করিবার শত উপায় রহিয়াছে, তোমার মূলধনের অন্ত নাই। তুমি একটি অবলম্বন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না, আর একটি অবলম্বন করিলে; তাহাতেও যদি সুফল ফলাইতে না পার, তুমি তৃতীয় উপায়ের অনুসরণ করিবে। তুমি কিছুতেই ভগ্নাশ হইবে না, তোমার হৃদয় সহজে ভগ্ন হইবার নহে; কারণ আশ্রয় ভ্রষ্ট হইলে তোমার অন্য আশ্রয় বিদ্যমান রহিয়াছে। আশ্রয় থাকিতে কে কবে ডুবিয়া মরে? সংসার সমুদ্রে জীবন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি এক অবলম্বন হারাইলে, দেখিলে সম্মুখে অন্য অবলম্ব রহিয়াছে; তুমি ডুবিলে না, সেই অবলম্বে নির্ভর করিয়া আবার পূর্বমত তরণী চালাইতে লাগিলে। কেনই বা চালাইবে না? আশ্রয় থাকিতে কে কবে ইচ্ছা করিয়া সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া মরে, এত সুখের জীবন বাসনা পরিত্যাগ করে? যশোলিপ্সা তোমার এক মূলধন, এই মূলধন তুমি কত শত ব্যবসায়ে চালাইতে চেষ্টা করিবে। যশোলাভ হইবে বলিয়া দেশের হিতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলে, দেখিলে যে সে দিকে সুবিধা নাই। দুর্গম প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত ভাগ আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে নাম রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে, তাহারও সঙ্গতি হইয়া উঠিল না।

বক্তার মঞ্চে উঠিয়া তেজঃপূর্ণ মনোমুগ্ধকর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া যশের উচ্চ শিখরে উঠিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলে প্রকৃতি তোমাকে বক্তার গুণ দেয় নাই। তুমি অন্তরে অন্তরে তোমার বক্তব্য বিষয় তেজঃপূর্ণ করিলে, যে গুণে শ্রোতৃবর্গকে চমকিত করিতে পার, যাহাতে শ্রোতামাত্রই অনেকে করতালি দিয়া বিস্ময়ে মুখ-ব্যাদান করিয়া তোমার মস্তকোপরে অজস্র প্রশংসাবাদ বর্ষণ করে, মনে মনে সেইগুণে বক্তব্যের মনোহারিত্ব সম্পাদন করিলে ; কিন্তু সাধারণ সমক্ষে বলিতে দাঁড়াইয়া দেখিলে তোমার বক্তৃতায় কাহারও মনমুগ্ধ হইল না, কেহ তোমাকে আশানুরূপ প্রশংসা করিল না। তুমি সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য পথে চলিলে বক্তৃতায় যশ লাভ করিতে পারিলে না, কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিলে। কতবার লিখিলে কত কি লিখিলে, একবারও একটিও মনঃপূত হইল না। ছিড়িয়া ফেলিলে, আবার লিখিলে, আবার লিখিলে, আবার ছিঁড়িলে। ও পথেও যশোলাভ হইল না, অতঃপর ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলে গদ্যেই যেরূপ পার নিজ হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সকলকে দেখাইবে, দেখিবে তাহাতেও লোকে তোমাকে প্রশংসা করে কিনা। এইবার তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, অল্প হউক অধিক জীবন ব্যবসায়ে তোমার লাভ হইল, তোমাকে ভগ্ন হৃদয়ের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে হইল না। জ্ঞান তৃষ্ণা তোমার দ্বিতীয় মূলধন। তুমি লোকের প্রশংসা চাও না, ভালবাসা চাও না। লোকে তোমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা ভাবুক না কেন, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক না কেন তাহাতে তোমার দৃক্‌পাত নাই ; সংসার ডুবিয়া যাউক তাহাতে তুমি ক্ষতি বোধ করিবে না, তোমার জ্ঞান লাভের ব্যাঘাত কেহ না জন্মাইলে হইল। পৃথিবী খুঁজিয়া খুঁজিয়া জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি যেখানে যাহা পাইলে, সংগ্রহ করিয়া আনিলে, আনিয়া তাহাতে মগ্ন হইয়াই জীবন শেষ করিলে ; তোমার অন্য মূলধনের প্রয়োজন হইল না। এইরূপ তোমার কত কি মূলধন রহিয়াছে যদি ইহার কোনটিও তুমি ব্যবহার করিতে না জান ; অর্জ্জন স্পৃহা অন্যতম মূলধন রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল পুরুষই এ মূলধন লইয়া ব্যবসায় করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্য কোন মূলধনই নাই তিনি এ মূলধনে বঞ্চিত নহেন। এ সংসার সমুদ্রে প্রবেশ করিলেই জীবিকা সংস্থানের প্রয়োজন হইয়া উঠে ; উদারণ্যের জন্য সকলকেই অর্থোপার্জন করিতে হয়। সুতরাং এ সংসারে পুরুষ মধ্যে প্রায় কেহই অর্জন-স্পৃহা বিরহিত নহেন। ঐ যে দরিদ্র কৃষক বৈশাখের এই প্রচণ্ড রৌদ্রে শরীর দগ্ধ করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতেছে, উহাও অর্জন স্পৃহার ; আর তুমি যে এই সুস্নিগ্ধ পুষ্পবাসিত প্রাসাদে বসিয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেছ, তোমার শরীরের অনবরত সলিলস্নিগ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, ইহার মধ্যেও অর্জন-স্পৃহা কিছু কিছু পরিমাণে রহিয়াছে।

কিন্তু রমণীর ? ভালবাসা ভিন্ন রমণীর জীবন ব্যবসায়ের মূলধন আর এ পৃথিবীতে কি আছে ? একমাত্র মূলধন লইয়া রমণীর ব্যবসায়, তাহার আবার কত প্রতিবন্ধক। নিষ্ঠুর নীচমন সমাজ তাহারা আবার কত কি বাধা না ঘটাইয়া থাকে ? বলিয়াছি, এ স্বার্থময় সংসারে কয়জন বুঝিতে পারে রমণীর জীবন—রমণীর সুখ, ভালবাসার উপর কতদূর নির্ভর করে ; ভালবাসা রমণীর প্রত্যেক কাজের সহিত কিরূপে ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। তুমি সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় পুড়িয়া গেলে, দাসত্বের দুর্বিষহ ক্লেশ ভোগ করিয়া এলে, আসিয়া বিশ্রাম করিলে, তোমার শরীরের গ্লানি অপনীত হইল। কিন্তু মনের জ্বালা প্রশমিত করিতে পারিলে না তুমি আদেশ করিলে, ভৃত্যগণ তোমার লালমোন হিরামোন কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখী আনিয়া একে একে তোমার চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া রাখিল। তুমি কোনটিকে কিছু খাইতে দিলে ; কোনটির সহিত দুটো আলাপ করিলে, কোনটিকে লইয়া কিছু কৌতুক করিলে ; এইরূপে কিছু কোমলতার আবিভাব করিয়া সংসার কাঠিন্যের সংঘর্ষে যেরূপ ক্লিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলে, সেই ক্লেশের কিঞ্চিৎ উপশম করিলে, অথবা তুমি যদি বঙ্গের ধনিপুত্র হও, তবে নিরবচ্ছিন্ন অলসতার জন্য সময়ে সময়ে সময়াতিত করা তোমার পক্ষে যেরূপ কষ্টকর হইয়া উঠে, সেই কষ্টের কিছু লাঘব করিলে। কিন্তু কোন রমণীকে পাখী লইয়া খেলা করিতে দেখিয়া, 'মর, মর, আশীর্বাদ পাইবার জন্য কোন পাখীর লেজ ধরিয়া টানিতে দেখিয়া, সম্মানের বাঁদি নামে অভিহিত হইবার জন্য লাল পাখীকে বাঁদি বলিয়া গালি দিতে শুনিয়া যদি তুমি মনে কর রমণীর পাখীর সোহাগ তোমার পাখীর সোহাগের ন্যায় স্বল্পার্থবোধক ও ক্ষুদ্রভাব ব্যঞ্জক, তবে তুমি রমণীর হৃদয় এখনও চিনিতে পার নাই, রমণীর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে তুমি এখনও অসমর্থ। তোমার পাখীর সোহাগ তোমার অন্তর্জ্বালা নিবারণ-জন্য, বাহির হইতে কিঞ্চিৎ কোমলতার সমাবেশ মাত্র ; রমণীর পাখীর ভালবাসা, রমণীর হৃদয় যে অনন্ত ভালবাসার সমুদ্র, সেই সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্রোর্ম্মি, সেই গভীর সমুদ্রের একটি মন্দান্দোলন।

কে কবে জানিতে পারে এ সংসারে কে কাহাকে ভালবাসে ? তুমি মনে করিতেছ এ পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তোমাকে ভালবাসে ; অথচ হইতে পারে তুমি যে অনন্ত ভালবাসার অধিকারী, জগতে সেরূপ ভালবাসা কাহারও অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। আমিও জানতাম না যে আমি অনন্ত ভালবাসার অধিকারী। আমিও রমণী হৃদয় ভাল চিনিতাম না। এখন চিনিয়াছি ; এখন বুঝিয়াছি এ সংসারের সার রত্ন রমণী হৃদয় ; তাই আজ রমণী হৃদয়ের এ চিত্র অঙ্কিত করিতে আমি প্রবৃত্ত। আমি যে রমণীর ভালবাসার জন্য লালায়িত ছিলাম, মনে করিতাম তাহার হৃদয়ে আমার

প্রতি প্রেমানুরাগ জন্মিলে তাহার বাহ্যিক বিকাশ অবশ্যই দেখিতে পাইব, সে রমণী অবশ্যই তাহার প্রণয়ানুরাগ প্রকাশ করিবে। বৎসরের পর বৎসর বিগত হইল, সে রমণীকে কখনও ভালবাসা দেখাইতে দেখিলাম না, নৈরাশ্য দিন দিন আমার হৃদয়ে স্থানাধিকার করিতে লাগিল, ভাবিলাম রমণী হৃদয়শূণ্য ; নতুবা এত যত্ন করিয়াও তাহার মন পাইলাম না কেন ও ভাবিলাম রমণী আমাকে ভালবাসিলে অবশ্যই সে বাহিরে ভালবাসা জানাইত। এখন বুঝিয়াছি আমি ভ্রমান্ধ হইয়াছিলাম ; আমি রমণী হৃদয় সম্পূর্ণ চিনিতে পারি নাই ; আমি বুঝিতে পারি নাই যে রমণী হৃদয় আর ভালবাসা একই কথা। এখন বুঝিয়াছি নির্ঝরিণীই কলকল করিয়া থাকে, স্বল্পতোয়-নদী হৃদয়েই চাঞ্চল্য দেখিতে পাওয়া যায় ; চাঞ্চল্য গভীর সমুদ্রের স্বভাব নহে, গম্ভীর সমুদ্রে কখনও কল কল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, অবস্থা বিশেষে সমুদ্রও শব্দ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে শব্দ সমুদ্রের গভীর নির্ঘোষ, তাহা নির্ঝরিণীর কল কল শব্দ নহে ; সে শব্দ প্রতাপ সমক্ষে শৈবলিনীর প্রণয় প্রদানের গভীর নিনাদ-তুল্য ; তাহা লক্ষ্মণ সমক্ষে লঙ্কেশ ভগিনীর চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশের ন্যায় গভীরতাশূণ্য নহে। তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও আমার ন্যায় ভ্রমান্ধতা জন্মিয়া থাকে, তবে সাবধান হও। দেখিও যেন অতল সমুদ্রের অধিপতি হইয়া শুষ্ক মরুভূমে পড়িয়া রহিয়াছে ভাবিয়া আপনার সুখ আপনি নষ্ট না কর, দেখিও যেন রমণী হৃদয়ের অবমাননা করা না হয়, রমণী প্রেমের গভীরতা বুঝিতে না পারিয়া আমরা অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। এই ভ্রমান্ধতা কতজনের সুখ নষ্ট করিয়াছে ; কতজনের প্রাণনাশক হইয়াছে। এই ভ্রমেই এড্উইন বনবাসী হইয়াছিলেন ; এই ভ্রমেই নগেন্দ্র দুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর প্রাণ সংহারক হইয়াছিল।

আমি জানিতাম যেখানে প্রেমানুরাগ, সেখানে লজ্জা থাকিতে পারে না। আপনার নিকটে কে কবে লজ্জা করিয়া থাকে ; লোকে লজ্জা করে অন্যের নিকটে। আত্ম-বা জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলোপের নামই প্রকৃত ভালবাসা—যথার্থ প্রেমানুরাগ। এরূপ স্থলে প্রণয়ীযুগলের মধ্যে লজ্জা সম্ভবে কি প্রকারে? যে হৃদয় মিথুন প্রভেদশূণ্য, তাহাদের আবার এরূপ আত্ম পরজ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? এখন বুঝিয়াছি, প্রণয় স্থলে লজ্জা অসঙ্গত নহে ; এখন বুঝিয়াছি, লজ্জা না থাকিলে রমণী হৃদয় এত রমণীয় হইত না। বহিশ্চাপল্য বিহীনতা যেমন রমণী হৃদয়ের গাম্ভীর্য্য প্রতিপাদক, লজ্জা তেমনই রমণী হৃদয়ের সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধক। লজ্জা রমণী হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের নূতনত্ব হ্রাস হইতে দেয় না। সৌদামিনী চমকিয়া চমকিয়া কাল মেঘের কোলে লুকায় বলিয়াই দেখিতে বড় সুন্দর ; কাল মেঘের কোলে লুকায় বলিয়াই লোকের সৌদামিনী

দেখিবার সাধ ইহকালে মিটিল না. চন্দ্রও ত দেখিতে সুন্দর, কিন্তু কয়জন চাঁদ দেখিবার জন্য চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকে ?

যে রমণীর হৃদয় আদর্শ করিয় আজ আমি রমণী হৃদয় চিত্রিত করিতে বসিয়াছি, আমার সহিত বিদেশ বাস সময়ে সেই রমণী একটি বিড়াল শাবক পুষিয়াছিল। ঘটনাক্রমে আমাদিগকে স্থানান্তরিত হইতে হইল। বিড়াল শাবককে সঙ্গে আনিতে পাঁরিলাম না। তাহাকে আনিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, সে আসিল না, আসিল না. বুঝিল না বলিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য কত যত্ন করিলাম, তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিলাম না, সে ভীত হইয়াছিল বলিয়া। রমণী যেরূপ ক্ষীণাঙ্গী ক্রীড়াময় এবং মধুর প্রকৃতি. বিড়াল শাবকও সেইরূপ ক্ষীণাঙ্গী ক্রীড়াময় এবং মধুর প্রকৃতি হইয়াছিল। ক্ষীণাঙ্গ তাহার প্রকৃতি প্রদত্ত ; ক্রীড়াময়তা এবং মধুর প্রকৃতি, এই রমণীর স্বভাব অনুসরণ করিয়া হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। বিড়াল শাবক অনুসরন করিতে পারে, ইহা কখনও শুনি নাই। রমণী বিড়াল শাবককে পুঁটি বলিয়া ডাকিত। এই পুঁটি নাম রমণীর স্বকপোলকল্পিত কি মানুষে বিড়ালকে পুঁটি বলিয়া ডাকিয়া থাকে তাহা আমি জানি না। রমণী বিড়াল শাবককে বড় ভালবাসিত। আমিও তাহাকে ভালবাসিতাম। আমি কত ভালবাসিতাম তাহা বুঝিতাম না। এখন বুঝিতেছি সেই বিড়াল শাবকের প্রতি আমার সামান্য ভালবাসা ছিল না। খাইতে বসিলে সেই বিড়াল শাবকের কথা মনে পড়ে, আবার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে আনিতে পারিলাম না বলিয়া বড় দুঃখ হয়। রমণীর সাধের বিড়াল বলিয়াই তাহাকে এত ভাল বাসিতাম, না আমার এ বিড়াল ভালবাসায় অন্য কোন কারণ আছে তাহা আমি বলিতে পারি না। তোমরা আমার এ বিড়াল ভালবাসা দেখিয়া হাসিও না। আমি জানি মানুষকে ভালবাসা যত কঠিন, বিড়াল— কুক্কুরকে ভালবাসা তত কঠিন নহে। তুমি-পরনিন্দুক বলিয়া তোমাকে আমি ভালবাসিতে পারিলাম না ; অমুক স্বার্থপর বলিয়া সে আমার ঘৃণার পাত্র, তৃতীয় একজন অহঙ্কারী বলিয়া সে আমার চক্ষুশূল ; অসরল বলিয়া চতুর্থ একজন আমার প্রীতির পাত্র নহে। কিন্তু বিড়াল কুক্কুরকে ভালবাসার পথে কোন বাধা প্রতিবন্ধক নাই ? একদিন সেই রমণীকে একটি উপন্যাস পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। রমণী উপন্যাস শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, তুমিও কেন একটি উপন্যাস লেখনা ; লেখ "পুঁটি নামে এক বিড়াল আছে, সে মাছ না হইলে খায় না, বিছানা না হইলে শোয় না, কোল না হইলে ঘুমায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।" সত্য সত্যই যে সেই বিড়াল শাবকের উপন্যাস আমায় লিখিতে হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আজ

আমায় সেই বিড়াল শাবকের স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে হইল ; তাহার সম্বন্ধে এই উপন্যাস আমায় লিখিতে হইল। এই বিড়াল শাবক কখন গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত, কখন প্রাচীরে উঠিয়া বেড়াইয়া বেড়াইত, আবার সময়ে সময়ে কোথায় লুকাইয়া থাকিত, আমরা খুঁজিয়া পাইতাম না। রমণী যখন "পুঁটি আয়" বলিয়া ডাকিত, তখন সে তীর বেগে ছুটিয়া আসিত ; ছুটিয়া আসিয়া রমণীর পদপ্রান্তে গড়াইত, পায়ের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিত, আবার থাকিয়া থাকিয়া রমণীর মুখের দিকে তাকাইত। রমণী তাহাকে খেলা দিবার জন্য কখন কখন কিছু শূন্যে ধরিয়া বুঝাইত, সে লাফাইয়া লাফাইয়া তাহা ধরিতে চাহিত। যদি রমণী ধরিতে না দিত, সে রাগ করিয়া রমণীর গা কামড়াইত। রমণী ঈষৎ কুপিত হইয়া, "মর" বলিয়া আস্তে তাহাকে পদাঘাত করিত, সে রমণীর পদাঘাতে কিছু দূরে গিয়া বসিয়া থাকিত ; কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিত না, আবার ফিরিয়া আসিয়া রমণীর গায়ে লেজ ভাঙ্গিত, লেজ ভাঙ্গিয়া পায়ের চারিদিকে আবার ঘুরিয়া বেড়াইত, রমণী বসিয়া থাকিলে সম্মুখে গিয়া এক পায়ে মাথা রাখিয়া অন্য পায়ে লেজ জড়াইয়া পার্শ্বপরে শুইয়া থাকিত ; রমণী আপনার কাজ করিত, আর এক এক বার তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। রমণী বোধহয় লাথীর দুঃখ ভুলাইবার জন্য কখন ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কোলে লইত, কোলে লইয়া গালে গাল লাগাইয়া সোহাগ করিত, সে আহ্লাদে লেজ নাড়িত, কখন রমণী তাহাকে কোলে লইয়া মুখামুখী লইয়া 'পুঁটু' বলিয়া সোহাগ করিয়া কত কি বলিত, কত কি জিজ্ঞাসা করিত, সে লেজ নাড়িয়া "ম্যাও" করিয়া তাহার উত্তর দিত, এইরূপে রমণী সেই বিড়াল শাবককে লইয়া খেলা করিত। সেই বিড়াল শাবকও রমণীকে লইয়া কত খেলা খেলিত ; কখন যে রমণীর গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবার সময় দৌড়িয়া গিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিত, রমণীকে যাইতে দিত না, কখন চুপে চুপে যাইয়া ছোট করিয়া পায়ে একটি কামড় মারিয়া দৌড়িয়া পালাইয়া যাইত। কতদিন দেখিয়াছি, আহারান্তে শয্যায় শুইয়া রমণী তন্দ্রাভিভূত, বাহিরে বিড়ালে বিড়ালে ঝগড়া বাধাইয়াছে ; হঠাৎ রমণীর তন্দ্রা ভাঙ্গিল। রমণী চমকিয়া উঠিয়া, "আমার পুঁটিকে বুঝি মারিয়া ফেলিল" বলিয়া বাহিরে দৌড়িয়া গেল, পুঁটীকে অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল শয়ন গৃহেরই এক নিভৃত স্থানে পুঁটী ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তথাপি রমণীর বিশ্বাস হইল না যে সে স্থানে পুঁটীর কোন বিবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় বিপদ আশঙ্কার পরে স্নেহশালি মনের গতি এইরূপই হইয়া থাকে। রমণী পুঁটিকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া বক্ষে রাখিয়া আবার শয়ন করিল, শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া রহিল, বিড়াল শাবক তাহার

বক্ষেই ঘুমাইয়া পড়িল। রমণী বাস্তবিক এই বিড়াল শাবককে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তাহাকে আনিতে পারিল না বলিয়া রমণী কাঁদিতে লাগিল। আমিও—আমি কিছু গোপন করিব না, সকল কথা সরল হৃদয়ে তোমাদিগকে বলিব—আমিও রমণীর রোদন দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না; আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিড়াল শাবকের জন্য কাঁদিতে লাগিলাম। তোমরা আমাকে রমণীস্বভাব বলিতে হয় বলিও, আমি যেরূপ, আমার যেরূপ হইয়াছে, তাহাই তোমাদিগকে বলিলাম। আমি গোপন করিতে জানি না। আমার নিকট সেই অনন্ত প্রেমময়ীর এই বিড়াল ভালবাসার দৃশ্যটি বড় সুন্দর লাগিয়াছিল, আমি বাস্তবিক রমণী হৃদয়ের কোমলতার এই বহির্বিকাশ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। এই দৃশ্যের অবিকল চিত্র যদি তোমাদিগকে দেখাইতে পারিতাম, তোমরাও মোহিত হইতে। কিন্তু তাহা পারিলাম না; পারিলাম না বলিয়া মনে করিলাম এ চিত্র তোমাদিগকে দেখাইব না; পরে ভাবিলাম আপনার জিনিস মন্দ বলিয়া এ সংসারে কে কবে ব্যবসায় করিতে ছাড়িয়া থাকে; আমি কেন ব্যবসায় থাকিব না?

আর্য দর্শন॥ শ্রাবণ, ১২৮৭। পৃ. ১৫৪-১৫৭।

—জনৈক বঙ্গীয় যুবক

৯

সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর আপস

এক দিবস বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী অন্তঃপুরে বসিয়া পাদপদ্মে অলক্তক পরিতেছেন, এমত সময় স্বয়ং ভগবান্ জনার্দ্দন কতকগুলিন বঙ্গদেশীয় সম্বাদপত্র হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং নিকটে বসিয়া লক্ষ্মীর করকমল আপন হস্তমধ্যে লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বলিলেন, “হে কমলা, আমি কিঞ্চিৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি বলিবে বিষ্ণুর আবার বিপদ্ কি? আমার বিপদ্ আছে; স্মরণ করিয়া দেখ, অনেকবার বিপদে পড়িয়াছিলাম; সম্প্রতি আবার বিপদে পড়িয়াছি। এই সকল সমাচার পত্র পড়িয়া দেখ, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। শিব সংহার কর্ত্তা, মনুষ্য মরিলেই তাঁহার খোষনাম। আমি পালন কর্ত্তা, অপালনে বাঙ্গালী মরিলে আমার বদ্‌নাম। ইহার নিমিত্ত একান্ত পদচ্যুত না হই, অভাবপক্ষে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই অপালন দোষের প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা জান ত?”

লক্ষ্মী একে একে সংবাদ পত্রগুলি পড়িয়া তাহা স্বামীর হস্তে পুনরর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে উপায় ?

নারায়ণ বলিলেন, এক্ষণে উপায় তুমি। তুমি যদি একবার বাঙ্গালায় যাও, তাহা হইলে বাঙ্গালির সকল ক্লেশ নিবারণ হয়। মনে করে দেখ, তুমি অনেক কাল বাঙ্গলায় যাও নাই। বাঙ্গালিরা তোমার নিতান্ত অনুগত ; তুমি একবারও যাও না, অথচ তাহারা প্রায় প্রতিমাসে তোমার পূজা করে।

লক্ষ্মী উত্তর করিলেন, আমি যাই না কিন্তু আমার পেচক গিয়া থাকে। আমি যে যাইনা, তার কারণ আছে। শুনিয়াছি ইদানীং সরস্বতী নাকি বাঙ্গালায় যাতায়াত করিতেছে, সরস্বতীর সঙ্গে আমার চিরবিরোধ, সরস্বতী বাঙ্গালায় গেলে আমি যাব না।

নারায়ন বলিলেন, যে কথা শুনিয়াছ, তাহা মিথ্যা। সরস্বতীও বলিয়া থাকেন, যে এক্ষণে বাঙ্গালায় লক্ষ্মী যাতায়াত করিতেছেন, অতএব আমি যাব না, এইরূপে বাঙ্গালার প্রতি তোমাদের উভয়ের অযত্ন জন্মিয়াছে। সময় পাইয়া মনসা, শীতলা, ওলাদেবী প্রভৃতি বাঙ্গালা এক্ষনে অধিকার করিয়াছে। ইহাত ভাল নহে। আর সরস্বতী বাঙ্গালায় যাতায়াত করিতেছেন, শুনিয়া যে তুমি বাঙ্গালায় যাবে না, তাহাও ত ভাল নহে। তাঁহার প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন ? সময়ে সময়ে দেখিয়াছি তুমি সরস্বতীর সহিত এক বার বাস করিয়াছ, আবার বিরোধও করিয়াছ। ইহা কেবল তোমাদের স্ত্রী স্বভাব বশতঃ হইয়া থাকে। সে যাহাই হউক এক্ষনে আর বিরোধ করিও না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া আমার সম্ভ্রম রক্ষা কর। তুমি অদ্যই একবার বাঙ্গালায় যাও। তথায় তোমার নিমিত্ত পূজার আয়োজন হইয়াছে।

লক্ষ্মী বলিলেন, প্রভো ! আমি কখনই আপনার অবাধ্য হই নাই, আপনি অনুমতি করিতেছেন, আমি অবশ্যই যাইব। কিন্তু আমার সঙ্গে লোক দিতে হইবে, বাঙ্গালায় একা যাইতে আমার বড় ভয় করে। বহুকাল হইল একবার দুর্গোৎসবের পরে বাঙ্গালায় গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। সকল বাড়িতেই দেখি যে এক বিকটাকার নির্লজ্জ মাগি উলঙ্গ হইয়া আপন স্বামীর বুকে দাঁড়াইয়া আছে—আর বাঙ্গালিরা তাহাকে মা-মা বলিয়া চিৎকার করিতেছে। মাগির হাতে নরমুণ্ড, অঙ্গে রুধির, দন্তে রুধির, মাগি বুঝি মানুষ খাইয়াছে, আমার দেখিয়া ভয় হইল, আমি পলাইলাম, আমার সেই পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যাইতে ভয় হয়।

নারায়ন বলিলেন, তুমি অল্পেতেই ভয় পাও, কিছুই তদন্ত না করিয়া পলাও এই তোমার দোষ। যাহা দেখিয়াছিলে তাহা গঠিত প্রতিমা মাত্র। বাঙ্গালিরা ভগবতীর এইপ্রকার রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিয়াছিল। লক্ষ্মী শিহরিয়া বলিলেন, সেকিহ

জনার্দ্দন। ভগবতীর দেবমূর্ত্তি থাকিতে বাঙ্গালিরা কেন পৈশাচিক মূর্ত্তি অনুভব করিয়া লইয়াছে? জনার্দ্দন বলিলেন, বোধ হয় যে যেমন, সে সেইরূপ দেব-দেবী চায়, নতুবা ভক্তি করিতে পারে না, তাহাই তাহারা আপনাদের এইরূপ জগজ্জননীর মূর্ত্তি বাছিয়া লইয়াছে। লক্ষ্মী বলিলেন, মনুষ্যেরা যে দেবতাকে ভক্তি করে, সতত তাঁহার অনুকরণ করে। বাঙ্গালিরা যদি এই মূর্ত্তির অনুকরণ করিয়া থাকে, তবে বাঙ্গালা কি ভয়ানক স্থান হইয়া উঠিয়াছে? অতএব আমি আর তথায় যাইব না।

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বাঙ্গালিরা এক সময় বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে সে সকল নাই, তবে দুই একটি সামান্য বিষয়ে এই মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় এক্ষণে পুরুষেরা স্ত্রীচরণে আপনাদিগের বুক পাতিয়া দিয়া থাকে, এবং স্ত্রীকে উলঙ্গ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত শান্তিপুরে ধুতি পরাইয়া দেয়, এতদ্ভিন্ন আর কোন অনুকরণ চিহ্ন আমি দেখিতে পাই না। মৎস্য হত্যা ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কোন হত্যা প্রায় নাই। বঁটী ব্যতীত আর কোন অস্ত্র নাই—অতএব বাঙ্গালায় কোন ভয় নাই, কোন পৈশাচিক নিয়ম নাই। অদ্য পূর্ণিমা তুমি একবার বাঙ্গলায় যাও।

লক্ষ্মী যে আজ্ঞা বলিয়া উদ্যোগ করিতে কক্ষান্তরে গেলেন। নারায়ণ আনন্দোৎফুল্ল লোচনে লক্ষ্মীর অলক্তক শোভিত পাদপদ্ম দেখিতে দেখিতে সদর বাটীতে চলিলেন।

পরদিবস অপরাহ্নে নারায়ণ অন্তঃপুরে আসিয়া পরিচারিকাকে লক্ষ্মীর প্রত্যাগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারিকা বলিলেন, ভুবনেশ্বরী বাঙ্গালা হইতে আসিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার পীড়া বোধ হইয়াছে। শুনিতেছি জ্বর হইয়াছে, নারায়ণ ভাবিলেন, অনেক কালের বাঙ্গালিরা লক্ষ্মীকে গৃহে পাইয়া অতিরিক্ত আহার করাইয়া থাকিবে। স্ত্রীজাতি সর্বদাই লোভপরবশ; লোভ সম্বরণ করিতে না পারায় পীড়া বোধ হইয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে নারায়ণ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন লক্ষ্মী শিরঃপীড়ায় বড় কাতর, আর শ্লেষ্মায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নারায়ণকে দেখিয়া লক্ষ্মী কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, বাঙ্গালায় বড় কষ্ট পাইয়াছি। নারায়ণ বহুযত্নে সান্ত্বনা করিয়া বিরিন কোম্পানির দোকান হইতে হোমিওপাথির পলসাটিলা ঔষধি তৎক্ষণাৎ আনাইয়া একমাত্রা খাওয়াইয়া ছিলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। পরে নারায়ণের অনুরোধানুসারে আপন ক্লেশ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, প্রভো, বাঙ্গালায় যাইয়া প্রথমে আমি একটি মনোহর গৃহের উপবন দেখিয়া বড় প্রীতি লাভ করিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া হাসিতেছে—নিকটে ছোট ছোট ছেলেগুলি হাসিতে হাসিতে দৌড়িতেছে। গৃহাভ্যন্তর

আরো মনোহর ; কক্ষপ্রাচীর অমল শ্বেত, স্থানে স্থানে স্বর্ণবেষ্টিত পট, হর্ম্যতলে বিবিধ বিচিত্র আসন। সকল স্থানে দ্রব্য পরিষ্কার, পবিত্র, দেবতাদিগের নিমিত্ত রক্ষিত। কোথাও কোন অসুখ শব্দ নাই—কলহ নাই—সকলই শান্ত ; সকলে যেন আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি প্রসন্নভাবে বসিতে উদ্‌যোগ করিতেছি, এমত সময়ে সঙ্গিনী আমার অঞ্চল টানিয়া মৃদু স্বরে বলিল কর কি ? এ তোমার অবস্থিতির স্থান নহে, শিঘ্রি পলাও এম্লেচ্ছের গৃহ। আমি শুনিবামাত্রই পলাইলাম। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, ম্লেচ্ছ গৃহ যদি এরূপ পরিষ্কার, তবে না জানি হিন্দু গৃহ আরো কতই পরিষ্কার হইবে। বাঙ্গালি পূর্বাপেক্ষা কত উন্নত হইয়াছে। আমি বাঙ্গালায় আসি নাই—তাহাতে বাঙ্গালার কোন ক্ষতি হয় নাই।

এরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম এমত সময়ে সঙ্গিনী বলিল ; "এই গৃহে প্রবেশ করুন এ গৃহ হিন্দুর।" আমি প্রথমে কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করিলাম, কিন্তু শেষে সঙ্গিনীর কথানুসারে অন্দরে প্রবেশ করিয়া আমার নিমিত্ত রক্ষিত আসনে উপবেশন করিয়া চতুর্দিক অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখি ঘরটি অতিক্ষুদ্র, জলসিক্ত এবং অপরিষ্কার ; হর্ম্যতল সম্প্রতি প্রক্ষালিত হইয়াছে, সম্পূর্ণরূপে মার্জিত হয় নাই এবং গোময়সংযোগে তাহা আবার কর্দমময় হইয়াছে। তদুপরি দুই-একপদ বিচরণ করিয়াই আমার অলক্তক রাগ লুপ্ত হইল এবং তৎপরিবর্তে কর্দমের প্রলেপ লাগিল, বসিতে কষ্ট হইল, সংস্পর্শে তাহা আবার বস্ত্রে লাগিতে লাগিল। ঘরে কেবল গোময়ের দুর্গন্ধ। দেওয়ালের কোন কোনভাগে চুনকাম করা পরিষ্কার আবার কোনভাগ হইতে চুনকাম খসিয়া গিয়াছে, ইষ্টক দেখা দিতেছে এবং তাহার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া কীটপতঙ্গরা আশ্রয় লইয়াছে।

এই সকল দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছি যে, বাঙ্গলার হিন্দুরাই ম্লেচ্ছ, এমত সময়ে গৃহিণী আপন কন্যা ও পুত্রবধূ সমভিব্যহারে আমার আহারের নিমিত্ত নৈবেদ্যাদি আনিলেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ভাবিলাম, ইহারা এই গৃহের যোগ্য অধিবাসী বটে, যেমন ঘরের এক স্থানে চুনকাম একস্থানে ভগ্ন ইষ্টক তেমনি ইহাদের একস্থানে স্বর্ণালঙ্কার একস্থানে ছিন্নকদর্য্য মলিন বস্ত্র। তাহারা যে নৈবেদ্য আনিয়া রাখিল তাহা সেই গোময়সিক্ত স্থানের উপযুক্ত বটে ; কতকগুলা ভিজা চাল আর কতকগুলা অপক্ক কদলী ভগ্ন কাষ্ঠ পাত্রে আনিয়া ফেলিল। আমার সঙ্গিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার পর আরেকটি ক্ষুদ্র পাত্রে করিয়া আরেকজন মিষ্টান্ন আনিল। তাহাতে যে ক্ষীরের ছাঁচ ছিল, তাহার বর্ণপ্রায় গৃহবাসীদিগের বস্ত্রের বর্ণ অপেক্ষা নিতান্ত পরিষ্কার নহে। এবং ছানা বলিয়া যে একটি সামগ্রী ছিল তাহার অম্লগন্ধ গোময় গন্ধ ঢাকিয়া ফেলিল।

পরে এক মূর্খ পুরোহিত আসিয়া কি কতকগুলা বলিল। তাহা না আমি বুঝিতে পারিলাম; না গৃহিণী, না সেই পুরোহিত স্বয়ং বুঝিতে পারিল। পরে শুনিলাম সে গুলিন পূজারমন্ত্র; এককালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; পরে পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করায় তাহার অনেক বর্ণ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক পুরোহিত চলিয়া গেল; গৃহস্থেরা আহারান্তে শয়ন করিল। আমি আর সঙ্গিনী অভুক্ত ও জাগ্রত রহিলাম। দীপ অনেকক্ষণ নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। গবাক্ষ দিয়া চন্দ্র কিরণ আসিয়া সঙ্গিনীর শ্বেত অঞ্চলে পড়িয়াছে। আমি অন্যমনস্কে তাহাই দেখিতেছিলাম, এমত সময়ে কতকগুলা ইন্দুর আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে কীট-পতঙ্গ সকলেই স্ব স্ব স্থান হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। সঙ্গিনী বলিল, চল আমরা পালাই। আমি ভাবিলাম, যখন প্রভু অনুরোধ করিয়াছেন তখন যতই কষ্ট হউক আমি সমস্ত রাত্রি এখানে থাকিব এবং সেইমত সঙ্গিনীকে বলিলাম। কিন্তু ভিজা ঘরে থাকায় ক্রমে শ্লেষ্মায় আমার শরীর অবসন্ন করিতে লাগিল, শিরঃপীড়া আরম্ভ হইল। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই রাত্রি শেষ হইল। কক্ষান্তর হইতে ছেলেরা কলরব করিতে লাগিল। গৃহিণী নিদ্রাভঙ্গে ভক্তিভাবে পঞ্চবেশ্যার নাম করিতে লাগিলেন। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ পলাইয়া আসিলাম। বাঙ্গালার কি অধঃপতন হইয়াছে। বাঙ্গালায় বেশ্যারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। বাঙ্গালায় মূর্খধর্মোপদেশকগণ কুলকামিনাদিগকে শেষ এই ঘৃণিত শিক্ষা দিয়াছেন। এক্ষণে বুঝিলাম যে বাঙ্গলায় সরস্বতীর গতায়াত সত্যই বড় অল্প এবং অল্প বলিয়া পাষণ্ডরা আপনাদিগকে পণ্ডিত পরিচয় দিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছে। বাঙ্গলায় সরস্বতীর যাতায়াত নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহার অভাবে যে, দেশের এরূপ অধঃপতন হয়, এরূপ নীচ শিক্ষা হয়, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, প্রভো! সত্য বলিতেছি, আমি তাহা জানিতাম না এবং তাহা না জানিয়া একাল পর্যন্ত সরস্বতীর সহিত বিরোধ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার সম্মুখে আমি স্বীকার করিতেছি আর আমি তাঁহার সহিত বিরোধ করিব না, তাঁহার সহচরী স্বরূপ থাকিব; তিনি যেখানে অগ্রে যাইবেন, আমি সেইখানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব।

সরস্বতীর প্রতি লক্ষ্মীর এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া নারায়ণ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন এতকালের পর যে একথা বুঝিলে ইহা জগতের পরম ভাগ্য। এশুভ সম্বাদ বাঙ্গলার জানাইবার নিমিত্ত আমি ভ্রমরকে নিযুক্ত করিলাম। ভ্রমর ঘরে ঘরে এই কথা গুন্ গুন্ করিয়া বলিবে। ইতি

"ভ্রমর"

চৈত্র ১২৮১/১ম খণ্ড ১২ সংখ্যা

১০

স্ত্রী জাতির বন্দনা।

হে দেবি, এ-বঙ্গভূমে তুমিই একা জাগ্রত ; অতএব তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি সর্ব্বব্যাপিনী! কেননা সকল ঘরে আছ। তুমি অন্নপূর্ণা! কেননা তুমি আপনার উদর অন্নে পূর্ণ করিয়া থাক ; তুমি অভয়া! কেননা তুমি পতির বাবাকেও ভয় কর না।

তুমি দিগম্বরী! যে অবধি শান্তিপুরে ধুতি উঠিয়াছে।

তুমি রক্ষাকালী! কেননা পতির পরমায়ুঃ তুমি বামকরে রক্ষা করিতেছ।

তুমি মহামায়া! কেননা জ্ঞানী কি অজ্ঞানী তুমি সকলকে ভুলাইয়াছ।

তুমিই পুরুষের চক্ষু, তুমিই কর্ণ, তুমিই জ্ঞান ; তাহারা আপন চক্ষে যাহা দেখে তাহা মিথ্যা ; আপন কর্ণে যাহা শুনে তাহা বৃথা।

এ সংসারে তুমিই কর্ণধার। কেননা তুমি সকলের কর্ণ ধরিয়া চালাইতেছ।

তোমার নিমিত্ত সকলে মোট বহিতেছে ; তোমারই নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব ভিক্ষার ঝুলি বহিয়াছেন।

হে দেবি! তুমি স্পষ্ট করিয়া বল তোমার বীজমন্ত্র ওঁকার, না অলঙ্কার?

হে সুরুচি! তোমার স্বরূপ বল, মৎস্যের "নোজা" ভালবাস কি প্রতিবাসীর "মুড়া" ভাল বাস?

হে দেবি! তুমি মনে করিলে সকলের মুণ্ড ঘুরাইতে পার—কথায় ; পৃথিবী—ভাসাইয়া দিতে পার—রোদনে! পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইতে পার—কলহে।

"ভ্রমর" বৈশাখ—১২৮৬।

ভাদ্র—১২৮১

লেখক—শ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

১১

ষট্ কারক

ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে কারক বলে। পৃথিবীতে অনেক লোক আছে তাহাদের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় অর্থাৎ সম্পর্ক নাই। তাহারা কোনদিনও কোন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় নাই, এবং লিপ্ত হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। তাহাদিগকে এই নিমিত্ত কারক বলিতে পারি না। তাহাদিগকে উপসর্গ কিংবা উপপদ বলা যায় কিনা, ইহা বিচার্য্য রহিল।

ষট্ কারকানি—

অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম, কর্ত্তা এই ছয় কারক।

অপাদান।

যতো বিশ্লেষঃ । ১।

যাহা হইতে বিশ্লেষণ অর্থাৎ একেবারে ছাড়াছাড়ি হয় তাহাকে অপাদান কারক বলে।

এই সূত্রানুসারে সম্প্রদত্তা কন্যা এবং দত্তকপুত্র এই দুয়ের সম্বন্ধে জনক জননী এবং দেশী খৃষ্টিয়ান, উচ্ছেদশীল নব্য সভ্য এবং বিলাতিবাবু এই তিনের সম্বন্ধে পিতৃকুল, পৈত্রিক আচার ব্যবহার এবং দেশীয় সমাজ অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

ভয়হেতুঃ । ২।

যাহা হইতে ভয় হয় তাহাকে অপাদান বলে। বালকের অপাদান মাষ্টার মশায়, কারণ তিনি কথায় কথায় মুষ্টিঘাত করেন; নবোঢ়া বধূর অপাদান শাশুড়ী কিংবা নবরঙ্গিনী ননদিনী, কারণ তাঁহারা কাজে অকাজে ঝঙ্কার দেন। বৃদ্ধের অপাদান যুবতী ভার্য্যা কারণ তাঁহার আরক্ত অপাঙ্গ বক্রগ্রীবা এবং ক্রোধ স্ফুরিত অধরবিম্ব দর্শন করিলেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে; বনে অপাদান ব্যাঘ্র, কাছাড়িতে অপাদান হাকিম, এবং বাঙালির অপাদান শ্বেতাঙ্গ ফিরিঙ্গী। গরিব ভদ্রলোকের পক্ষে চাকর মশায়ও অপাদান বিশেষ।

যত অপাদানম্‌ । ৩ ।

যাহা হইতে আদান অর্থাৎ উশুল করা হয় তাহাকে অপাদান বলে।

জামাইবাবুর পক্ষে এই অর্থে শ্বশুর এক চমৎকার অপাদান। গুরুর অপাদান শিষ্য, যত ইচ্ছা তত উশুল করিয়া লও। কথাটিও বলিতে পারিবে না। কোন নূতন রকম টেক্সের বেলায়, সরকার বাহাদুরের অপাদান জমিদার, জমিদারের অপাদান তালুকদার, তালুকদারের অপাদান হাওলাদার এবং সকলের শেষ অপাদান মাঠের কৃষক। ইংলণ্ডের সম্বন্ধে ভারতবর্ষ আজকাল বড় সন্তোষজনক অপাদান হইয়া উঠিয়াছে। অলঙ্কার উশুল করিবার সময় স্ত্রীর পক্ষে স্ত্রৈন স্বামীকেও অপাদান বলা যাইতে পারে।

ভুবঃ প্রভবঃ । ৪ ।

আবির্ভাব ভূমি অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ স্থান অপাদান হয়।

যে স্থানে কতকগুলি লোক একত্র উপবেশন করে, এক মনে কি বলে, আর সকলে করতালি দিয়া দশ দিগ পূর্ণ করিয়া লয়, তাদৃশ স্থানকে অপাদান বলি। কারণ তথায় অনেকের মাহাত্ম্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অর্থে আরও অনেক প্রকারের স্থান অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সম্প্রদান।

যস্মৈ দানম্‌—।

যাহার উদ্দেশে দান করা যায় তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। সংসারে সম্প্রদান কারকের অভাব নাই। সকলেই কাহারও না কাহারও নিকট, কোন না কোন সময় সম্প্রদানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন। দুর্গাপূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়ার সময়ে সম্প্রদান কারকের উৎপীড়নে দ্বার অবরোধ করিতে হয়। সম্প্রদানের মধ্যে এদেশে গুরু, পুরোহিত, ভাট, বামন, বৈষ্ণব ও ভিক্ষুক প্রভৃতিরই বিশেষ গণনা। বঙ্গের মহারাজ গুরুরা সম্প্রদানের শিরোমনি। কোন দেশেই অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মত সম্প্রদান আবির্ভূত হয় নাই। ছাত্রকে চপেট এবং অশ্রুপূর্ণ নয়না অসহায়া বৃদ্ধা জননীকে গালাগালি দিতে হইলে, তাঁহাদিগকে সম্প্রদান বলা যায় কিনা, ইহা মীমাংসিত হয় নাই। খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটং দদাতীতি ভাষ্য প্রয়োগানুসারে পূর্বোক্ত স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞার ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিলাতে সম্প্রদানদিগের উপর বড় শাসন। তাহাদিগকে রাজপথে দাঁড়াইয়া লোককে জ্বালাতন করিতে দেয় না। তাহারা কাগজ ছাপাইয়া আড়ম্বর সহকারে দান গ্রহণ করে। অতএব তাহারা মহাসম্প্রদান।

সাধকতমং করণং।

পরকীয় ক্রিয়া নিষ্পত্তির যে সর্বপ্রধান সাধক তাহাকে করণ কারক বলে।

করণ কারক অলস ও নিষ্ক্রিয় নহে। সে সর্বদাই ভাল কি মন্দ কোনরূপ ক্রিয়ায় সংক্ষিপ্ত থাকিবে। কিন্তু সে ক্রিয়া তাহার নিজের নহে। কর্ত্তা তাহাকে যেভাবে যে ক্রিয়ায় নিয়োগ করেন, সে সেইভাবে সেই ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়। রাখালের হাতে লড়ি, বাজিকরের হাতে পুতুল, দেওয়ানের হাতে জমীদার মহাশয়, আমলার হাতে গবুচন্দ্র সাহেব, স্ত্রীর হাতে নির্ব্বোধ স্বামী, ইঁহারা করণ কারক। কর্ত্তারা যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন ইঁহারা তাহার সহায়তা করেন। কলুর বলদ করণ কারক, তেল কাকে বলে তা চক্ষে দেখিতে পায় না, অথচ দিবারাত্র ঘানি টানে। অফিসের কেরণী এবং আদালতের মোহরের করণ কারক ; কি লেখে তা বুঝে না। অথবা বুঝিতে চায় না, কি বুঝিবার অবসর পায় না, অথচ সকল সময়েই লেখে। দলপতির হাতে ভক্তিডোরে বান্ধা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভক্তেরা করণ কারক, তাহাদিগের উদরে প্রকৃত কর্ত্তা যে দুই চারিটি বুলি ফুৎকার সহ পূরিয়া দেন, তাহারা তাহাই সকল স্থানে সতত বলিয়া বেড়ায়, এবং বলিয়া বলিয়া বালক ভুলাইয়া দলনাথের দলপুষ্টি করে। চাটুপটু ব্যক্তিরা, চাটুবাক্যে মনমোহন করিয়া, যাহার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়, সে করণ কারক, স্তুতিবাদের শ্রুতিসুখাবহ সুমধুর ধ্বনিতে হৃদয় বিমোহিত হইলে লোকে অতি সহজেই কর্ত্তৃত্বে বঞ্চিত হইয়া করণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাকরণ অনুসারে করণ কারক আরও অনেক আছেন, তাহাদিগকে সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদিগের সকলের নাম সংকলন না করিয়া এ স্থলে দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল।

অধিকরণ।

আধারোঽধিকরণম্।

ক্রিয়ার যে আধার, তাহাকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারক শয়ন মন্দিরের খট্টার ন্যায় কোন একস্থলে পড়িয়া থাকিবেন, কর্ত্তা তাঁহার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া লোককে নিমন্ত্রণ খাওয়ান। অনুষ্ঠিত কার্য্যের গুণ ও যশটুকু কর্ত্তার, দোষ ও অপযশখানি অধিকরণের। ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে হইলে, অধিকরণ কারককে কোন কোন অর্থে Scape goat বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়, কারণ সকলেই সকল কর্ম্মের মন্দ ফল অধিকরণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া থাকেন।

যে স্থলে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকেও অধিকরণ বলে, যাহা গৃহে উপবেশন করিয়াছে, এই বাক্যে গৃহ অধিকরণ কারক। এদেশের পুরুষেরা পূর্ব্বকালে অরণ্যে তপশ্চরন করিতেন, রণক্ষেত্রে সম্মুখযুদ্ধে বিক্রম দেখাইতেন এবং অন্তঃপুরে পুরবাসিনী-দিগের সন্নিধানে বিনীতভাবে অবস্থিত থাকিতেন। তখন অরণ্য, রণক্ষেত্র, এবং

অন্তঃপুর যথাক্রমে তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যা, বিক্রমপ্রকাশ এবং বিনয় প্রদর্শনরূপ ক্রিয়ার অধিকরণ ছিল। তাঁহারা এইক্ষণ বহু লোকাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ সভাস্থলে তপস্যা করেন, বিক্রমপ্রকাশ অর্থাৎ জাকপাক জাহির করিতে হইলে, অবগুণ্ঠনাবৃতা অন্তঃপুর সুন্দরী-দিগের সম্মুখীন হন, আর পদাঘাত সহিয়াও পরাক্রান্ত শত্রুর নিকট বিনয় ও নম্রতা দেখান। সুতরাং সভাস্থল অন্দরমহল এবং শত্রু সান্নিধ্যই ইদানীং বিপরীত রীতিক্রমে তাঁহাদিগের প্রাগুক্ত ক্রিয়াত্রয়ের অধিকরণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপ যে ঘটিবে তাহা পূর্ব্বতন টীকাকারেরা বুদ্ধির অল্পতাহেতু অনুমান করিতে পারেন নাই।

কর্ম্ম।

কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।

কর্ত্তা যেটাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাকে কর্মকারক বলে। এই অর্থানুসারে ছাগ, মেষ প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রিয় বস্তুকে কর্মকারক বলা যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা পুরুষকার পরিহার করিয়া ছাগ মেষের মত জীবন যাপন করেন, তাঁহারাও কর্ম্মকারক। কর্ম্মকারকের আর একটি অপেক্ষাকৃত সচল সংজ্ঞা আছে, তাহা এই—

ক্রিয়য়াক্রান্তং কর্ম্ম।

কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা যে আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ কর্ত্তার ক্রিয়া যাহার গায়ে যাইয়া ঠেকে তাহাকে কর্ম্মকারক বলে। ইংরেজেরা বিলাতে ক্রিয়া করেন। সেই ক্রিয়া, সাগরপার হইয়া, পাহাড় ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া ঠেকে, অতএব ভারতবর্ষবাসীরা এই সম্বন্ধে কর্মকারক। গোসাঞি প্রভু আসরে নামিয়া, বাহু নাড়িয়া বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করেন। শ্রোতৃবর্গ অশ্রুধারায় আকুল হইয়া একে অন্যের অঙ্গে গড়াইয়া পড়ে। কোন বক্তা সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া গগনভেদি তারস্বরে দুটো কথা ছাড়িয়া দেন; আর অজাতশ্মশ্রু বালকবৃন্দ প্রমত্তবৎ নাচিয়া উঠে। কেহ কবিকল্পিত কবিবরের ন্যায় সভ্যতা শিক্ষার অভিলাষে দু চারিদিন দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া দেশে আসিয়া কি দুই একটা চিহ্ন প্রদর্শন করেন এবং সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়। ইহারা সকলেই কর্ম্মকারক; কারণ ইহারা অন্যদীয় ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

যাহারা বুদ্ধিমত্বেও পরের বুদ্ধিতে চলে, চক্ষুষ্মত্বেও পরের চক্ষে দেখে, অন্যে খাওয়াইলে খায়, আপনি কখনও আহারের অন্বেষণ করে না—অন্যে উঠাইলে উঠে, আপনি উঠিবার জন্য যত্নপর হয় না, চরণে আঘাত কর, তাহা সহিয়া লইয়া, সেই চরণই লেহন করে, তাহাদিগকেও কর্ম্মকারক বলি। বাঙালী সর্ব্বত্রই কর্মকারক, গৌরাঙ্গদিগের নিকট বিশেষতঃ।

কর্ত্তা।

স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।

যে আপনার ক্রিয়াতে কখনও পরতন্ত্রতা স্বীকার করে না, আপনিই স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয়, তাহাকে কর্ত্তৃকারক বলে।

অথবা:

ক্রিয়া সম্পাদকঃ কর্ত্তা।

যিনি আলস্যকীট কিংবা বাইলোষ্ট্রের ন্যায় কোথাও পড়িয়া থাকেন না অথবা বাত্যোত্থিত তৃণের ন্যায় পরকীয় শক্তিতে ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়েন না কিন্তু স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জগতে স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করেন তাঁহাকে কর্ত্তা বলি।

যেমন খগসমাজে গরুড় আর পশুসমাজে সিংহ, সেইরূপ কারক মধ্যে অথবা মনুষ্য সমাজে কর্ত্তা। যাঁহারা কর্ত্তৃকারক বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যায়। তাঁহাদিগের ললাট প্রশস্ত, মস্তক উন্নত, দৃষ্টি মর্ম্মস্পর্শিনী, বুদ্ধি গভীর, আত্মা উদ্যমপূর্ণ, আকাঙ্ক্ষা অতীব উচ্চ, বাক্য অর্থযুক্ত এবং গতি স্বাধীনতা ব্যঞ্জক। কি তাঁহাদিগের দেহ, কি তাঁহাদিগের মন, কিছুই পরকীয় লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত নহে। তাঁহাদিগের আলস্য নাই, ঔদাস্য নাই, আহার নিদ্রায় দৃক্‌পাত নাই এবং কালাকাল ভেদ নাই। তাঁহারা সকল সময়েই কার্য্যলিপ্ত। কর্ত্তা নিকটস্থ হইলে কর্ম্মকরণাদি অন্যান্য সমস্ত কারক আপনা হইতেই পদানত হইয়া পড়ে। কর্ত্তাদিগের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু ভালমন্দ উভয়ই অবিসংবাদিত রূপে কর্ত্তা। যথা—মেরাট ও ওয়াশিংটন, হেমডন ও রবিস্পিয়ার ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট।

অবস্থাবশাৎ কারকাণি।

যে স্থলে যে কারক বিহিত হইল, অবস্থাবশতঃ কোন কোন সময়ে তাহার অন্যথাভাব ঘটিয়া থাকে। যথা—কেহ পুরুষ সমাজে কর্ম্মকারক, নারীসমাজে কর্ত্তৃকারক আর সুচতুর বুদ্ধিমানের হস্তে করণকারক। বাঙালি জমিদার হুজুরদিগের মধ্যে অনেকেই অধীনবর্গের নিকট কর্ত্তৃকারক তখন গর্জ্জনে বজ্রধ্বনিও নীচে পড়ে; সাহেবদিগের নিকট কর্ম্মকারক, করণ সর্ব্বদাই শ্বেতাঙ্গ পদারবিন্দে প্রণত দেখি। বক্তব্য—যাহারা পরের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তৃত্ব করে তাহাদিগকে প্রযোজ্য কর্ত্তা বলে। পূর্ব্বতন ভারতবাসীরা স্বকীয় ক্ষমতায় স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতেন, অতএব তাঁহারা প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন। ইদানীন্তন ভারতবাসীরা পরের ক্ষমতায় পরকীয় প্রণোদনে কর্ত্তৃত্ব করেন অতএব তাঁহারা প্রযোজ্য কর্ত্তা। পরে চালায় বলিয়া তাঁহারা রেলের গাড়িতে চলেন, পরে দেখায় বলিয়া তাঁহারা গ্যাসের আলো দেখেন ইত্যাদি।

উপসংহার—বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র মানব জীবন রূপ অবিনাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য এই কারক প্রকরণ পাঠ করিবেন তাঁহাদিগের প্রতি পরিশেষ উপদেশ এই, তাঁহারা যেন সকলেই কর্ত্তৃকারকের পদলাভে কায়মনোবাক্যে যত্নপর হন। পরের হাতে করণকারক হইয়া জীবনযাপন করা অথবা কাহারও ক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদাই কর্ম্মকারকের জীনদশায় পড়িয়া থাকা বড়ই বিড়ম্বনা।

বিবাহ (২) ব্যাকরণ রহস্য

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত 'প্রমোদলহরী' হইতে

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র এক অতলস্পর্শ অপার জলধি। উহা শুধু ব্যাকরণ কিংবা ভাষা বিজ্ঞান নহে। উহার অভ্যন্তরে স্মৃতি, নীতি—সাহিত্য, সংগীত—যোগ, ভোগ,—এবং ইতিহাসাদি আরও কত শাস্ত্রের কত নিগূঢ় রহস্য নিহিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে আমার জড়বুদ্ধি বিস্ময়ে আরও জড়ীভূত হইয়া পড়ে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, আধুনিক সমাজতত্ত্বেরও অনেক গভীর কথা, উহার গভীর জলের অন্তস্তলে উপলখণ্ডের ন্যায়, লুক্কায়িত আছে। এখানে দুই একটি সূত্র তুলিয়া উদাহরণ দিব। যাঁহারা ব্যাকরণে নিতান্ত বিদ্বেষী, তাঁহাদিগেরও ভীত হইবার কারণ নাই। কারণ, সূত্রগুলি সাধারণতঃ সরল ও সুখ-পাঠ্য এবং কখনও কখনও ঠিক কবিতারই মত কোমল ও কাম্যপ্রদ। যথা,—

"দশ সমানা:"

অর্থাৎ দশজনকে লইয়া সমাজ সুতরাং সমাজে দশজনই সমান।*

এই এক সূত্রেই সাম্যবাদের সারোদ্ধার ও শেষ সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে পরিব্যক্ত হইয়া রহিল। ইহার পর আর, সামাজিকদিগের মধ্যে একজনে আর একজনের উপর বড়াই করিবে কি বলিয়া? যাহার অর্থ আছে, তাহার হয়ত বিদ্যা নাই। যাহার বিদ্যা আছে তাহার হয়ত অর্থ নাই। তুমি জাতিতে বড়, কিন্তু চরিত্রে ছোট, আর একজন জাতিতে ছোট হইয়াও চরিত্রে বড়,—চরিত্রের মহত্ত্বে তোমার গুরু স্থানীয়। কাহারও রূপ আছে গুণ নাই, কাহারও গুণ আছে ত রূপ নাই। কেহ সোনার সিংহাসনে বসিয়াও প্রকৃতির নীচতায় পিশাচ-সদৃশ; কেহ কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও জ্ঞানের জ্যোতি এবং প্রকৃতির উচ্চতায় রাজ রাজেশ্বর।

কিন্তু যদিও সকলেই সমাজের গাঁথনিতে সমান, তথাপি সেই দশজন সামাজিকের মধ্যেও সবর্ণতা অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ সজাতীয়তা কেবল যোড়ায় যোড়ায়। যথা,—

"তেষাং দ্বৌ দ্বাবন্যোন্যস্য সবর্ণৌ"

অর্থাৎ, ইতঃপূর্ব্বে যে দশজনের কথা কথিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা দুইটি দুইটি করিয়া, যোড়ায় যোড়ায় একে অন্যের সবর্ণ।*২

এই যে যোড়াবান্ধা যুগলভাবের উল্লেখ হইল, ইহাই দাম্পত্য ধর্মের মূলসূত্র। কেন না, জগতে দম্পতি অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী ভিন্ন কে আর কার সহিত যোড়াবান্ধা যুগল বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে? স্বামী স্ত্রী শুধুই পরস্পরের সমান নহে; কিন্তু তাহারা সমান অথচ পরস্পরের সবর্ণ। হা মিল! তুমি কোথায়? তুমি স্বামী স্ত্রীর সাম্য এবং স্ত্রী জাতির সমান অধিকার বিষয়ে যত কিছু লিখিয়া গিয়াছ, ভারতের একজন বৈয়াকরণ যে, তোমার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এত অল্পাক্ষরে তাহা সূত্রে গাঁথিয়া গিয়াছেন, ইহা তুমি স্বপ্নেও জানতে পাও নাই।

দম্পতির এই সাম্যনীতির মধ্যে আরও কত গূঢ় কথা আছে, তাহারও আলোচনা কর। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সমান, পরস্পরের সবর্ণ, অথচ আবার তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরে একটুকু বিচিত্র পার্থক্য আছে। যথা—

"পূর্ব্বো হ্রস্বঃ, পরো দীর্ঘঃ।"*৩

অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-সম্পদের সকল কথায়ই স্বামী একটুকু হ্রস্ব এবং স্ত্রী একটুকু দীর্ঘ। স্বামীর কণ্ঠধ্বনি যেখানে নিখাদে পড়িয়া থাকে, স্ত্রীর মধুর কণ্ঠের মোহন-ধ্বনি, সেখানে ধৈবতের হুঙ্কারে উঠিয়া, প্রেমের বীণায় নানারসে ঝঙ্কার দেয়। সূত্রকার এখানে স্বামীকে ছোট বলেন নাই, কারণ, তাহা হইলে সে কথা সাম্যবাদের বুকে বাধিত। তিনি ছোট না বলিয়া হ্রস্ব বলিয়াছেন! সুতরাং এ হ্রস্বতা নিশ্চয়ই 'স্বর-পক্রিয়া' বিষয়ক। এ স্থলে এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে এই রস-মধুরা দীর্ঘতা কেন? ব্যাকরণে ইহারও উত্তর আছে। স্ত্রী দ্রবময়া,—

"স্ত্রী নদীবৎ"

বঙ্গদেশের বিদ্যারত্ন ও তর্কবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ যে কেন শুধু ব্যাকরণের*৪ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়াই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন, এই একটি সূত্রের অর্থবিবৃতিতেই তাহার প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইতেছে। সূত্রটি কেমন মনোজ্ঞ, কি মধুর!

স্ত্রী নদীবৎ

অর্থাৎ স্ত্রী নদীর মত, অথবা স্ত্রী আর নদী সমান।*৫ প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, এক দেশের এক রাজার ছেলে, তাঁহার বিদ্যাভিমানিনী বিনোদিনীর

কাছে শব্দার্থের বিচারে অথবা স্বর প্রক্রিয়ার অনুচিত দীর্ঘতায় পরাভব পাইয়া, প্রাণ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এবং তারপর তাঁহার গুরুদেব*৬ আসিয়া তাঁকে এইরূপ কএকটি সূত্র শিখাইয়াই সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞ করিয়া তুলেন। এ কাহিনীটি ইতিহাসের চক্ষে সত্য কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই শেষোক্ত সূত্রটি যেরূপ হৃদয়গ্রাহী, রস-ভাব-গভীর এবং রহস্যপূর্ণ, তাহাতে ইহা সহজেই অনুমিত হইতেছে যে, সেই পদাঘাত পীড়িত "প্রণয়-ব্রীড়িত" রাজনন্দন, ইহা পাঠ করিয়া আর কোন শাস্ত্রে পদ-প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া না থাকিলেও, সমাজ বিজ্ঞানের পুরাতন তত্ত্বে অতি সহজেই পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

স্ত্রী নদীবৎ! অহো কি জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য। অহো কি সূক্ষ্মানুসন্ধান। কিবা দার্শনিক কিবা বৈজ্ঞানিক, সকলকেই এই সূত্রার্থের নিকট মাথা নোয়াইতে হইতেছে। কে এই সূত্রের প্রতিবাদ করিবে? স্ত্রী প্রকৃতই নদীর ন্যায়। কোথাও মৃদুবাহিনী, মৃদু-মধুর-হাসিনী, কুলু-কুলু কল-নাদিনী; কোথাও তরঙ্গ-ভঙ্গি ভয়ঙ্করা তটঘাতিনী কূল-নাশিনী, কোথাও পবিত্র তীর্থস্বরূপা, প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী; কোথাও প্রমোদ-লীলাময়ী ভোগবতী; কোথাও ক্ষীণতোয়া সরস্বতী*৭; কোথাও করতোয়া* কর্ম্মনাশা, অথবা তপতী*৮ কি ইরাবতী। যদি সুখে, সোহাগে কিংবা স্বর-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে চাও, তাহা হইলে স্ত্রীই নদী। যদি দুঃখে একেবারে ডুবিয়া রহিতে চাও, তাহা হইলেও স্ত্রীই নদী। কিন্তু, আমি এই দুইয়ের সাদৃশ্য বর্ণন লইয়া আর বৃথা শ্রম করিতে যাইতেছি কেন? যাঁহারা ব্যাকরণের আলোকে বিজ্ঞান পড়িয়াছেন, অথবা বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাকরণের সূত্রার্থ বুঝিতে যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন যে,—স্ত্রী নদীবৎ।

সূত্রার্থে যেমন ব্যাকরণের অপূর্ব্ব বৈভব, শব্দার্থের ব্যুৎপত্তিতেও ব্যাকরণের তেমনই অপরূপ গৌরব। একমাত্র দুহিতা শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই এই কথার প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে পার।

ব্যাকরণে যাঁহার সামান্য দৃষ্টি আছে, তিনিই জানেন যে, দুহিতা এই শব্দটি দুহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এবং দুহ ধাতুর অর্থ দোহন। ইয়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ শাব্দিকেরা, এই দুহ ধাতুর উপর দৃষ্টি রাখিয়া, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যখন প্রাচীন আর্য্য সন্তানেরা কৃষিকার্য্যের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন, তখন তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই গোস্বামী অর্থাৎ বহুসংখ্য গোরুর অধিপতি ছিলেন। গৃহস্থ সমস্ত দিন ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিতেন, কন্যাটগৃহে থাকিয়া গো দোহনে ব্যাপৃত রহিতেন। এই নিমিত্তই গৃহস্থের নাম ক্ষেত্রপাল এবং এই নিমিত্তই কন্যার নাম দুহিতা। প্রিয়তম জ্ঞানানন্দও দুহ

ধাতুকেই দুহিতা শব্দের মূল বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি অন্তরূপে ধাত্বর্থের ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার মতে পিতৃকুলরূপ কামধেনুকে দোহন করাই দুহিতার প্রধান কার্য্য ; এবং যিনি পিতৃকুলকে যে পরিমাণে অধিক দোহন করিতে পারেন, তিনিই সেই পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দুহিতা। ইহার কোন্ অর্থ অধিকতর সঙ্গত, তাহা লইয়া এইক্ষণ বিচার কি বিতণ্ডা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ইহার যে অর্থই স্বীকার কর, তোমাকে অবশ্যই ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, ব্যাকরণ শাস্ত্র সর্বতো-ভাবেই সমাজবিজ্ঞানের ভাষ্য প্রদীপ।

বিবাহ সম্বন্ধেও ব্যাকরণে এইরূপ অনেক মৌলিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। বিবাহ কি ?—বিবাহ কেন ?--বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে ? এই সকল কথা লইয়া সকলেই ইতিহাসাদি অন্ধশাস্ত্রের আলোড়ন করিয়া থাকেন ; এবং ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কেহই ব্যাকরণের উজ্জ্বল আলোকে এই জটিল বিষয়ের মূলতত্ত্ব পাঠ করিতে যত্নপর নহেন। কিন্তু আমার এইরূপ বোধ হয় যে, ব্যাকরণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে উল্লিখিত সমস্যাত্রয়ের সুচারু মীমাংসা করিতে মুহূর্ত্তেরও বিলম্ব হয় না।

ব্যাকরণের মতে বিবাহ কি ?—না, প্রবাহ। বিবাহে জীব-প্রবাহ, বিবাহে সংসার প্রবাহ এবং বিবাহেই সাংসারিক সুখ-দুঃখের চিরপ্রবাহ। বিবাহ না থাকিলে, এই সৃষ্টিপ্রবাদ প্রস্রবণেই শুকাইয়া যাইত, জীব ও জীবনের প্রবাহ নিরুদ্ধ রহিত, এবং বিশ্ব-জগতের পরমাণু পুঞ্জ উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত্তে অনন্ত কাল নৃত্য করিত ! সুতরাং বিবাহ আর জীবন-প্রবাহ এক কথা।*১০ বিবাহ না থাকিলে, এই সংসারে লতা থাকিত না, পাতা থাকিত না, ফুল থাকিত না, ফল থাকিত না, বন থাকিত না, উদ্যান থাকিত না, বনে বৃক্ষ থাকিত না, উদ্যানে অঙ্কুরের উদ্যম থাকিত না, জলে মাছ থাকিত না, আকাশে পাখী উড়িত না, সুতারাং এই বিবাহই এই সংসার।*১১ এবং সাংসারিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের আদিপ্রবাহ। বিবাহ না থাকিলে, প্রেমিকের প্রেম থাকিত না, বিরহীর বিরহ থাকিত না ; কবির কাব্য থাকিত না, কবিতায় কুটিল কটাক্ষের কথা থাকিত না, পৃথিবীতে পরিবার-বন্ধন এবং পারিবারিক সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ কিছুই থাকিত না, সুতরাং বিবাহই *১২ সুখ-দুঃখের চিরপ্রবাহ। উহা কাহারও ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ প্রবাহ এবং অনেকের ভাগে সুখ-দুঃখের মিশ্রিত প্রবাহ। কিন্তু উহা যে সর্বাংশেই একাই তর-তর বাহী অথবা মন্থরগামী প্রবাহ ;—জোৎস্নার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত অথবা অন্ধকারের অবসাদে আবৃত সজীব প্রবাহ, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বিবাহ কেন ? অর্থাৎ বিবাহের মূল উদ্দেশ্য কি ?—না, নির্বাহ। বিনা বিবাহে মনুষ্যের জীবন-নির্বাহের কিছুই সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখ।

যাহাকে সাধারণ লোকে সাধারণতঃ জীবন যাত্রা বলে, আমি শুধু তাহারই কথা বলিতেছি না। কিন্তু পৃথিবীর অসাধারণ লোকেরা অসাধারণভাবে *১৩ যাহাকে জীবনের চরম লক্ষ্য ও নরম গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারও নির্বাই বিষয়ে বিবাহই প্রধানতম সাধন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেন না, বিনা বিবাহে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মনুষ্যোচিত প্রীতি, ভক্তি, মহত্ব, মাধুর্য, উদারতা ও সৌন্দর্য-প্রিয়তা প্রভৃতি ভাবের পরিপূর্ণতা লাভ অসম্ভব, সুতারাং, ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, বিবাহেই মনুষ্যের নির্ব্বাহ, —আশার নির্ব্বাহ, আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাহ, জীবনযাত্রার নির্ব্বাহ, জীবনের উন্নতি ও গতি এবং নিত্য নূতন বিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের নির্ব্বাহ।

বহু বিবাহ যাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্যবসায়, অর্থাৎ যাহারা দালালি ও ঘটকালি, কিংবা ওমেদারি ও চাটুকারি প্রভৃতি কোন রূপ সভ্রান্ত বিষয়কার্য্য, অথবা সভ্য মহলে অশ্লীল কথার, নব্যমহলে অদৃশ্য মদিরার ও অভব্য ছেলেমহলে অন্তঃশোষক সুদের বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুই না করিয়া বিবাহের প্রসাদাৎই পঞ্চব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন—এবং যাঁহারা নিজ নিজ পত্নীদিগকে পত্নীতালুক মনে করিয়া খাতায় তাঁহাদিগের নামধাম ও আয়ব্যয়ের তালিকা রাখেন, তাঁহারা হয়ত সাধারণ মতেরই পোষকতা করিয়া বলিবেন যে, বিবাহই যে নির্ব্বাহ এই স্বতঃসিদ্ধ ও চিরপ্রসিদ্ধ কথার প্রামাণিকতার জন্য এত পুঁথিপত্র এবং এত লেখক ও ভাবুকের নাম করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নটি আপাততঃ নিতান্ত সহজবোধ না হইতে পারে। কিন্তু আমি প্রথমেই ইঙ্গিতে ইহার উত্তর করিয়াছি এবং এইক্ষণ স্পষ্টতার অনুরোধে অধিকতরা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে নির্ব্বাহ বলিলে তাঁহারা যাহা বুঝেন, জ্ঞানভ্রান্ত অসাধারণের তাহা বুঝেন না। প্রাচীন শাস্ত্রভ্রান্তেরা ভার্য্যাকে শরীরার্দ্ধ *১৪ মনে করিয়া জীবন-নির্ব্বাহের যেরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, আমিও এ স্থলে প্রেমভ্রান্তিতে নির্ব্বাহ শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। যদি তাহা না করিয়া শাল বনাত, খাট পালঙ, গাড়ী ঘোড়া, বাড়ীঘর, অথবা দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণা লাভকেই নির্ব্বাহ বলিয়া স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে আমি বিবাহের পরিবর্ত্তে বেণেতি বস্তু লইয়া বণিগ্‌বৃত্তি অথবা বাঙ্গালা পুস্তক রচনা প্রভৃতি অন্য কোন অক্লেশসাধ্য অর্থকর ব্যবসায়ের জন্যও ব্যবস্থা দিতে পারিতাম।

ইহার পর আর এক প্রশ্ন রহিয়াছে, বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে? ব্যাকরণের উত্তর,—সংবাহে। সংবাহ শব্দের প্রচলিত অর্থ পাদ-মর্দ্দন। ব্যাকরণের এই ব্যবস্থাটি পাঠকবর্গের বড়ই অপ্রীতিকর জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ অথবা বহুজ্ঞ, তাঁহারা সরল হৃদয়ে স্বীকার করিলেন যে, পৃথিবীর বহুস্থলেই যেরূপ বিবাহ এইক্ষণ প্রচলিত রহিয়াছে, পাদ মর্দ্দনে কিংবা পাদ বন্দনেই তাহার পরিণাম। বিবাহে পত্নী

পতির দাসী, অথবা পতি পত্নীর দাস। কেন না, বিবাহ বিষয়ে জগতে প্রেমভক্তির সুখসুন্দর সাম্যবিধি এখনও প্রচলন পায় নাই। যেখানে পত্নী পতির ক্রীতদাসী, সেখানে পাদসেবাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম, এবং আহারও বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রহার অথবা সংহারেই *১৫ তাঁহার শেষ দক্ষিণা। আর, জামাই বারিকের চিড়িয়াখানা প্রভৃতি যে যে স্থলে পতিটি পত্নীর ক্রীতদাস, সেখানেও পাদলেহন, পাদসেবণ ও পাদমর্দ্দনই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য, এবং মধ্যে মধ্যে প্রণয় জলধির প্রলয়োচ্ছ্বাস স্বরূপ পদাঘাতই তাঁহার প্রধান দক্ষিণা। যেখানে প্রীতির সেই পরমাগতি এবং প্রণয় জনিত সাম্যব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়, সেখানেও কি পাদসংবাহরূপ ক্লেশকর অথবা কমনীয় নীতির সম্যক উন্মূলন হইয়া থাকে? শাস্ত্রে এমন লিখে না। ভক্তকবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দে আছে,—

"মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

অর্থাৎ,

আমার এ শিরের ভূষণ,
শিরে তুলি দেও প্রিয়ে
ও রাঙা চরণ।

ভবভূতি রামচন্দ্রের প্রণয়বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"দেবি! দেবি! অয়ং পশ্চিমস্তে রামশিরসা পাদ পঙ্কজ স্পর্শঃ।" *১৬

অর্থাৎ,—দেবি, রামের মাথা যে তোমার পায়ে লুণ্ঠিত হইত, আজি এই তাহার শেষ।

সুতরাং ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কি ভাল অর্থে, কি মন্দ অর্থে, কি বিবাহবন্ধনের উৎকর্ষে, কি উহার অপকর্ষে, কি প্রীতির পূর্ণ বিকাশে, কি প্রীতির অপূর্ণ আভাসে, সকল স্থলে এবং সকল অবস্থাতেই বিবাহের শেষ পরিণতি সংবাহে। যদি তুমি একটা বড়ই কিছু হও, তাহা হইলে তিনি তোমার পদ-সংবাহ করিতেছেন, এবং যদি তিনি একটা বড়ই কিছু হন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার পদ-সংবাহ করিতেছ। অথবা, যেখানে উভয়ে উভয়ের সমান, সেখানে উভয়েই উভয়ের সংবাহ সুখে বিবাহের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নবান্ আছ।

ব্যাকরণে আরও এই এক গুরুতর কথা জানা যাইতেছে যে, প্রবাহ-নির্ব্বাহ সংবাদ এই যে বিবাহ বন্ধনের তিন ভাব অথবা তিন অবস্থা ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে, এই তিনেরই মূল ধাতু বহ অর্থাৎ বহন। সুতরাং ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে,

যখন বিনা বাহনে বহন হয় না, তখন যেই তুমি বিবাহ করিলে, অমনই তুমি বাহন হইলে। আগে বিযুক্ত এবং অতএবই উন্মুক্ত মনুষ্য ছিলে, বিবাহের পরক্ষণ হইতেই নিযুক্ত এবং অতএবই ভার-যুক্ত বাহন বলিলে।*১৭ আগে পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতে জলের মত হাসিয়া খেলিয়া, ঢেউ তুলিয়া, চলিয়া যাইতে; বিবাহের পর মুহূর্ত্ত হইতেই কিবা জীবনের প্রবাহে, কিবা জীবনযাত্রার নির্ব্বাহে, সকলভাবেই পরের ভার হৃদয়ে লইলে;—আপনার সুখ-দুঃখ এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্ব্বহ ভারের সঙ্গে সঙ্গে পরের সুখ-দুঃখ এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকতর দুর্ব্বহ, দুর্ব্বিষহ আর এক নূতন ভার মাথায় লইয়া, সংসারের কাঁটাবনে "সুখ ক্লিষ্ট" মনে, পাদ-চারণ করিতে আরম্ভ করিলে।

এই অবস্থা নিতান্তই বাঞ্ছনীয় কি? বাঞ্ছনীয় না হইলে সকলেই ঐ প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া জীবন নির্ব্বাহের উপায় দেখিতেছে কেন? এবং যেখানে প্রীতির প্রবাহ কিংবা জীবনযাত্রার সাধারণ কি অসাধারণ নির্ব্বাহ, এই দুইয়ের একও সম্ভবপর নহে, সেখানেও পরকীয় পদ-সংবাহ-সুখে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মাবমাননা করিতেছে কি জন্য? কিন্তু তথাপি কেন জানি না, এই প্রবাহ অথবা নির্ব্বাহ ইহার কিছুতেই আমার চিত্তের স্ফূর্তি হয় না। জ্ঞানানন্দ যেমন তাঁহার প্রলাপে বলিয়াছেন যে, তিনি কখনই বিবাহ করিবেন না, আজি ব্যাকরণের বিজ্ঞান সূত্র সম্মুখে লইয়া আমিও সেই কথাই প্রকারান্তরে বলিতেছি,—আমি বিবাহ করিব না। আমার মুখ্য ভয় ঐ সংবাহে। আমি কোন মতেই কাহারও বাহন হইতে রাজি নহি। অনেকে আপনি কাহারও বাহন না হইয়া অন্যকে আপনার বাহন বানাইতে পারিলে বড়ই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু এ নীতির নাম কাল-কূট কণিক-নীতি, ইহা অধিকতর দোষাবহ। ইহা স্বভাবতঃই পরপোষণী, পর ঘাতিনী। ইহা অন্যের সুখ, স্বত্ব স্বাধীন-স্ফূর্ত্তির উপর দিয়া, পর্ব্বত-ভ্রষ্ট শিলাখণ্ডের ন্যায়, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, গড়াইয়া পড়িয়া, চলিয়া যায়; পরের ভাবনা ভাবিবার অবকাশ পায় না। অবকাশ পাইলেও ইহা পরের ভাবনা ভাবে না, পরের পোড়ায় পোড়ে না, পরের দুঃখে দ্রবে না, আমার অমৃত-পিপাসু প্রাণ এইরূপ বিষাক্ত ও বিদিষ্ট বিধির পক্ষপাতি নহে। আমি আপনি অন্যের বাহন হইতে যত না অসম্মত, অন্যকে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ভাবের বাহন বানাইতে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ বেশী বিরক্ত। সুতরাং বিবাহ ও বিবাহের ব্যাকরণ আমার জন্য নহে। আমি ব্যাকরণের টীকাকার। আমি আজিও যেমন একা আছি, চিরদিনই এমনই একা রহিব,—এবং একা থাকিয়া, এইভাবে, এই ভবের হাটে, ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রের টীকা লিখিব।

টীকাটীপ্পনি

(১) দুর্গ সিংহকৃত বৃত্তি ও ব্যাখ্যা অবশ্যই অন্যপ্রকার। কিন্তু, কোন্ বৃত্তি ও কোন্ ব্যাখ্যা সূত্রের সহিত বেশী মিলে, তাহা বিচার করিয়া অবধারণ করা আমাদিগের পক্ষে অসাধ্য। প্রবন্ধ লেখক শ্রীমান্ কল্যাণভট্ট পরিব্রাজক, দুর্গসিংহের পথ পরিত্যাগ করিয়া, ভাল করিয়াছেন কিনা, পাঠক ক্রমে তাহার পরিচয় পাইবেন।

(২) এবার সূত্রার্থে কোন গোলযোগ নাই। কারণ সূত্রে আছে 'দ্বৌ দ্বৌ' এবং তাহার স্পষ্ট অর্থ দুইটি দুইটি করিয়া।

(৩) কল্যাণভট্ট এবার দুইটি সূত্র মিলাইয়া একসূত্র করিয়াছেন। নব্য বৈয়াকরণের মধ্যে অনেকেই এই পথ দেখাইয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধ নহে।

(৪) এই ব্যাকরণের এক নাম কাতন্ত্র, আর এক নাম কৌমার এবং তৃতীয় নাম কলাপ। কাতন্ত্র শব্দের অর্থ অল্পশাস্ত্র, অর্থাৎ অল্প বয়সের উপযোগী আমাদের কথা। কৌমার মানে কুমারের যোগ্য অর্থাৎ যুব-জন স্পৃহনীয়। কলাপ শব্দের অর্থ অধিকতর রসাল, অর্থাৎ যাহা পড়িয়া রস-শাস্ত্রের চৌষট্টি কলায় বিদ্যা জন্মে তাহার নাম কলাপ। যাঁহারা "অঃ ইতিবিসর্জ্জনীয়" এই সূত্রের বৃত্তি পড়িয়াছেন, তাহারাই এ কথার সাক্ষী। কিন্তু রসিকতার অংশটা বৃত্তিতেই কিছু বেশী।

(৫) দুর্গসিংহ এ সূত্রের যেরূপ জটিল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির সুগম নহে। সুতরাংই কল্যাণকৃত ব্যাখ্যা প্রামাণিক।

(৬) গুরুদেবের নাম সর্ব্ববম্পাচার্য্য। তিনি ভারতবর্ষে একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সর্ব্ববম্পাচার্য প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণ পূর্ব্ববঙ্গের গৃহে গৃহে পঠিত ও পাঠিত হইয়া থাকে।

(৭) সক্রেতিশের সহধর্ম্মিণীরে "করতোয়া" বলা যাইতে পারে। কেন না, তাঁহার হৃদয়ে যখনই ক্রোধের তুফান বহিত, তখনই তিনি পতির গায়ে জল ঢালিয়া দিতেন। কর্ম্মনাশা ঠাকুরাণীরা আর এক শ্রেণির। তাঁহারা গায়ে জল দেন না, কিন্তু উৎসাহের আগুনে জল ঢালিয়া কর্ম্মনাশ করেন।

(৮) যাঁহাদিগের সমস্ত কথায়ই সন্তাপের সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিলক্ষিত হয়, এবং যাঁহারা বিলাপ ও পরিতাপের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই ভালবাসেন না তাঁহাদিগকে তপতী বলা যায় না কি?—ইরাবতী পাষাণভেদিনী। পৃথিবীর কোথাও প্রকৃত ইরাবতীর অভাব নাই।

(৯) যাঁহারা পতিকুলরূপ কামধেনুকেও, দুহিতার ভাবে, পিতৃকুলবৎ দোহন করেন, তাঁহাদিগকে কি বলা যায় তাহা ভট্টবৈয়াকরণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এইবার আর

তাঁহার প্রাণের বন্ধু জ্ঞানানন্দের দোহাই দিলে চলিবে না। কথাটা একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

(১০) পাঠকের ইচ্ছা হইলে, তিনি ব্যাকরণের এই সমস্ত কথার সহিত ডারউইনের যৌন নির্ব্বাচন বিষয়ক নব্যবিজ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত নূতন দর্শনাদি শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

(১১) আপনার কয় বিবাহ এইরূপ প্রশ্ন না করিয়া আপনার কয় সংসার, এইরূপ প্রশ্ন করাই প্রাচীন প্রথা ছিল। কিন্তু সংসার শব্দ যে এস্থলে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য।

(১২) এই প্রবন্ধে বিবাহ শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই একদিকে বিজ্ঞান আর একদিকে প্রেম ও বিরহের অনুরোধে একটুকু সম্প্রসারিত হইয়াছে, এবং লেখক নিশ্চয়ই মনুর ব্যবস্থা এবং কাব্যনাটকাদির বর্ণিত অবস্থাও চিন্তা করিয়াছেন।

(১৩) পূর্ব্বতন দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটো, অধ্যাত্মবাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে সুইডেন-বর্গ এবং আধুনিক মনস্বিসমাজের অগ্রগণ্য চালক কোম্‌ট্‌ ও মিলের লেখা আর এই শেষোক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের জীবনচরিতের সহিত বিবাহ বিধির গূঢ়তত্ত্ব তুলনা করিয়া দেখিলেই উল্লিখিত কথার সম্যার্থ স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

(১৪) "শরীরার্দ্ধা' স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।"

(১৫) এখানে অনুপ্রাস রূপ উপসর্গের অনুরোধে প্রহারের সংগে সংহারও আপনি আসিয়া পড়িয়াছে। যথা,—

উপসর্গেন ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে
প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহারবৎ।

কিন্তু যেখানে প্রকৃতি গত উপসর্গ একটু বেশী প্রবল, সেখানেও যে আহার ও বিহারের সঙ্গে প্রহার এবং প্রহারের সঙ্গে সংহার কি পরিহার আসিয়া উপস্থিত না হয়, এমন কথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি না। যাঁহারা ইংরেজী বিনা বুঝেন না, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, পরিহার মানে Divorce.

(১৬) এইটুকু পড়িলেই বোধ হয় যে, সীতার পদ সংবাহন অথবা তদীয় সুকোমল পদারবিন্দে শিরোলুণ্ঠন পুরুষ-প্রবীর শ্রীরামচন্দ্রের নিয়তকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। নতুবা কবি এখানে পশ্চিম শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। পশ্চিম অর্থ-শেষ।

(১৭) 'বনিলে' এই ক্রিয়াপদার্থ ব্রজভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। ইহা এইক্ষণ বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।

ঘোমটা

(অংশবিশেষ)

প্রচলিত লজ্জার প্রকার ও প্রতিকৃতি অনেক এবং উহা এক বিচিত্র বস্তু। আমি বহু চিন্তা করিয়াও উহার অনন্ত চাতুরীর অন্ত পাই নাই, এবং কোনও দিনও যে পাইব আমার মনে এমন আশা নাই। ফলতঃ কিসে লজ্জা যায়, আর কিসে লজ্জা থাকে, তাহা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারও বুদ্ধির অগম্য, বিলাতের বিবিদিগের মধ্যে অনেকেই অর্দ্ধবসনা হইয়া অজ্ঞাত চরিত্র পুরুষের সহিত প্রকাশ্য স্থলে তালে তালে নাচিতে গাহিতে পারেন, পূর্ব্বরাগের পুষ্পিত ছলনায় যে ভাবে ইচ্ছা সেইভাবে এবং যাঁহার সহিত ইচ্ছা তাঁহার সহিতই প্রণয়ের খেলা খেলিতে পারেন, এবং অশ্বারূঢ়া উগ্রচণ্ডার মত, অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়া হইয়া, পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনায়াসে প্রধাবিত হইতে পারেন। ইহার কিছুতেই তাঁহাদিগের লজ্জা বিনষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু তাঁহারা, অতি উৎকৃষ্ট পীড়ার অনুরোধেও, পরের কাছে চরণতলের আবরণ ক্ষণকালের তরে উন্মোচন করিতে বাধ্য হইলে, অথবা দৈবদোষে, এদেশে আসিয়া, পরের অধরে তাম্বুলরাগের রেখামাত্র দেখিলে, লজ্জায় একেবারে সরিয়া যান।

আমাদিগের মধ্যেও লজ্জার এইরূপ রস-বৈচিত্র্য এবং সর্ব্বত্রই সেই বিচিত্রতার অসংখ্য উদাহরণ সর্ব্বদা লোকের চক্ষে ঠেকে। যথা, সুধীর বন্ধুর ছোট শাশুড়ী বড় লজ্জাশীলা। সকলেই বলে, তিনি লজ্জার শাসনে জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ সহোদরের মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে সমর্থ হন না এবং তাঁহার স্বামীর সহিতও কোনও দিন মুখ তুলিয়া কথা কহিয়াছেন কিনা, তাহা কেহ জানে না। কুলের কামিনী নির্লজ্জা হইলে তাঁহার মনে এমনই ঘৃণা ও 'স্ত্রী যন্ত্রণা' উপস্থিত হয় যে, যদি তাঁহার পুত্রবধূটি, সীমন্তে সিন্দুর দেওয়ার অভিলাষে, দর্পণের সম্মুখেও মুখের ঘোমটা ফেলিয়া বসে, তাহা হইলেই তিনি শিরে শতবার করাঘাত করেন, এবং কলির পাপাচারে আর লেখাপড়ার পাপময় অত্যাচারে পৃথিবীর লজ্জা সঙ্কোচ যে একেবারে প্রক্ষালিত হইয়া গেল, ইহা চিন্তা করিয়া অতি গদগদ কণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে থাকেন। কিন্তু এদিকে পাঁচজনের মধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের সময় শান্তিপুরের দিগম্বরী পরিয়া বাহির হইতে তাঁহার কষ্টবোধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাতে শরীরে ও মনে তখন তাঁহার আর আনন্দ ধরে না; গৃহের ভৃত্যাদির উপর ক্রোধান্ধ পুরুষের মতো অতি কঠোর কণ্ঠে তাড়না ও তর্জ্জন করিতেও তাঁহার জিহ্বা কখনও একটুও বাধে না, এবং খিড়কীর ঘাটে

কিংবা শয়নগৃহের সন্নিকটে পাড়ার স্ত্রী পুরুষ জুটাইয়া হাট মিলাইয়া বসিতে,—এই আধো বৃদ্ধ বয়সেও বাসরগৃহের বিলাসিনী সাজিতে,—কৌতুক প্রসঙ্গে কথায় ছড়া কাটিতে, অথবা বাসি বিবাহের কাদাখেলা লইয়া, কমলকাননে করিণীর ন্যায় প্রমত্ত ক্রীড়া করিতে তাঁহার চিত্ত কখনও কোন রূপ কাতরতা অনুভব করে না! বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণে যখন কবিওয়ালার সেই নয়নহারি কপি-নৃত্য হয়, তখন তাঁহার কৌতূহল সকলের উপরে। তিনি তখন সমবয়স্কাদিগকে লইয়া সখ করিয়া সখীসংবাদ শুনেন, এবং যখন লহরের আরম্ভ হয়, তখন তিনি তিরস্করণীর অন্তরালে চাতকীর ন্যায় তৃষিতচিত্তে উপবিষ্টা রহেন।

বিন্ধ্যবালার বড়পিসীও নিতান্ত লজ্জাবতী, তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেকেলে লোক। এখনকার কুৎসিত রীতিনীতি তাঁহার চক্ষে বিষ। ঘরের ঝি বউয়ের ত কথাই নাই, পাড়া প্রতিবেশীর মেয়েরাও তাঁহার ভয়ে সতত জড় সড় রহে। তিনি সর্ব্বদাই সকলকে লজ্জার কথা লইয়া নানা দৃষ্টান্তে উপদেশ দেন ও শাসন করেন; এবং অতি ঘনিষ্ঠ কোন প্রাচীন প্রতিবেশীও যদি কার্য্যানুরোধে তাঁহার নিকটে আসেন, তিনি তৎক্ষণাৎই আজানুবিলম্বিত ঘোমটা টানিয়া সহর্ষকম্পিত স্ফুরিত কলেবরে একপার্শ্বে সরিয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার শরীরে কামিনী সুলভ ক্রোধ একটুকু অধিক। ঐ রূপ ক্রোধ যে নিন্দনীয় এমন কথা বলিতে আমি সাহস পাইতেছি না। আমার কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, তাঁহার হৃদয় সময়ে সময়েই ক্রোধে ঈষৎ কম্পিত হয়। তিনি যখনই সেই কমনীয় অথচ ক্ষণস্থায়ী ক্রোধের ক্ষণিক উত্তেজনায় বাড়ির ভিতর হুঙ্কার দেন, বহির্বাটির প্রাচীর চত্বরও তখন থর থর কাঁপিয়া উঠে, এবং গ্রাম্য পাঠশালার অনেক গজকণ্ঠ পণ্ডিত এবং দুর্ব্বার বালকবৃন্দও তখন ক্ষণকালের জন্য চিত্রার্পিতবৎ স্তম্ভিত রহে। কেহ 'পার্য্যমানে'* তাঁহার সহিত বিবাদ বাধাইতে যায় না। কারণ সকলেই সংসারে সন্তান সন্ততি লইয়া সুখে বাস করিতে ইচ্ছা করে। তথাপি, যদি দৈবাৎ ও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত সত্য সত্যই কাহারও বিবাদ বাধিয়া উঠে, তবে তাহারই একদিন, কিংবা তাঁহারই একদিন। তিনি তখন একসঙ্গে এবং মূর্ত্তিমতি মহিষাসুর রূপিণী। তাঁহার আলুলায়িত কেশকলাপ তখন ঝঞ্ঝা-বায়ু-বিতাড়িত বিক্ষিপ্ত কাদম্বিনীর কন-কান্তি ধারণ করে, চক্ষে আগ্নের গিরির অভিনয় হয়, অঞ্চলের বস্ত্র কটিবন্ধনে পরিণতি পায়, বাহুবল্লরী

* পার্য্যমানে এই শব্দটি সংস্কৃতমূলক নহে; কিন্তু ইহা বিদ্যমান ও দৃশ্যমান প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সংস্কৃতের অনুকরণে—সংস্কৃত ছাঁদে গঠিত, এবং বঙ্গের সর্ব্বত্রই সমান প্রচলিত।

নাবিকের ক্ষেপণীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে, চরণ-দ্বয় শস্যনিপেষণ দণ্ডের শক্তি ও মহিমা কাড়িয়া লয় এবং ফেনায়মান বদনারবিন্দ তটিনীর ফেন-সমাচ্ছন্ন শ্বেত পুলিনকেও বারংবার ধিক্কার দেয়। এ সকল কিছুতেই তাঁহার লজ্জার ব্যাঘাত হয় না, এবং অন্যকে লজ্জাহীনা বলিয়া তিরস্কার করিবার বংশানুক্রমিক কায়েমি অধিকারও ইহাতে কোন ক্রমেই কমে না।

১২

জুতা-ব্যবস্থা

(১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত)

গবর্ণমেণ্ট একটি নিয়মজারী করিয়াছেন ; যে, "যে হেতুক বাঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বেখুং হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে যে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে!"

সহরের বড় দালানে বাঙ্গালীদের একটি সভা বসিয়াছে। একজন বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ ও বেদব্যাসের জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, ইংরাজ জাতির পূর্বপুরুষেরা যে গায়ে রঙ মাখিত ও রথের চাকায় কুঠার বাঁধিত তাহারি উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিলেন যে, এই জুতা-মারার নিয়ম অত্যন্ত কুনিয়ম হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীতে এমন নিয়ম অত্যন্ত অনুদার। (উনবিংশ শতাব্দীটা বোধকরি বাঙ্গালীদের পৈতৃক সম্পত্তি হইবে ; ও শব্দটা লইয়া তাঁহাদের এত নাড়াচাড়া, এত গর্ব!) তিনি বলিলেন "আমাদের যতদূর দুর্দশা হইবার তাহা হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের দরিদ্র করিবার জন্য সহস্রবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। মনে কর, বন্ধুকে পত্র লিখিতে হইবে, ইষ্ট্যাম্প চাই, তাহার জন্য রাজা প্রতিজনের কাছে দুই পয়সা করিয়া লন। মনে কর, ইংরাজ বণিকেরা আমাদের বাজারে সস্তা পণ্য আনয়ন করিয়াছেন, আমাদের স্বজাতীয়েরা ঢাকাই বস্ত্র কিনে না, দেশীয় পণ্য চাহে না, আমাদের দেশের লোকের কি কম সহ্য করিতে হইতেছে, আর ইংরাজেরা কি কম ধূর্ত্ত? এমনকি, মনে কর গবর্ণমেণ্ট ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের দেশে ডাকাতী ও নরহত্যা একেবারে রদ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে করিয়া আমাদের বাঙ্গালী জাতির পুরাতন বীরভাব একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, (উপর্য্যুপরি করতালি) সমস্তই সহ্য হয়, সমস্তই সহ্য করিয়াছি, উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে হিমালয় ও বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাব দেশ একপ্রাণ হইয়া উত্থান করে নাই,

কিন্তু জুতো মারা নিয়ম যখন প্রচলিত হইল, তখন দেখিতেছি আর সহ্য হয় না, তখন দেখিতেছি আর রক্ষা নাই, সকলকে বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠিতে হইল, জাগিতে হইল, গবর্ণমেণ্টের নিকটে একখানা দরখাস্ত পাঠাইতেই হইল! (উৎসাহের সহিত হাততালি) কেন সহ্য হয় না যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, তবে সমস্ত সভ্যদেশের, য়ুরোপের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, উনবিংশ শতাব্দীর আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ। দেখিবে, কোন সভ্যদেশের গবর্ণমেণ্টে এরূপ জুতা-মারার নিয়ম ছিল না, এবং য়ুরোপের কোন দেশে এ নিয়ম প্রচলিত নাই। ইংলণ্ডে যদি এ নিয়ম থাকিত, ফ্রান্সে যদি এ নিয়ম থাকিত, তবে এ সভায় আজ এ নিয়মকে আমরা আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিতাম, তবে এই সমবেত সহস্র সহস্র লোকের মুখে কি আনন্দই স্ফূর্ত্তি পাইত, তবে আমরা এই সভ্য-দেশসম্মত অধিকাব প্রাপ্তিতে পৃষ্ঠ দেশের বেদনা একেবারে বিস্মৃত হইতাম!" (মুষলধারে করতাল বর্ষণ)। বক্তার উৎসাহ-অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তি এমন উত্তেজিত, উদ্দীপিত, উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সমবেত সাড়ে ৫ হাজার বাঙ্গালীর মধ্যে অত অধিক সংখ্যক লোকের মতের এমন ঐক্য হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ দরখাস্তে প্রায় সাড়ে চারশত নাম সই হইয়া গিয়াছিল।

লাটসাহেব রুখিয়া দরখাস্তের উত্তরে কাইলেন "তোমরা কিছু বোঝ না, আমরা যাহা করিয়াছি, তোমাদের ভালর জন্যই করিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা লইয়া বাগাডম্বর করাতে তোমাদের রাজ-ভক্তির অভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইত্যাদি"

নিয়ম প্রচলিত হইল। প্রতি গবর্ণমেণ্ট কার্য্যশালায় একজন করিয়া ইংরাজ জুতা-প্রহর্ত্তা নিযুক্ত হইল। উচ্চপদের কর্ম্মচারীদের জন্য ১ শত ঘা করিয়া বরাদ্দ হইল। পদের উচ্চনীচতা অনুসারে জুতা-প্রহার সংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইল বিশেষ সম্মানসূচক পদের জন্য বুট জুতা ও নিম্ন শ্রেণীস্থ পদের জন্য নাগরা জুতা নির্দিষ্ট হইল।

যখন নিয়ম ভালরূপে জারী হইল, তখন বাঙ্গালী কর্মচারীরা কহিল "যাহার নিমক খাইতেছি, তাহার জুতা খাইব, ইহাতে আর দোষ কি? ইহা লইয়া এত রাগই বা কেন, এত হাঙ্গামাই বা কেন? আমাদের দেশে ত প্রাচীন কাল হইতেই প্রবচন চলিয়া আসিতেছে, পেটে খাইলে পিঠে সয়। আমাদের পিতামহ প্রপিতামহদের যদি পেটে খাইলে পিঠে সইত, তবে আমরা এমনই কি চতুর্ভুজ হইয়াছি, যে আজ আমাদের সহিবে না? স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ। জুতা খাইতে খাইতে মরাও ভাল, সে আমাদের স্বজাতি প্রচলিত ধর্ম্ম।" যুক্তি গুলি এমনই প্রবল বলিয়া বোধ হইল যে, যে যাহার কাজে অবিচলিত হইয়া রহিল। আমরা এমন যুক্তির বশ! (একটা কথা এইখানে মনে হইতেছে। শব্দ-শাস্ত্র অনুসারে যুক্তির অপভ্রংশে জুক্তি

শব্দের উৎপত্তি কি অসম্ভব ? বাঙ্গালীদের পক্ষে জুক্তির অপেক্ষা যুক্তি অতি অল্পই আছে, অতএব বাঙ্গালা ভাষায় যুক্তি শব্দ জুতি শব্দে পরিণত হওয়া সম্ভবপর বোধ হইতেছে।')

কিছু দিন যায়। দশ ঘা জুতা যে খায়, সে এক-শ ঘা-ওয়ালাকে দেখিলে যোড় হাত করে, বুট জুতা যে খায় নাগরা-সেবকের সহিত সে কথাই কহে না। কন্যাকর্তারা বরকে জিজ্ঞাসা করে, কয় ঘা করিয়া তাহার জুতা বরাদ্দ। এমন শুনা গিয়াছে, যে দশ ঘা খায় সে ভাঁড়াইয়া বিশ ঘা বলিয়াছে ও এইরূপ অন্যায় প্রতারণা অবলম্বন করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ধিক্, ধিক্, মনুষ্যেরা স্বার্থে অন্ধ হইয়া অধর্ম্মাচরণে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। একজন অপদার্থ অনেক উমেদারী করিয়াও গবর্ণমেণ্টে কাজ পায় নাই। সে ব্যক্তি একজন চাকর রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে বিশ ঘা করিয়া জুতা খাইত। নরাধম তাহার পিঠের দাগ দেখাইয়া দশ জায়গা জাঁক করিয়া বেড়াইত, এবং এই উপায়ে তাহার নিরীহ শ্বশুরের চক্ষে ধূলা দিয়া একটি পরমা-সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভ করে। কিন্তু শুনিতেছি সে স্ত্রীরত্নটি তাহার পিঠের দাগ বাড়াইতেছে বই কমাইতেছে না। আজকাল ট্রেনে হউক, সভায় হউক, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়ের নাম ? মহাশয়ের নিবাস ? মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ ?" আজকালকার বি-এ এম-এরা নাকি বিশ ঘা পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম্ খাইয়া যাইতেছে, এইজন্য পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাকে তাঁহারা অসভ্যতা মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে তিন ঘায়ের অধিক বরাদ্দ নাই। একদিন আমারি সাক্ষাতে ট্রেনে আমার একজন এম্-এ বন্ধুকে একজন প্রাচীন অসভ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, বুট না নাগরা ?" আমার বন্ধু চটিয়া লাল হইয়া সেখানেই তাহাকে বুট জুতার মহা সম্মান দিবার উপক্রম করিয়াছিল। আহা, আমার হতভাগ্য বন্ধু বেচারীর ভাগ্যে বুটও ছিল না, নাগরাও ছিল না। এরূপ স্থলে উত্তর দিতে হইলে তাহাকে কি নতশির হইতেই হইত ! আজকাল সহরে পাকড়াশী পরিবারদের অত্যন্ত সম্মান। তাঁহারা গর্ব করেন, তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা বুট জুতা খাইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিবারের কাহাকেও পঞ্চাশ ঘার কম জুতা খাইতে হয় নাই। এমন কি, বাড়ির কর্ত্তা দামোদর পাকড়াশী যত জুতা খাইয়াছেন, কোন বাঙালী এত জুতা খাইতে পায় নাই। কিন্তু লাহিড়িরা লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের সহিত যেরূপ ভাব করিয়া লইয়াছে, দিবানিশি, যেরূপ খোষামোদ আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা পাকড়াশীদের ছাড়াইয়া উঠিবে বোধ হয়। বুড়া দামোদর জাঁক করিয়া বলে, "এই পিঠে মণ্টিথের বাড়ির তিরিশটা বুট ক্ষোয়ে গেছে।" একবার ভজহরি লাহিড়ি

দামোদরের ভাইঝির সহিত নিজের বংশধরের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল। দামোদর নাক সিটকাইয়া বলিয়াছিল, তোরা ত ঠন্‌ঠোনে। সেই অবধি উভয় পরিবারে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছে। সে দিন পূজার সময় লাহিড়িরা পাকড়াশীদের বাড়িতে সওগাতের সহিত তিন যোড়া নাগরা জুতা পাঠাইয়াছিল; পাকড়াশীদের এত অপমান বোধ হইয়াছিল যে, তাহারা নালিশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; নালিশ করিলে কথাটা পাছে রাষ্ট্র হইয়া যায় এইজন্য থামিয়া গেল। আজকাল সাহেবদিগের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে সম্ভ্রান্ত "নেটিব"গণ কার্ডে নামের নীচে কয় ঘা জুতা খান, তাহা লিখিয়া দেন, সাহেবের কাছে গিয়া যোড়-হস্তে বলেন "পুরুষানুক্রমে আমরা গবর্ণমেণ্টের জুতা খাইয়া আসিতেছি; আমাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বড়ই অনুগ্রহ।" সাহেব তাঁহাদের রাজভক্তির প্রশংসা করেন। গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান না; তাঁহারা বলেন, "আমরা গবর্ণমেণ্টের জুতা খাই, আমরা কি জুতা হারামী করিতে পারি!"

সেদিন একটা মস্ত মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বেণীমাধব শিকদার গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহে আড়াইশ ঘা করিয়া জুতা খায়। জুতা বর্দ্দারের সহিত মনান্তর হওয়াতে একদিন সে তাহাকে সাত ঘা কম মারিয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট জজের কোর্টে মোকদ্দমা উঠিল। জুতাবর্দ্দার নানা মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিল যে মারিতে মারিতে তাহার পুরাতন বুট ছিঁড়িয়া যায় কাজেই সে মার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জজ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দিলেন। হাইকোর্টে আপিল হইল। উভয়পক্ষে বিস্তর ব্যারিষ্টর নিযুক্ত হইল। তিন মাস মোকদ্দমার পর জজেরা সাব্যস্ত করিলেন সত্যই জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অতএব ইহাতে আসামীর কোন দোষ নাই। বেণীমাধব প্রিভিকৌন্সিলে আপিল করিলেন। সেখানে বিচারক রায় দিলেন "হাঁ সত্যসত্যই বেণীমাধবের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। সে যখন বারো বৎসর ধরিয়া নিয়মিত আড়াইশত জুতা খাইয়া আসিতেছে, তখন তাহাকে একদিন দুইশত তেতাল্লিশ জুতা মারা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। আর জুতা ছেঁড়ার ওজর কোন কাজেরই নহে।" বেণীমাধব বুক ফুলাইয়া বলিল "হাঁ হাঁ, আমার সঙ্গে চালাকী!" সাধারণ লোকেরা বলিল "না হইবে কেন! কত বড় লোক? উঁহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?" এই উপলক্ষ্যে হিন্দু পেট্রিয়টে একটা আর্টিকেল লিখিত হয়; তাহাতে অনেক উদাহরণ সমেত উল্লেখ থাকে যে, "ইংরাজ জুতা-বর্দ্দারেরা আমাদের বড় বড় সম্ভ্রান্ত নেটিব কর্ম্মচারীদিগের মান-অপমানের প্রতি দৃষ্ট [দৃষ্টি ?] রাখে না। যাহার যত বরাদ্দ তাহাকে তাহার কম দিতে শুনা যায়। অতএব আমাদের মতে বাঙ্গালী

জুতা-বর্দ্দার নিযুক্ত হউক। কিন্তু এক কথায় তাহার সে সমস্ত যুক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়—"যদি বাঙ্গালী জুতা-বর্দ্দার নিযুক্ত করা যায় তবে তাহাদের জুতাইবে কে?" আজকাল বঙ্গদেশে একমাত্র আশীর্বাদ প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ "পুত্র পৌত্রানুক্রমে গবর্ণমেণ্টের জুতা ভোগ করিতে থাক, আমার মাথায় যত চুল আছে, তত জুতা তোমার ব্যবস্থা হউক।" সেই আশীর্বচনের সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।(১)

(১) "This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says "Kick them first and then speak to them."—Indian Mirror. যে সমগ্র জাতিকে কোন বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িলে বিস্মিত হইবে না। বোধহয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোন দেশে যদি কোন কাগজ ঐরূপ অপমানের আভাসমাত্র, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।—সং।

—ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮। পৃঃ ৫৮-৬২।

নক্সা

(নিমন্ত্রণবাড়ী, এক কক্ষে দুইজন যুবতী উপবিষ্টা)

প্রথমা। "এমনো কালামুখী!"

দ্বিতীয়া। "মাইরি, ছিছি।"

প্র। "ছিছি না ছিছি—লাজ লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে।

(আর এক জন যুবতীর প্রবেশ)

যুবতী। "কি হয়েছে, মেজবৌ, কার কথা বলছিস?"

প্র। "কামিনী যে, এতক্ষণে কি আসতে হয়? বোনঝির গায়ে হলুদ, সব করবি কর্ম্মাবি—না একেবারে বেলা ফুরিয়ে এলি যে।"

যুবতী। "কি করবো ভাই—হয়ে উঠলোনা। তা কার কথা বলছিস বল না?"

দ্বি। এই বোসেদের শশীর বৌয়ের কথা হচ্ছে।"

যু। "কেন তার হয়েছে কি ?"

প্র। "হবে আর কি, যতদূর হবার তা হয়েছে! একেবারে মেম সেজে, গাউন প'রে এসেছে। মাগো! আমরা ত সাত জন্মে পরিনে। দেখে অবধি গা কেমন কস কস করছে।"

(ঘাড় বাঁকাইয়া ঘৃণা প্রকাশ।)'

দ্বি। "আর বল্লে কি হবে। কলি যুগ দেখছি উল্টে গেল।"

যু। "সত্যি নাকি ? বাঙ্গালির মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে ?"

প্র। "এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা, পরনের সাড়ি খানা পর্যন্ত কেমন ঘেরা-ঘোরা,—মাগো ঘেন্নাই করে। "

যু। "এই যে তবে বল্লি গাউন "—

প্র। "গাউন না সে গাউনের বাবা ; নিমন্ত্রণ বাড়ীতে এসেছ—নীলাম্বরী পর—পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, আমার যেন দেখে অবধি লজ্জায় মরে যেতে হচ্ছে।"

যু। "তা ভাই জামা জোড়া পরেছে—তানে এমনি কি দোষ।"

দ্বি। "আমিও ত তাই বলি—সেটা আর কি লজ্জার কথা।"

প্র। "তবে যা না—তোরাও বিবি সাজগে,—কুল উজ্জ্বল হয়ে যাক। আহা কি রূপ খানাই খুলেছে—কি মানানটাই মানিয়েছে, মরে যাই আর কি ?"

যু। "তা আমরা যেন বিবি নাই সাজলুম, তাই ব'লে তাকে কি ভাল দেখাতে নেই ? "

প্র। "ভাল দেখানর কপালে আগুন—আহা কি বা রূপেরই শ্রী।"

দ্বি। "কেন ভাই আর যাই হোক—রূপটা তার মন্দ কি, সেজেছেই বা কি মন্দ ?"

প্র। (মহা রাগিয়া) "কালামুখী, ধিকজীবনী, পোড়া-কপাল তার রূপে, পোড়াকপাল তার সাজায় ?"

যু। "কেন ভাই জামা জোড়া পরলেত একরকম বেশ মানায়। এই তুমি যদি পর ত তোমাকে বেশ সরেস দেখতে হয়।"

প্র। (দেয়ালের আয়নায় একবার মুখ দেখিয়া, একটু হাসিয়া) "তা ভাই উনিও ঐ কথা বলছিলেন, যে আমাকে একদিন বিবি সাজিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা বলে রং সাফ না হলেত মানায় না।"

যু। তা বই কি ? তোমাকেই যেন মানাল—দেশ শুদ্ধ তাই বলে জ্যাকেট পরাটা কি সাজে।"

প্র। "কামিনি, তুই এতদিন আসিসনি কেন, তোর জন্য ভাই আমার বড় মন কেমন করে। চল ভাই ঘরের ভিতর একবার রঙ্গখানা দেখতে পাবি।

(প্রবেশ করিয়া) —

প্র। "বলি ও শশীর বৌ—কতদিন এমন হোল ?"

বৌ। (আশ্চর্য্য হইয়া) "কি হোল ঠাকুর ঝি !"

প্র। "এই এমন মেম সাজলি কবে ? আমরা যে তোকে বড় ভাল লাজুক মেয়ে বলে জানতুম। তোর মনে এই ছিল।"

বৌ। "কি করব ভাই—তিনি এইরকম করে কাপড় না পরলে ছাড়েন না।"

প্র। "তা আরো কত হবে, এর পরে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে আর ঘোমটা পর্যন্ত থাকবে না।"

"বৌ। তা ভাই আমার শ্বাশুড়ী আমাকে ঘোমটা দিতে দেন না—বলেন আমার মেয়ে নেই, তুমি আমার মেয়ের মত আমার কাছে বস, কথা কও।"

(সকলের অবাক হইয়া দৃষ্টি)

প্র। "তবে তোর পদার্থ আর কিছুই নেই। একেবারে লোক হাসালি। আমরা কি আর কথা কইনে ?
সেদিন বাপেরবাড়ী যেতে ঠাকরুণ বারণ করেছিলেন, আমি যে একটু সরে এসে কত ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিলুম—তাই বলে কি ঘোমটা খুলতে গিয়েছিলুম ? সবাই ত তাই বলে 'ও বাড়ীর মেজ বৌএর লজ্জার ভাবটা বড় বেশী'।"

বৌ। "ছি ঠাকুরঝি, তুমি শ্বাশুড়িকে অমন করে বলে, তাতে তোমার লজ্জা হোল না।"

প্র। "কি লজ্জাবতী গা, ঘোমটা খুলে মেম সাজতে লজ্জা হোল না। যত লজ্জা ওনার এর ব্যালা। তোর মত যেদিন নির্লজ্জ বেহায়া হব সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরব।"

বৌ। ("স্বগতঃ) বটে, জামা পরলেই যত মেম সাজা হয়—আর উনি যে মুখে একঝুড়ি রুজ পাউডার লেপেছন—তাতে মেম সাজা হয় না, দাঁড়াও একটু জব্দ করি। (প্রকাশ্যে) "বলি ঠাকুরঝি—তোমার গালটা অত লাল কেন দেখছি ? পিঁপড়ে টিপড়ে কামড়ায় নি ত ? —

প্র। "তোর ঠাকুরজামাইও অমনি বলে থাকে। বলে গাল নয়তো যেন গোলাপ ফুল। কিছু কামড়ানি ভাই, আমার গালটা অমনি লালপানা—তোর বুঝি হতে সাধ যাচ্ছে ?"

বৌ। "তা মুখে খড়িপানা তোর কি লেগে রয়েছে— "

প্র। (স্বগতঃ) "টের পেয়েছে নাকি— এখনি সব দেখছি ফাঁশ হয়ে যাবে।" (তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কাণে কাণে) — "চুপকর ও ভাই একরকম গুঁড়ো, মাখলে স্বামী বশ হয়,— কাউকে বলিসনে, আমি তোকে এক কাগজ পাঠিয়ে দেব এখন, আর তুই ভাই আমাকে একটা তোর জামার নমুনা পাঠিয়ে দিস' তৈয়ারি করতে দেব, - দেখিস ভুলিসনে যেন— মাথা খাস।"—

ভারতী ভাদ্র ১২৯২, পৃ ২৪২—২৪৪

নক্সা*

শিক্ষিতা আসীন, অশিক্ষিতার প্রবেশ।

শিক্ষিতা। (দণ্ডায়মান হইয়া) "এই যে আসুন — বসুন বসুন — "

(দুজনে উপবিষ্ট হওন)

অশিক্ষিতা। "আহা আজ আবার আমাদের কত দিন পরে দেখা গেল! —মনে আছে সেই ছেলেবেলা দুজনে কত খেলা করে বেড়াতাম — কত ভাব ছিল একজনকে না দেখলে আর একজন যেন মণিহারা ফণীর মত হয়ে পড়তুম, তারপর কোথায় কে সব চলে গেলুম।"

শি। "হাঁ তা অনেক দিনের পর দেখা বই কি, এর মধ্যে কত লোকের জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, কত রাজবিপ্লব, কত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, কত গবর্ণর জেনেরল বদল হয়েছে—কত নূতন আইনের সৃষ্টি হয়েছে—এই আট দশ বৎসরের এইরূপ কতই ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেছে, আবার সম্প্রতি ত লিবারল মিনিষ্ট্রি পর্যন্ত চেঞ্জ হয়ে গেল —

অশি। (হাঁ করিয়া) "তুমি ভাই কি কতক গুলো বল্লে — ভাল বুঝতে পারলুম না। ওঃ লিবারের কথা বলছ বুমি? তা-আমার ভাই লিবারের কথা শুনলে বড় ভয় করে—সে দিন আমাদের হারাণের মেয়ে আহা ঐ ব্যামতে মারা পড়েছে" —

শি। (একটু হাসিয়া) "নানা আপনি বুঝতে পারেন নি, আমি সে কথা বলিনি, আমি বলছি গ্লাডষ্টোন আগে প্রাইম-মিনিষ্টার ছিলেন—এখন কন্সারবেটিব সলস্‌বেরি তাই হয়েছেন।"

অশি। (খানিকটা বুঝতে চেষ্টা করিয়া) হাঁ এবছর কাঁসার বাটীটা সত্যিই খুব শস্তা হয়েছে' বটে, আমিও সেদিন পরাণ মিস্ত্রীর কাছ থেকে দুআনা করে একটা বাটী কিনিছি।

শি। (আশ্চর্য্য হইয়া স্বগতঃ) এ কি ইনি এই কথাটা বুঝতে পারলেন না, খবরের কাগজ টাগজ কি ·কিছুই পড়েন না নাকি? God be praised—ভাগ্যিস আমি ওরকম অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে নেই। "(প্রকাশ্যে) ও মেয়ে দুইটি আপনার সঙ্গে যে এনেছেন ওরা আপনার কে?'

অ। "এইটি আমার মেয়ে আর এইটি আমার ননদের মেয়ে।"

শি। "এদের দুইজনকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে, আচ্ছা দুবছর আগে কি এরা আমাদের স্কুলে লাষ্ট ক্লাশে পড়ত? আমি তখন এণ্ট্রেন্স দিচ্ছিলেম।"

শি। "হাঁ কিছুদিন এরা স্কুলে গিয়াছিল বটে, তাপর ভাবলুম লেখাপড়া করে মেয়েরা তো আর পাগড়ি বেঁধে চাকরি করতে যাবে না, তাই ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম।'

শি। (একটু হাসিয়া) তা ওরা দুজনে এক বয়সি না?

অশি। হাঁ তা তুমি কি করে জানলে ভাই?

শি। "সুকুর সঙ্গে এদের দুজনের ভাব ছিল। সুকু আপনার মেয়েকে দেখিয়ে বলত যে তার এক বয়সি, আর আপনার ননদের মেয়েকে দেখিয়েও বলত একবয়সী। তা ইউক্লিডের ফাষ্ট অ্যাক্সিয়মে তা লেখাই আছে, যে Things which are equal to the same thing are epual to one another, তাই বুঝলেন ওরা দুজনেই যখন সুকুর equal তখন They are equal to each other.'

(অশিক্ষিতার অবাক হইয়া শ্রবণ)

শি। "তা শুনেছিলাম আপনার ননদের মেয়েটির নাকি কেউ নেই।'

অশি। "হাঁ বাছার আমার ত্রিসংসারে আর কেউ নেই কেবল একটি কানা খুড়ো, তা সে থাকা না থাকারি মধ্যে।

শি। "তা একজন থাকলে একেবারে হতাশ হবার আবশ্যক নেই, একজন থাকলেই দুজন থাকা হয়। আমি আপনাকে অ্যালজেব্রিক্যাল প্রুফ দেখাতে পারি যে, One is equal to two। দেখবেন, আমি অ্যাজেব্রা আনছি।'

(প্রস্থান ও কিছুপরে প্রত্যাগমন)

শি। (বই খুলিয়া) এই দেখুন, একস্, ইনটু একস্ মাইনাস—একস্ ইজ ইকোয়াল টু একস্-স্কোয়্যার্ড মাইনস্ একস্-কোয়ার্ড। বুঝতে পারছেন? এগেন একস্ প্লাস—

অ। আমরা ভাই মুখ্য সুখ্য মানুষ অত কি বুঝতে পারি? তুমি ভাই কত লেখাপড়াই শিখেছ। আমার ছেলেটিও খুল শিখেছে—সেও ঐ রকম কত আবল তাবল বকে।"

শি। "আপনি বুঝি কোন স্কুলে পড়েননি? তা আপনার ছেলে কেমন লেখা পড়া করছে।"

অ। "মা কালীর প্রসাদে একরকম ভালই হচ্ছে।"

শি। "মা কালী? সে আবার কে? শুনেছিলুম না কি সে দুর্গার মা।"

অ। "ওমা সে কি কথা! তিনিই যে মা দুর্গা। তা তুমি কি ভাই হিন্দু শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু পড়নি?"

শি। "Nonsense হিন্দুশাস্ত্র আবার কেউ পড়ে নাকি? History, Mathematics এইসব পড়তেই সময় পেয়ে উঠিনে তা আবার আপনাদের সেই কুসংস্কার—পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্র পড়তে যাব?"

(একজন লোকের গেজেট হস্তে প্রবেশ)

শি। "কি গেজেট? দেখি দেখি কোন ডিবিজনে পাশ হলুম দেখি।"

(সমস্ত দেখিয়া নিজের নাম না দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

অ। "ওমা একি গা? হঠাৎ পড়ে গেল কেন? ওমা গাটা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। বাছা তোরা একজন কোন ঝিটিকে ডাক দেখি।"

(একজন বালিকার গমন ও দাসী লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

অ। "দেখ দেখি বাচ্ছা, এ কি হলো।"

দাসী। "ও আবার বুঝি সেই ইস্ত্রি-মিস্ত্রি কি বলে সেই ব্যাম হোল, মুখে চোখে জলের ছিটে দাও, সেরে যাবে। আমাদের দেশে হলে লঙ্কা পুড়িয়ে নাকে ধূঁয়া দিলেত সেরে যায়, (অশিক্ষিতার কাণের কাছে আসিয়া চুপে চুপে) আমাদের দেশে এরকম হলে ভূতে পাওয়া বলে।"

শি। (মুখে জল দিতে দিতে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া) O my God my God। উঃ আর পারিনে। (চোখ মেলিয়া) এ কি উঃ unbearable pain।

পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা।

* ভাদ্র মাসের নক্সাটির উত্তররূপে নিতান্ত রঙ্গচ্ছলে এই নক্সাটি লেখা হইয়াছে। সুন্দরী পাঠিকাগণ কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহাদের ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কিম্বা তাঁহাদের ইউনির্বর্সিটি পরীক্ষার প্রতি কটাক্ষ করা নক্সাটির উদ্দেশ্য। তাহা হইলে এ গরীবকে নিতান্তই ভুল বুঝা হইবে।

লেখক

ভারতী কার্ত্তিক ১২৯২, পৃ ৩৪২-৩৪৪

নক্সা*

(দৃশ্য) বাসর গৃহ। মসনদের উপর কন্যার পার্শ্বে গ্র্যাজুয়েট বর; নিকটে যুবতীগণ আসীন।

প্রথম যুবতী। (বরের প্রতি) বলি কি গো অমন ধারা চুপ করে বসে রইলে কেন? সেই অবধি বকাবকি করে মলুম, মুখে যে একটা রা নেই।"

২যু। "রা আর থাকবে কি করে লো? ফুলির আমাদের চাঁদ পানা সোনার মুখ, তাই দেখেই অবাক হয়ে গেছে।"

বর। "কি বল্লেন, চাঁদপারা সোনার মুখ? (একটু হাসিয়া) আপনি যে অত্যন্ত রুচি বিরুদ্ধ তুলনা করলেন? চাঁদ পানা সোনার মুখত কই কোথাও পড়িনি। (চিন্তিত ভাবে) বায়রণ, স্কট, সেলি, টেনিসন কই কোথাও Moon-face আছে বলেত মনে পড়ছে না। আর সোনার মুখ—Why that's absurd! Golden face—সোনার মুখ হয় না—তবে golden hair—সোনার চুল হয়।"

তৃ যু। "ওমা কেমন কানা বর গা! মেয়ের অমন সোনাপারা মুখ তাও সোনা নয়, অমন কাল কুচকুচে চুল তাও বলে সোনারঙের—এ কি কথা গা? এতরূপও কি পসন্দ হোলনা না কি?"

প্র যু। "না লো না, বর তা বলছে না, বরের তোদের ইংরাজী পসন্দ, বর সোনা মুখ চায় না, সোনাচুল চায়।"

৪র্থ যু। "ওমা সত্যি নাকি? হ্যাঁ গা তবেকি আমাদের বুড়ঝি হারার মাকে এনে তোমার পাশে বসিয়ে দেব নাকি? ফুলির আমাদের কাল চুল বলে কি মনে ধরলো না?

বর। (একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) মনে ধরা—পসন্দ হওয়া। যার সঙ্গে এক মিনিট বসে কোর্টসিপ করতে পাইনি—তাকে মনে ধরেচে বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। ইংরাজদের কিন্তু এসব নিয়ম বড় ভাল।"

প্র যু। "কেন ইংরাজদের কোর্টসিপের বিয়েতেও ত ঝগড়া ঝাটি, ছাড়া ছাড়ির অভাব দেখিনে"।

বর। "সে কি জানেন,—সে ভালর মন্দ। যাক্ আপনারা প্রথমে আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, যে আমি চুপ করে আছি কেন? তার উত্তর এই যে, পরশু দিন আমার একটা Engagement আছে, Town Hallএ বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটা লেকচার দিতে হবে, আমি সেই বিষয় ভাবছিলাম।"

প্র যু। "তা কি লেকচারটা দেবে শুনি—আমাদের কাছে একটা নমুনা দিয়ে যাও।"

বর। "তা উচিত কথা ছাড়া আর কি বলব ? দেখুন দেখি—১০ বৎসরের বালিকা তার আজ বিবাহ হোল, কাল সে বিধবা হোল, কাল হ'তে একাদশীর দিনে সে মুখে এক ফোঁটা জল ঠেকাতে পারবে না, কোন দিন সাধ করে একখানা রংকরা কাপড পড়তে পারবে না, আর বড় হয়ে সে যদি কোন সুপুরুষের loveএ পড়ে গেল—যেটা হওয়া খুবই সম্ভব—তাহলে তাদের দু জনের মিলনের আর কোনই সম্ভাবনা নেই। দেখুন দিকি এই শেষ ব্যাপারটা কতদূর শোচনীয়। আমার স্ত্রীর আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলে আমার উইলে আমি স্পষ্টাক্ষরে এই কথাগুলি লিখে যাব যে যদি আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করেন তবেই আমার ধনের অধিকারিণী হবেন। তা না হ'লে এক কানাকড়িও পাবেন না।"

প্র। "তা যদি বল তবে তোমার স্ত্রী দোরে দোরে বরঞ্চ ভিক্ষা মেগে বেড়াবে।"

তৃ। "নে ভাই নে এখন তোদের পণ্ডিতে পণ্ডিতে ব্যাখ্যা রাখ, এখন বর একটা গান বল ত ভাই--।

কন্যার মাতার প্রবেশ ও বরকে লইয়া আহারের স্থানে গমন।

২য় দৃশ্য।

আহারান্তে বর আবার মসনদে উপবিষ্ট।

তৃ। "নাও ভাই বর এবার একটা গান শোনাও।"

বর। আমি আপনাদের অজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এইমাত্র আহার করে এলুম এরই মধ্যে গান! স্বাস্থ্যের প্রতি কি আপনাদের একটুও দৃষ্টি নেই ?

১ম যু। "এ বর ত আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ করলে। সেজদিদি তোরা সবাই মিলে দুটো ঠাট্টা তামাসার কথা ক ?"

দ্বি। (তৃতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) "বলি একটা পান টান সেজে নিয়ে আয়—ঠাট্টাও করতে ছাই শিখ্‌লিনে।" (তৃতীয়ার প্রস্থান।)

বর। "জীবনটা কি ঠাট্টা তামাসার ? যে সারাদিন ঠাট্টা তামাসা করে কাটাতে হবে ? যতদিন আমাদের দেশে—Serious scientific spirit"—

(তৃতীয়ার পান হস্তে প্রবেশ ও বরের হস্তে পান প্রদান করিয়া)

তৃ। নাও কথা কইতে কইতে মুখ শুকিয়ে এসেছে, পানটা খেয়ে কথা কও।"

(পান খুলিয়া পানের দিকে বরের এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ)

প্র। (সভয়ে দ্বিতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) "এই বুঝি ধরে ফেল্লে। (প্রকাশ্যে) কি আবার দেখছ, পানটা খেয়ে ফেল না।"

বর। (মুখ তুলিয়া) "এমন কিছু নয়,—এই আগেই যা বলছিলুম। বাঙ্গালীদের যত দিন discovery করবার spirit না হবে, ততদিন কোন মতেই দেশের দুর্দ্দশা যাবে না। আমি যেদিন থেকে science পড়তে আরম্ভ করেছি, সেই দিন থেকে আমার ঐ দিকে লক্ষ্য।"

প্র। "তা পানের ভিতর আর কি discovery করবে ওটা খেয়ে ফেলো।"

বর। (পান মুখে দিয়া) "কি সে কখন discovery করা যায় তার কি ঠিক আছে?

তাইজন্যই ত যা কিছু হাতে পাই আমি পরীক্ষা করে দেখি। এই Dr. Kock জলের ভিতর যেদিন কলেরা জার্ম আবিষ্কার করেছেন, আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি শুকনো জিনিসের মধ্যেও সে জার্ম আছে—তাহলে ইণ্ডিয়ার কাছে তৎক্ষণাৎ ইয়োরোপের মাথা হেঁট হয়ে যায়।"

প্র। (হাসিয়া) তবে দেখছি—এবার তোমা হতেই ভারতটা উদ্ধার হ'য়ে গেল।"

বর। (পান লোন্তা বোধে—মুখ বিকৃত করিয়া) একি সত্যিই এতে জার্ম্ম টার্ম্ম কিছু আছে নাকি?—এমন ঠেকছে কেন?

(বরের থুথু করিয়া পান নিক্ষেপ। যুবতীগণের সকলে মিলিয়া হাস্য)

বর। "আপনারা একটু চুপ করুন, এ হাসিব সময় নয়। গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। এ কি হোল! চারি দিকে যে অন্ধকার—মাথার ভিতর যে বোঁ বোঁ করে করে উঠ্‌লো। ভগবান একি করিলে! মৃত্যুর জন্য আজ বিবাহ শয্যায় বসাইয়াছিলে? প্রেয়সি—তোমার ও চাঁদ মুখ—সোনার মুখ আর যে কখনো দেখিতে পাইব না,—জন্মের শোধ যে আজ শেষ দেখা দেখিয়া চলিলাম—প্রাণেশ্বরি, তুমি যে আজ বিধবা হইলে? এই শেষ দিনে একটি অনুরোধ করিয়া যাই, মাথা খাও আমার এই অন্তিম ভিক্ষাটি স্মরণ রাখিও, প্রেয়সি ইংরাজদের মত কখনো বিধবা-বিবাহ করিও না, আমি চলিলাম কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য একাদশীর প্রথাটা তুমি পালন করিবে—এই আশা হৃদয়ে লইয়া চলিলাম।"

প্র। (শশব্যস্তে) এ কি তোমার আবার একি হোল?

দ্বি। "একি নাটক করে যে?"

তৃ। "ওমা এমন বেরসিক বরও ত কোথাই দেখিনি—পানে একটু নুন দিয়েছি, তা এত হেঙ্গাম।"

বর। "নুন দিয়েছেন। কখনই না—আমি জানি এ কলেরা জার্ম। আর

আমিই ইহা আবিষ্কার করিয়াছি। আমি এখন মরিলাম বটে, কিন্তু আমার নাম চিরকালই জাগিয়া থাকিবে।

দ্বি। "এ কি তোমার মতিচ্ছন্ন ধরলো যে—মুন নয়ত আবার কি ?"

বর। (মুখ নাড়িয়া দেখিয়া স্বগতঃ) তাইত মুনইত বটে, আমাকে দেখছি বড়ই মাটি করলে। কিন্তু আমি কি না মাটি হবার ছেলে—রোসো না—(প্রকাশ্যে) ঠাট্টা ! আপনাদের ইয়ে—এই এক বিন্দুও যদি বিজ্ঞান জ্ঞান থাকত তাহ'লে কি এরূপ ঠাট্টা করতে পারতেন ? কি হতে যে কখন কি হয় তা যাদের জ্ঞান নেই—"

১ম। "তা সত্যি কথা, তোমাকে নিয়ে যখন ধান ভানতে আরম্ভ করি—তখন যে এমন শিবের গীত গাইতে হবে তা কি জানি ? না তুমি তোমার স্ত্রী বিধবা বিয়ে না করলে উইলে যে একটা কানা কড়িও পাবে না এই বলে লেকচার ঝেড়ে শেষে পাছে আবার সে একাদশী না করে সেই ভয়ে কান্না জুড়ে দেবে তাই জানি ?"

বর। "সেটা আমার দোষ না আপনাদের দোষ। সেই অবধি Science Philosoply বুঝিয়েও আপনাদের নীতি-বিরুদ্ধ ঠাট্টার হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। Oh ! Byron how truly thou said,—Philosophy and Science I have essay'd but they avail not' ! সমাজের মূল উচ্ছেদ ছাড়া এর প্রতিকার আর কি আছে ?'

১। "তা হলে বিধবার একাদশীটা পর্য্যন্ত উঠে যায় সেটা যেন মনে থাকে।"

(সকলের হাস্য)

তৃ। "না আমাদের বর রসিক বটে, অনেক বিয়ে দেখেছি—কিন্তু এমন নাটক কেউ করেনি—ও ফুলি দে তোর বরের গলায় একগাছা ফুলের মালা দিয়ে দে।"

দ্বি। "হ্যাঁ এত কান্নাকাটির পর মধুর মিলন হোক্, দুই প্রাণে মিশে এক হয়ে যাক্—আমরা দেখি— "

বর। (স্বগত) আমাকে বড় মাটীটাই করেছে—এর শোধ এইবার তুলব। (প্রকাশ্যে) দেখুন—science না জানার কত দোষ, তা হলে আর আপনি এমন absurd কথাটা বলতে পারতেন না। একজন living being কি আর একজন living deingএর সঙ্গে মিশে যেতে পারে ? প্রকৃত পক্ষে ও কথা matterএর molecules সম্বন্ধেই খাটে, কেননা cohesion matterএর একটা property ; একজন ইংরাজ মেয়ে হলে কখনো এরূপ বলতেন না— what a pity—"

প্র। "কেন— ইংরাজ মেয়ে ছাড়া অনেক ইংরাজ ইংরাজপুরুষেও ত কবিতায় এরূপ কথার ছড়াছড়ি করে গেছেন।"

বর। "সে আলাদা কথা। কিন্তু ও কথাও আর বেশী দিন চলছে না। রেনা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—অল্প দিনের মধ্যে বিজ্ঞান ছাড়া কবিতা টবিতা কিছু থাকবে না।

প্র। "তখন না হয় বলব না—"

বর। "উঁহু এখনও বলতে পারেন না ওতে অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ পড়ে। একটা গ্রহের যখন centrifugal force কমে যায় তখন সূর্য্য centri-petal force দ্বারা তাকে টেনে নিয়ে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে—কিন্তু মানুষ ত আর একটা গ্রহ নয়—"

দ্বি। "কোথাকার হতভম্বা বর, —এসব আবার কি বকে ?"

তৃ। "একবার সোজা না করে দিলে চল্লোনা দেখছি—"

প্র। "আমরা জানি—হাতের জোরে—পিঠের জোর কমিয়ে ফেলতে পারলেই মানুষ গরুদের নাকে দড়ি দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনা যায়— —পরীক্ষা দেখবে—?"

(বরের পৃষ্ঠে চারিদিক হইতে মুষ্টি পতন)

বর। "একি ভয়ানক! দোহাই আপনাদের—এ সব ছেড়ে আপনারা একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা করুন, যদি বিজ্ঞানও না পড়েন—দর্শনগুলো—গুলো না হ'ক—অন্ততঃ কাণ্টের দর্শনখানা জানা থাকলে এসব Nasty ব্যাপার হতে কেবল আমি না—সমাজ পরিত্রাণ পায়—"

প্র। "বটে, তা কানটেপার দর্শন আমরা বেশ জানি,—বিদ্যাটা দেখিয়ে দেব—"

বর। (কানমলা খাইয়া) By Jove! রক্ষা করুন—জানলে কোন হতভাগা বিয়ে করতে আসে। দোহাই তোমাদের—যা হবার হয়েছে—এমন কর্ম্ম আর কখনো কর্‌ব না।"

দ্বি। "বল করবে না— ?"

বর। "কক্ষনো না, জন্মে না, নেহাত গণ্ডমূর্খ না হলে সে বিয়ে করতে আসে—রাম রাম!"

প্র। "তা বই কি, কিন্তু হ্যাদে গণ্ডমূর্খ, বিয়েটা একবার করলে যে আর ফেরে না—"

বর। "গণ্ডমূর্খ! শেষে এও অদৃষ্টে ছিল!"

চতুর্থ। "না না গণ্ডমূর্খ না—পণ্ডিতমূর্খ। ও ফুলি তোর পণ্ডিতমূর্খ বরকে একবার ফুলের মালাটা পরিয়ে দে, তোর বুদ্ধির একটু ভাগ পাক্‌।"

(কনের হাতে মালা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া বরের গলে মালা প্রদান)

বর। (ক্রুদ্ধভাবে) মশায়রা মাপ করবেন—বিয়েটা করে জীবনের মধ্যে একটা মূর্খামি করে ফেলেছি তাই বলে আর বেশী করতে পারছিনে—"

(মালা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ)

দ্বি। "কেন মালাতে আবার কি দোষ হোল ? ওতে আবার সাপ বিছে আছে নাকি ?"

বর। "কি আশ্চর্য্য বিজ্ঞানের এই সামান্য সত্যটাও কি আপনাদের বুঝাতে হবে ? ফুল থেকে carbonic acid বলে রাত্রে এক রকম গ্যাস বার হয়—সে সাপ বিছে হতেও ভয়ানক। রাতে ফুল ঘরে রাখাই উচিত নয়।"

দ্বি। "সে আবার কি জিনিস ?"

বর। "By heaven ! সে এক রকম মন্দ বাতাস।"

তৃ। "মন্দ বাতাস কি—ভূত নাকি ?"

বর। "তা ভূত বলতে পারেন—বাতাস পঞ্চভূতের এক ভূত।"

প্র। "তা তোমাকে দেখছি আগে থাকতে পঞ্চ-ভূতেই পেয়ে বসেছে—একভূতে আর কিছু করতে পারবে না—মালাটা এখন পরে ফেল।"

জা। (স্বগত) সে কথা আর বলতে—এখন ভূত-গুলো ছাড়াতে না পারলেত আর প্রাণ বাঁচে না। (প্রকাশ্যে) অনেকক্ষণ হতে সে আলোর সামনে বসে আছি, এত-ক্ষণ ভূতেভূতে শরীর জর জর করে ফেলেছে। এভূত অন্ধকারে থাকে না, আলোতেই এ ভূতের দৌরাত্ম্য। অনেক দিন Science primerএ এইরূপ একটা কথা পড়ে-ছিলুম আজ স্বচক্ষে দেখলুম আলোকে ভূতের কিরূপ প্রাদুর্ভাব। আলো নিভিয়ে দিলেই এভূত ছেড়ে যাবে। (উঠিয়া দীপ নির্ব্বাণ)

যুবতীগণ। (গোল করিয়া) "যা হউক এত-ক্ষণে একটা কীর্ত্তি করেছে—পাশ দিয়েছে বটে।" (হাসিতে হাসিতে সকলের পলায়ন)।

*শিক্ষিত মহাশয় গতবারের ভারতীর নক্সায় আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কাছে আমরা বিশেষ ঋণী। বেশ জানি সে ঋণ পরিশোধ করা আমাদের মত লোকের সাধ্য নহে, সুতরাং তাহা আমার উদ্দেশ্যেরও বাহিরে। তবে যে আজ এই যৎকিঞ্চিৎ উপহারটুকু শিক্ষিত মহাশয়কে অর্পণ করিতে আসিয়াছি সে কেবল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাটা প্রকাশ করিতে মাত্র। ভরসা কারি সামান্য বলিয়া এ উপহার তিনি তাচ্ছিল্য করিবেন না।

*শিক্ষিতা।

*আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের নক্সা বাহির হইবারপরই তাহার উত্তর স্বরূপ এই নক্সাটি পাইয়াছি—কিন্তু স্থানাভাব বশত গত দুই মাস আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই।

ভাং সং।

ভারতী মাঘ ১২৯২, পৃঃ ৪৮৮-৪৯৩

প্রফুল্ল কুসুম অধরে মধুর হাস,
কোমল কামিনী মেঘে সৌদামিনী
গরজে গভীর ভাস ;
তাতে
জোছনার রাশি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী
যমুনার সনে জড়ায়ে রয় ॥
প'ড়ে বিষয় তরঙ্গে তবু দেখ দেখি বঙ্গে
কত সুর কত তান পুলকে ছড়ায়।
বাধা কেন দাও তায়—তাই প্রেম উছলায়
গভীর নিশ্বাস আপনি বহে।
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা মরি কি মধুর
কোমল হৃদয়ে বিদ্যুৎ রহে ॥
কবি গাহিতেছে আজ কবির কাহিনী
টিপিয়া একটু হাসিয়া কহে—
বাধা কেন দাও তায়—তাই প্রেম উছলায়
গভীর নিশ্বাস আপনি বহে ॥

কবি। কবিতাটি কেমন হয়েছে ?
বন্ধু। বড় সুন্দর হয়েছে।
কবি। তবে ছাপতে দিই ?
বন্ধু। দেবে বই কি ?
কবি। সুন্দর বোর হল কিসে ?
বন্ধু। অর্থ টুকু বুঝিতে পারি নাই বলিয়া।
কবি। একটু টীকা করিয়া দিলেই অর্থ বোঝা যায়।
বন্ধু। টীকা টিপ্পনি এখন করা হবে না। তুমি মরিয়া গেলে আমি টীকা করিব।
কবি। ছন্দটি কেমন হয়েছে ?
বন্ধু। ছন্দের দিকে কি আর আজ কাল লক্ষ্য রাখতে হয় ?
কবি। তবে ছাপতে পাঠিয়ে দিই।
বন্ধু। সে কথা আর কতবার বলব ?
কবি। কোন্ কাগজে পাঠাই ?
বন্ধু। যেখানে আলাপ আছে।

ভারতী চৈত্র, ১২৯২, পৃঃ ৫৮৬

নিমচাঁদের মর্ত্ত্য দর্শন

একদিন যমরাজ সিংহাসনোপরি বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া এই নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! মর্ত্ত্যলোক হইতে যে সকল লোক আসে, তাহাদিগের বিচার এতদিন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আজকাল একটি বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে পাই। যাহারা দণ্ড পায়, তাহারা তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করে এবং এই বলে যে, 'দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমার কিছুই দোষ নাই। পৃথিবীতে অতি নির্দ্দোষ ভাবে কাটাইতে পারিতাম, কেবল আমার স্ত্রীর জন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে হইয়াছে। দোহাই, আমি কিছুই জানি না। যত দোষ আমার স্ত্রীর।' এইরূপে মহারাজ, যে দণ্ড পায় সে এই কথা বলে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, "আজকাল পৃথিবীতে স্ত্রীরা নূতন প্রকার ভাব ধারণ করিয়াছে। কেননা এ প্রকার অভিযোগ আগে শুনা যাইত না। মহারাজ, এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা হউক। যেহেতু এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এখানে যাহা বিচার হয়, তাহা অন্যায় এবং অযথা বলিয়া স্থির হইবে। ইহাতে আপনার নামে কলঙ্ক আসিবে।" যমরাজ মন্ত্রীর কথা শুনিয়া বিশেষ ভাবিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজসভা আহূত হইল। মন্ত্রীরা উপস্থিত। যমরাজ সিংহাসন হইতে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তৎপর বিচার আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার পর ইহা স্থির হইল যে, যমপুরী হইতে একজন মন্ত্রী মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে এবং সেখানে মানুষের জীবন অবলম্বন করিয়া একথা ঠিক কিনা তাহা নির্ণয় করিয়া যমরাজকে অবগত করাইবে। কিন্তু ধরাতলে আসিতে সকলেই বিমুখ। যমরাজ ইহা দেখিয়া আজ্ঞা দিলেন যে স্ফূর্ত্তি খেলা হইবে এবং যাহার নাম তাহাতে পড়িবে তাহাকেই যাইতে হইবে। সুসঙ্গত বলিয়া একজন যমপুরের কর্ম্মচারী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সে পাঁচ লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবে, আসিয়া বিবাহ করিবে এবং মনুষ্যের ভাগ্যে যে সকল দুর্ঘটনা এবং কষ্ট ঘটে, সে সকলি তাহার সহ্য করিতে হইবে ইহা স্থির হইল। নাম পর্য্যন্ত তাহার বদলাইতে হইবে—সেইজন্য সে নিমচাঁদ নাম ধারণ করিয়া যমপুরের অন্যান্য অনেকগুলি লোক লইয়া একেবারে কাশ্মীরে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। অতীব ধন-সম্পন্ন বণিক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়া নিমচাঁদ একটি বৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিয়া সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নিমচাঁদ দেখিতে মন্দ নহে। বিদ্যা বুদ্ধি

আছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টাকাও আছে। এই দেখিয়া অনেক লোকে তাহাদিগের কন্যার সহিত নিমচাঁদের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিল। নিমচাঁদও সেই সকল প্রস্তাব শুনিয়া মহা আগ্রহ প্রকাশ করিল। অবশেষে অনেক দেখিয়া শুনিয়া একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে মনোনীত করিল। কন্যাটির নাম মনোরমা, তাহার পিতা মাতা গরীব, সুতরাং কন্যার বিবাহ দিবার সময় নিমচাঁদের সহিত তাঁহারা এই ঠিক করিয়া লইলেন যে, নিমাইচাঁদকে তাহার দুই ভগিনীর বিবাহ দিতে হইবে এবং তিন ভ্রাতাকে অর্থ দিয়া বাণিজ্যার্থে বিদেশে পাঠাইতে হইবে। নিমচাঁদের বিবাহ হইল। ঘোর ঘটা করিয়া বিবাহ হইল এবং নিমচাঁদ প্রথম দিবস হইতে স্ত্রীর দাসানুদাস হইয়া পড়িল। স্ত্রীর অনুরোধে সে সকলই করিত। অনেক অর্থ দিয়া দুই শ্যালিকার বিবাহ দিল এবং পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দিয়া একটি শ্যালককে বিদেশে পাঠাইল। নিমচাঁদ সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহিত জীবন অনেক সময় অধিক দিন সুখে কাটে না। নিমচাঁদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। সে স্ত্রীর মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সদাই রত, কিন্তু স্ত্রীর কামনা কখন পূর্ণ হয় না। স্ত্রীর মন যোগাইতে তাহাকে শীঘ্রই সর্বস্বান্ত হইতে হইল। কিন্তু সকল হারাইয়াও যদি স্ত্রীকে সুখী করিতে পারিত, তাহাতে হানি ছিল না। তাহাত অসম্ভব হইয়া পড়িল। স্ত্রীর যেমন রাগ, তেমনি অহঙ্কার। স্বামীকে কটু কথা বলা মনোরমার একটি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য ছিল, এবং কখন কখন অহঙ্কার করিয়া স্বামীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াও হইত। একে স্ত্রীর গঞ্জনা দিবারাত্রি, তাহাতে টাকার অভাব! নিমচাঁদের দিবসে ফুর্ত্তি নাই, রাত্রে বিশ্রাম নাই। শরীর শীর্ণ হইল, মুখ ম্লান হইল এবং মনও গ্লানিতে পূর্ণ হইল। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, যেহেতু তাহার পৃথিবীতে দশ বৎসর থাকিবার কথা। সর্বক্ষণ স্ত্রীর করাল বদন শয়নে স্বপ্নে জাগ্রতাবস্থায় তাহার সম্মুখে উপস্থিত। শেষে এমন হইল যে যদি কেহ বলিত যে তোমার স্ত্রী আসিতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গ বিকল হইয়া সে জ্বরে পড়িত। প্রাণ দুঃসহ হইল। আবার বিপদের উপর বিপদ। যে কয় শ্যালককে টাকা দিয়া বিদেশে পাঠাইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যের একজন সর্বস্বান্ত হইয়া যায়, আর একজনের জাহাজ সমুদ্রে জলমগ্ন হয়। যাহা কিছু আশা ছিল, তাহাও গেল। এদিকে সহরের লোকেরা জানিতে পারিল যে নিমচাঁদের আর কিছুই নাই। তাহাদিগের অনেকের নিকট সে ঋণী হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা নিমচাঁদকে জেলে পাঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নিমচাঁদ দেখিল যে আর রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। এই মনে করিয়া একদিন পার্শ্ব দরজা দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সে পলায়ন করিল

ক্ষণকাল পরে সহর মধ্যে জনরব হইল যে নিমচাঁদ পলাইয়া গিয়াছে। যাহারা তাহাকে টাকা ধার দিয়াছিল তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। নিমচাঁদ ছুটিতেছে, তাহারাও ছুটিতেছে। তাহারা নিমচাঁদের এত নিকটবর্ত্তী হইল যে নিমচাঁদের কর্ণে তাহাদিগের ঘোড়ার টকাবক্ শব্দ প্রবেশ করিল। সে রাস্তায় আর যাইতে না পারিয়া এক মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়াও অসম্ভব হইল। অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক কৃষকের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কৃষক তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাকে কতকগুলা ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। পশ্চাৎবর্ত্তী লোকেরা অনেক অন্বেষণ করিয়া তাহাকে না পাইয়া চলিয়া গেল। অবশেষে নিমচাঁদ বিপদ চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া বাহিরে আসিল এবং কৃষককে বলিল, "ভাই! তুমি আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি কখন ভুলিব না। তুমি যাহাতে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখী হও, তাহা আমি করিব। এই বলিয়া সে আদ্যোপান্ত নিজের ইতিহাস কৃষককে বলিল। সে মনুষ্য নহে, যমরাজের প্রজা। মর্ত্ত্যলোকে কি কারণে আসিয়াছিল, এখন তাহার একপ দুরবস্থা কি সূত্রে হইয়াছিল, এ সমুদয় সবিস্তারে কহিয়া সে কৃষককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে কৃষক! তুমি শীঘ্র শুনিতে পাইবে যে এই সহরের একজন স্ত্রীলোককে ভূতে পাইয়াছে। এ সমাচার পাইলেই তুমি স্থির করিয়া লইও যে আমি তাহাকে পাইয়াছি। আর তুমি আমাকে যাইতে না বলিলে আমি সে স্ত্রীলোককে কখন ছাড়িব না। এইরূপে তুমি তাহার পিতার নিকট হইতে যত টাকা ইচ্ছা হয়, লইতে পার।" এই বলিয়া নিমচাঁদ তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিছুদিন পর কৃষক শুনিতে পাইল যে সহরে বলদেব নারায়ণ বলিয়া একজন ধনবান্ লোকের কন্যাকে ভূতে পাইয়াছে। সে নানা প্রকার প্রলাপ বকিতেছে। লোকে না বলে যে মেয়েটা কল্পনা দ্বারা চালিত হইয়া অস্বাভাবিক ব্যবহার করিতেছে এইজন্য ভূত তাহার মুখ দিয়া সংস্কৃত কহিতে লাগিল, যোগশাস্ত্রের নানা বিধি দিল এবং অনেকের ভিতরকার কথা সকল বাহির করিতে লাগিল। অমুক পুরোহিত এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, অমুক সাধু অমুকের সর্বনাশ করিয়াছে, এই প্রকার গোপনীয় কথা প্রকাশ করাতে অনেকের মহা আমোদ হইল, কাহারও ভয় হইল এবং কতকগুলি লোকের মনে মহাক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়ে আর সারে না। অবশেষে কৃষক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলদেব নারায়ণকে বলিল যে, আমাকে যদি ৫০০্ টাকা দেন, আমি আপনার কন্যাকে স্বাস্থ্য দান করিব। পিতা সম্মত হওয়াতে কৃষক কন্যার কর্ণে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল, "নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, আমি সেই কৃষক। এখন এই কন্যাকে ছাড়িয়া যাও।" নিমচাঁদ বলিল,

"তুই এসেছিস্। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু পাঁচশত টাকাতে কি তুই বড় মানুষ হইবি? ইহাতে তোর কি উপকার হইবে? আমি আর দিন কয়েক পরে উদয়পুরের রাজার কন্যাকে পাইব। তুই সেইখানে গিয়া অনেক টাকা চাহিস। চাহিলেই পাইবি।" এই বলিয়া নিমচাঁদ চলিয়া গেল, কন্যা আরোগ্য লাভ করিল এবং কৃষক পাঁচশত টাকা পাইয়া একটি বাড়ী কিনিল।

কিছুদিন পরে উদয়পুরের রাজার কন্যাকে ভূতে পাইল। অনেক ওঝা আসিল, অনেক মন্ত্র উচ্চারিত হইল, উপাধ্যায়েরা আসিয়া বিধিমত এবং শাস্ত্রমত সমুদয় ক্রিয়া কলাপ করিল কিন্তু কিছুতেই কিছুই হইল না। অবশেষে রাজা কৃষকের কথা শুনিয়া তাহাকে আনাইলেন। কৃষক ৫০,০০০ টাকা চাহিল। রাজা সম্মত হওয়াতে কৃষক নিমচাঁদকে যাইতে বলিল। নিমচাঁদ যাইবার সময় কৃষককে বলিল, "তুই এখন বড় মানুষ হইয়াছিস্, তোর ঋণ আমি শুধিয়াছি। আর তুই আমার কাছে কিছুই পাইবি না। এখন যা সুখে দিন কাটাগে। কিন্তু তোর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। আমা হইতে সদা দূরে থাকিস। আবার দেখা হইলে তোর যে উপকার করিয়াছি তাহা উপকার না হইয়া অপকার হইয়া উঠিবে।" কৃষক সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষকের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। দিল্লীর সম্রাটের কন্যাকে ভূতে পাইয়াছে এই সংবাদ একদিন কৃষক হঠাৎ শুনিল। তাহার দ্বারে রাজদূত উপস্থিত। "তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে মহারাজা এই আজ্ঞা করিয়াছেন।" কৃষক অনেক আপত্তি করিয়া রাজদূতকে বিদায় দিয়া কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি পাইল। কিন্তু সম্রাট কৃষকের অসম্মতি গ্রহণ করিলেন না। কাশ্মীর দিল্লীর অধীনস্থ ছিল। সুতরাং দিল্লীশ্বর কাশ্মীরাধিপতিকে কৃষককে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। কৃষকের অনন্যগতি হইয়া দিল্লীতে যাইতে হইল। সম্রাটের সম্মুখে সে বলিল,—"আমার ভূত তাড়াইবার ক্ষমতা ছিল বটে। কিন্তু আমি সকল অবস্থাতে কৃতকার্য্য হই না। ভূতেরা অতিশয় স্বেচ্ছাচারী এবং একগুঁয়ে, তাহাদের তাড়ান দুরূহ।" সম্রাট বলিলেন "যাহাই হউক না কেন আমার কন্যাকে যদি ভাল করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার ফাঁসি হইবে। কৃষক এই কথা শুনিয়া ভয়ে অস্থির। উপায়ান্তর নাই, যাহা হউক একটা কিছু করিতে হইবে। হৃদয়ে যতটুকু পরিমাণ সাহস ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া অবশেষে সে রাজকন্যাকে তাহার নিকটে আনয়ন করিতে বলিল। রাজকন্যা আসিলে সে তাহার কর্ণে এই কথাগুলি বলিতে লাগিল— "নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, তোমার পায়ে পড়িতেছি। এবার আমার কথাটি শুন। তোমার যে উপকার করিয়াছিলাম; নিদেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতার অনুরোধে এই বারটা

আমার কথা শুন। আমার কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে জান ত ?" নিমচাঁদ কৃষকের গলা শুনিয়া রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে বলিয়া উঠিল—"ওরে বিশ্বাসঘাতক আবার আমার কাছে এসেছিল। বড় মানুষ হইয়া তোর বুঝি ভারি অভিমান হয়েছে ! দেখ তোর ক্ষমতা অধিক কি আমার ক্ষমতা অধিক ! তুই ফাঁসি যাইবি, আর আমি আনন্দের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব।" কৃষক অধোবদন হইয়া ফিরিয়া আসিল। অথচ তাহার মনে রাগ হইল। সে মনে করিতে লাগিল, "আমি মানুষ আর ও ভূত। মানুষের বুদ্ধি অধিক না ভূতের ? ভূতের অধিক ইহা ত আমি প্রাণ গেলেও স্বীকার করিব না। আচ্ছা দেখা যাউক ভূতের কত বুদ্ধি।" এই মনে করিয়া সে মহারাজার কাছে গিয়া বলিল—"অন্নদাতা, আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। কতকগুলা ভূত এত লক্ষী ছাড়া যে তাহাদের কিছু বলিলেও তাহারা কথা শুনে না। এ ভূতটাও সেই শ্রেণীর। যাহা হউক আমি যাহা বলিতেছি সেই মত কার্য্য করিতে হইবে। মহারাজ, ময়দানের মধ্যে একটা বৃহৎ মাচা নির্মাণ করিয়া তাহা স্বর্ণাচ্ছাদনে ভূষিত করিতে হইবে এবং সহরের যত সম্ভ্রান্ত লোক আছে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। কাল প্রাতে মহারাজ মন্ত্রিবর্গ বেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে উপবেশন করিবেন। পূজা সাঙ্গ হইলে রাজকন্যা তথায় আনীত হইবেন। আর একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে রাজ্যে যত ঢাক, ঢোল, নাগরা, খোল, কাঁসর ঘণ্টা আছে যাহাতে প্রকাণ্ড নারকিক শব্দ হয়, সেই সকল যন্ত্র একত্রিত করিয়া সেইখানে উপস্থিত করাইবেন। আমি ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহা বাজিয়া উঠিবে।" সম্রাট তদনুরূপ আজ্ঞা করিলেন। পরদিন প্রাতে সহরের মধ্যে ঘোর কলরব। মহা জনতা এবং সমারোহ দেখিয়া নিমচাঁদ মনে করিল যে কৃষক মনে করিয়াছে এবার আমাকে আর থাকিতে দিবে না। ঢোল ঢাকের শব্দে আমাকে তাড়াইবে। যেন নরকে এর অপেক্ষা ভয়ানক শব্দ আমরা শুনি না। যাহা হউক কৃষকের কপালে অনেক ভোগ আছে।" কৃষক নিমচাঁদের কাছে আসিয়া বলিল,—"নিমচাঁদ, এস না, বাহির হইয়া এস।" নিমচাঁদ বলিল—"ওরে হতভাগা, তুই মনে করেছিস, আমি কিনা অসাধারণ কার্য্য করিয়াছি। তোর ফাঁসি না দেখিয়া আমি এখান হইতে যাব না।" কৃষক অনেক মিষ্টবাক্য, অনেক সাধ্য সাধনা অনেক মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু নিমচাঁদের আক্রোশ ততই বাড়িত। যখন কৃষক দেখিল আর কোন উপায় নাই সে ইঙ্গিত করিল আর তখনি যত ঢাক ঢোল ছিল সকলই এককালে বাজিয়া উঠিল। বাদ্যকারেরা ক্রমশঃ নিমচাঁদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। নিমচাঁদ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কৃষককে জিজ্ঞাসা করিল ইহার

অর্থ কি ? কৃষক উত্তর দিল—"নিমচাঁদ হায়! কি বলিব তোমার স্ত্রী আসিতেছে তোমাকে অন্বেষণ করিতে আসিতেছে।" স্ত্রীর নাম শুনিয়া নিমচাঁদের মুখ হঠাৎ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। কৃষকের কথা সত্য কিনা ইহা চিন্তা করিবার সময় না পাইয়া সে আর কিছু না বলিয়া এক লম্ফ দিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রাজকন্যা বাঁচিয়া গেলেন। কৃষক প্রচুর পুরস্কার পাইল আর নিমচাঁদ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া যমপুরে আসিয়া যমরাজের সম্মুখে সমুদয় বিবরণ বিস্তৃতরূপে বলিয়া স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। যমরাজও জানিলেন যে আজকাল পৃথিবীর স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্বানর্থের মূল।

শ্রীনারীপদ দাস

ভারতী ও বালক। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। পৃঃ ৮২-৮৬।

সমুদ্র লঙ্ঘন

ভারতী পত্রিকা ১৩০১-আশ্বিন

দেবদৈত্যত্রাস রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ পূর্ব্বক জানকীকে উদ্ধার করিয়া শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা নগরে প্রত্যাগত হইলে নাগরিকদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। বহুবিধ উৎসবে নগর পরিপূর্ণ হইল। কয়েক দিবস অতীত হইলে পরমভক্ত মহাবীর হনুমান যুক্ত করে শ্রীরামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

পবননন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, স্মিত মুখে জানকীবল্লভ কহিলেন, "বীর, প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে ?"

হনুমান যথোচিত বিনয় সহকারে কহিলেন, "বহুদিন প্রবাসে বাস করিয়া একবার স্বদেশ দর্শন করিবার অভিলাষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে এই উৎসব আনন্দময়ী নগরীতে আমার কোন কর্ম্ম নাই। মহারাজের অনুমতি পাইলে কয়েকদিবস কিষ্কিন্ধ্যায় যাপন করিয়া পুনরায় মহারাজের নিকট আগমন করি।"

রাম সহাস্যে কহিলেন, "তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর। গমনকালে মৈথিলীর অনুমতি লইয়া যাইও।"

জানকীর নিকট অনুমতি লইবার কালে দেবী কৌতুক করিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি কিস্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া বিবাহ করিয়া বধূকে সঙ্গে লইয়া আসিও। তোমার বয়স অধিক হতে চলিল, আর কতকাল অবিবাহিত রহিবে? তোমার কীর্ত্তি এবং যশোরাশিতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মবর্ত্ত পরিপূরিত সুরভিত হইয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলেই কোন সুন্দরী বানরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পার।"

হনুমান কহিলেন, "দেবি, আপনি কি জানেন না আমার হৃদয়ে রাম নাম শোণিত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে? সেই হৃদয়ে অপরকে গ্রহণ করিব? আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের দাস্য স্বীকার করিব, পরন্তু অপ্সরীতুল্যা বানরীর প্রতি কটাক্ষপাত করিব না। রামের সেবক আমি, আমি রামসর্ব্বস্ব, জয় রাম বলিয়া যে গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি তাহাতেই সিদ্ধ হইয়াছি। সংসারশ্রমে কিরূপে অভিরুচি জন্মিবে?

আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া জানকী কহিলেন, "ধন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ! তোমার সাধনা যেরূপ সিদ্ধিও তদনুরূপ। তুমি কিস্কিন্ধ্যাবাসীদিগের নয়ন পুলকিত করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। তোমার অনুপস্থিতি কালে আর্য্য পুত্রের ও আমার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইবে।" অতঃপর সীতা হনুমানের মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হনুমান তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং রামের পাদবন্দনা করিয়া শুভ দিনে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর কিস্কিন্ধ্যা নগরে হনুমানের আগমন বার্ত্তা রাষ্ট্র হইলে সর্ব্বত্র আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল। বানর শিশুগণ কিলকিলা রবে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। বানরীগণ মঙ্গল সূচক হুলুধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল। যুবকবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। কেহ সুপক্ক কদলী লইয়া আসিল, কেহ তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। অবিবাহিতা যুবতি বানরীগণ পরস্পরে কহিতে লাগিল, এই মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ যে বানরীর পাণিগ্রহণ করিবেন, বানরীকুলে সেই ভাগ্যবতী। হনুমান আনন্দিত হইয়া যথারীতি সকলকে সম্ভাষণ করিলেন।

কিন্তু নগরবৃদ্ধগন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন না। তাঁহারা স্থবির, বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ। কেহ বৃক্ষকোটরবাসী, কেহ বৃক্ষারোহণে অক্ষম হইয়া বৃক্ষমূলে বাস করেন। নগরের বাহিরে গমনাগমন কাহারও ঘটে না। কেহ মহামহোপাধ্যায়, কেহ আচার্য্য, কেহ শাস্ত্রী, কেহ নৈয়ায়িক। তাঁহারা বালক, যুবক এবং রমণীদিগের আচরণে রুষ্ট হইলেন। পর দিবস মহতি সভা আহূত হইল। হনুমান সেই সংবাদ অবগত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

সভা সমবেত হইল। বানর বানরীগণ সসম্ভ্রমে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

বালকেরা দূর হইতে সভয়ে দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃদ্ধগণ আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র, চক্ষু কোটর গত, দংষ্ট্রা গলিত, চর্ম্ম লোল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, তাঁহাদিগের গতির অনুসরণ করিতে করিতে, বানর শিশুগণ কিচিমিচি শব্দে পলায়ন-পর হইল। তারপর বানরগণ তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত করিল।

বৃদ্ধগণ আসন গ্রহণ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বৃদ্ধতম, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা উল্লুক ভট্ট সভার শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। শ্রোতাগণ অবহিতচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার বাক্যবিন্যাস শ্রবণ করিতে লাগিল। উল্লুক ভট্ট কহিতে লাগিলেন, "এই পুণ্যদর্শন কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে হনুমান নামে এক বানরাধম বাস করিত। বানরকুলকলঙ্ক সেই পামর দেশান্তরে গমন করে। অধুনা এই নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার আগমনে বানর যুবক এবং বানরী যুবতীসমূহ বানর সমাজের নেতৃবর্গের বিনানুমতিতে, অগ্রপশ্চাৎ ফলাফল বিবেচনা না করিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। বালকদিগের কোন উল্লেখ করিব না, কারণ তাহারা যেরূপ অল্পবুদ্ধি তাহাদিগকে বানর না বলিয়া মনুষ্য বলিলেও ক্ষতি নাই। যুবকগণ সেই কুলপাংশুল হনুমানকে নগরবৃদ্ধের ন্যায় সম্মান করিয়াছে, নারীগণ তাহাকে লাজাঞ্জলি দিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক নগরদ্বারে অভ্যর্থনা করিয়াছে। এমন কি, কোন কোন যুবতি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে। "সভাস্থ যুবক যুবতীগণ লজ্জায় অধোবদন হইল। উল্লুকভট্ট বলিতে লাগিলেন, "এই অপরাধে ইহারা সকলেই সমাজচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞানকৃত অপরাধের মার্জ্জনা আছে। এই দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার হনুমান সমাজের নিকট কিরূপ অপরাধী, এবং তাহার অপরাধের কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা অপরাপর পণ্ডিতগণ বিবৃত করিবেন।"

পণ্ডিতপ্রবর বিবৃত্তানন তর্কষডানন কহিলেন, "যে সকল মূঢ় মতিচ্ছন্ন যুবকগণ এই কুলাঙ্গার হনুমানকে ঈদৃশ সম্মানিত করিয়াছে সমাজচ্যুত করিলেও তাহাদিগের গুরু দণ্ড হয় না। যে রমণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। তথাপি ভট্ট মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন যে, অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনীয়। এক্ষণে এই হনুমানের দুষ্কৃতের কথা সবিস্তারে কহিতেছি, শ্রবণকর। পুণ্যভূমি কিষ্কিন্ধ্যায় বানরগণ পুরুষ পরম্পরায় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ, পক্ক এবং অপক্ক ফল ভক্ষণ, দুর্ব্বলকে নখাঘাত ও দংশন, বলবানকে দংষ্ট্রা-পংক্তি প্রদর্শন করিয়া পলায়ন, এইসকল প্রধান কর্ত্তব্য বানরগণ চিরকাল পালন করিয়া আসিতেছে। প্রবাসে কালযাপন বানরদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৃহৎ কলেবরা গভীর সলিলা নদীর পরপারে গমন করিলে জাতিনাশ হয়। সমুদ্রের পারে গমন করিলে

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই দুর্ব্বিনীত হনুমান সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পরম পবিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ বানরকুল কলঙ্কিত করিয়াছে। সমুদ্র লঙ্ঘনকালে এই মহাপাতকী সুরমা নাম্নী রাক্ষসীর আস্য বিবরে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার নির্গত হয়। এক্ষণে এই পামর সেই রাক্ষসীর উদ্গীর্ণ উচ্ছিষ্ট মাত্র। এই নষ্ট, ভ্রষ্ট, উচ্ছিষ্ট পতিতের প্রতি এই সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী কি দণ্ড বিধান করেন?

দংষ্ট্রাবহুল, প্রকাণ্ডোদর মর্কটশাস্ত্রী ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কহিলেন, "স্পর্দ্ধায় হিতাহিত শূন্য হইয়া এই অর্ব্বাচীন রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। রাক্ষসরাজের উদ্যান হইতে এই লুব্ধ একাকী অমৃতফল ভক্ষণ করিয়াছে, আমাদিগের জন্য কিছুই লইয়া আইসে নাই। লঙ্কাদহনকালে এই হতভাগার মুখ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই সময় ইহার লজ্জাও দগ্ধ হয়। লজ্জার লেশমাত্র থাকিলে এই দগ্ধানন এখানে কিরূপে আগমন করিত?"

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কপিকুলভূষণ ভ্রষ্টলাঙ্গুল বিদ্যাবারিধি মহাশয় কহিলেন, "কোন লোভে এই মূর্খ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল? এই কিস্কিন্ধ্যার বাহিরে দর্শন করিবার অথবা শিক্ষা করিবার কি আছে? সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম এই স্থানে, সকল বিদ্যার পরাকাষ্ঠা এই স্থানে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চরম উন্নতি এই স্থানে। মহামূর্খ ব্যতীত কে এই কিস্কিন্ধ্যাপুরী পরিত্যাগ করে?

পণ্ডিতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভাস্থলে ঘোর কোলাহল সমুত্থিত হইল। "সমাজ হইতে পাতিত কর," "মুখভঙ্গী প্রদর্শন কর," "লাঙ্গুল আকর্ষণ কর," "দংষ্ট্রা উৎপাটন কর," "নগর বহিষ্কৃত করিয়া দাও," এইরূপ নানাবিধ শব্দ হইতে লাগিল। সেই কোলাহলের মধ্যে এক উগ্রমূর্ত্তি বানর চীৎকার করিয়া কহিল, "কাহার জন্য এই বর্ব্বর বানর সমুদ্র পারে গমন করিয়াছিল? সীতাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য? সীতা ত মানবী—"

বক্তার বক্তৃতাপ্রবাহ অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। সংক্ষুব্ধ, ভীমগর্জ্জিত সমুদ্রের ন্যায় সেই কোলাহল নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হইল। সভাস্থ সকলে সভয়ে দেখিল মহাবীর হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘন কালে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিশাল, ভীতিবর্দ্ধক দেহ দর্শন করিয়া বানরগণ ত্রাসে বাক্শূন্য হইল। ঘন ঘোর মেঘগর্জ্জনের তুল্য গভীর স্বরে হনুমান কহিলেন, "কীস্কিন্ধ্যা নিবাসী পণ্ডিতগণ! আমাকে তোমরা সমাজচ্যুত কর, অথবা আমার নিন্দা কর তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু জীবনে সাধ থাকিলে জানকী অথবা শ্রীরামচন্দ্রের অবমাননাসূচক বাক্য আমার সমক্ষে মুখে আনিও না। তোমাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্ব

বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। রাজরাজেশ্বরী রাজলক্ষ্মী জননী জানকীর উদ্ধারের নিমিত্ত, অথবা তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য লঙ্কায় গমন ত অতি তুচ্ছ কথা, সপ্তসমুদ্রলঙ্ঘন করিতে পারি, হাস্যমুখে এই দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি।"

ভারতী পত্রিকায় রচনাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা :—৩৬২—৩৬৫ পর্যন্ত ; ১৩০১ আশ্বিন।

সূচিপত্রানুসারে রচনাটির লেখক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাবু-ভীতি বা বাবু ফোবিয়া

"বাবু-ভীতি" কি তাহা বুঝিতে হইলে, "বাবু" পদার্থটি যে কি তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। "বাবু" বলিতে কেহ কেহ বুঝিবেন দাড়ি-ছড়ি-ঘড়ি-চেন-চসমা-চুরুট-ধারী, ইংরাজী-শিক্ষাভিমানী, অভক্ষ্যভোজী, বাকসর্বস্ব, স্বধর্মত্যাগী, বঙ্গদেশীয় জীববিশেষ। কেহ কেহ বুঝেন প্রকৃত শিক্ষিত, স্বদেশ হিতৈষী, উদারপ্রকৃতি, স্বাধীনচেতা, চিন্তাশীল ও পরদুঃখ-কাতর এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষ। "বাবু-ভীতি" এক প্রকার নূতন রোগ। এই রোগের অন্যতম কারণ দ্বিতীয় প্রকারের বাবু। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক যে এই রোগ সম্বন্ধে কেবল বঙ্গদেশীয় বাবু বুঝায় না, কুমারিকা হইতে শিমলা শিখর, বঙ্গোপসাগর হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ভূ-বিভাগবাসী উক্ত দ্বিতীয় লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই 'বাবু' নামে অভিহিত। এক্ষণে সাধারণকে সাবধান করণার্থ অতি সংক্ষেপে এই রোগ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা যাইতেছে।

রোগের নামকরণ—কতকগুলি বহুদর্শী চিকিৎসক ইহাকে "বাবু-ম্যানিয়া" নাম দিতে চাহেন। কিন্তু বৃটিশ ফারমাকোপিয়ার মতে ম্যানিয়া নাম দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে। যত প্রকার ম্যানিয়া আছে সকল প্রকারের লক্ষণের সহিত ইহার লক্ষণ-সমূহ মিলাইয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশের সঙ্গেই ইহার অনৈক্য দৃষ্ট হইল ; কিন্তু যত প্রকার ফোবিয়া আছে তাহার লক্ষণের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলে। যেমন—হাইড্রো-ফোবিয়ায় জলকে ভয় হয়, সেইরূপ "বাবু-ফোবিয়ায়" বাবুর চেহারাকে ভয়, কলমকে ভয় ও বক্তৃতাকে ভয়। সুতরাং 'বাবু-ফোবিয়া' নামই বিজ্ঞান, অভিধান ও যুক্তিসঙ্গত।

রোগের ইতিহাস—১৮৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্বে এই সংক্রামক রোগের কোন প্রকার লক্ষণ কোথাও দেখা যায় নাই। ইহার পূর্ব্বে কদাচিৎ কখন এই রোগাক্রান্ত দু-একটী

রোগীর কথা শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না। বিশেষতঃ ভাল ভাল চিকিৎসকের মত এই যে তাহা আদৌ 'বাবু-ফোবিয়া' নহে, অন্য প্রকার ফোবিয়ার বিকার বা পরিমাণ ফল মাত্র। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে হঠাৎ ইহার সংক্রামক ভাব প্রথম প্রকাশ পায়। ইলবার্ট বিলই তাহার মুখ্য কারণ। কলিকাতার ব্রান্সন নামে এক ফিরিঙ্গি ব্যারিষ্টার ও এলাহাবাদের মনিং পোষ্ট পত্রের এ্যাটকিন্স নামক অপর একটী ফিরিঙ্গী এই রোগাক্রান্ত হয়েন। এ সময়ের ইহাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডাক্তারেরা তাঁহাদের পীড়া গুরুতর বলিয়া স্থির করেন। তাঁহাদের প্রাণহানি না হইলেও একজনের পসার ও অন্যের খ্যাতি নষ্ট হয়। তৎপরে ৩।৪ বৎসর ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় নাই। ১৮৮৭ খৃঃঅব্দে ইহার সংক্রামকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। "জাতীয় সমিতিই" তাহার মূল কারণ। সুতরাং স্যর লিপেল গ্রিফিণ এই পীড়াগ্রস্ত হইলেন। যাহাতে মহারাষ্ট্রবাসিগণ এই আন্দোলনে যোগদান না করেন, বাবুদের দ্বারা বিপথে চালিত না হয়েন, তজ্জন্য মধ্য ভারতের কোন দরবারে তিনি বিধিমত চেষ্টা করেন ও ভারতবাসীকে বিশেষ খাতক করিয়া দেন। স্যর সায়েদ আহম্মদ খাঁও এই পীড়ার হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। লক্ষ্ণৌ সহরে তিনি জাতীভায়াদিগকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে, যদি তাঁহারা বাবুদের পদধূলি লেহনাভিলাসী না হন, তবে যেন ত্বরায লম্ফ প্রদানে ট্রেনে উঠিয়া মাদ্রাজ গমন করেন; কারণ, বিলম্বে বিপৎপাতের সংপূর্ণ সম্ভাবনা। গ্রিফিণ ও আহম্মদ কর্ত্তৃক এই রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ভয়ানক ভাব ধারণ করে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ইহার প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ অব্দে এই রোগের কথঞ্চিৎ প্রশমন হয়। ১৮৯১ সালে ইহা মৃদুভাব ধারণ করিয়া ১৮৯২ সালে পুনরায় ভয়ানক আকারে প্রকাশ পায়। এবার সুদূর ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত ইহার প্রকোপ লক্ষিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার পুনঃগঠনই ইহার কারণ। ম্যাকলীন নামে একজন ইংরাজ এই রোগাক্রান্ত হয়েন, আর তাহার ফলে তাঁহার নামান্তস্থ M. P. নামক উজ্জল উপাধিটি খসিয়া পড়ে। অদ্যাবধি এই রোগ সমভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ফিলিপ্স, কনষ্টাম, র‍্যাডিস্, বেল প্রভৃতি অনেকেই কতক মাত্রায় এই রোগে ভুগিতেছেন। অধুনা কোন কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীও এই রোগাক্রান্ত হইয়াছেন শুনিতে পাওয়া যায়—কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বের "ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট" পত্রে তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এই রোগ মারাত্মক না হইলেও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং সংক্রামক বটে। ডেঙ্গোজ্বরের ন্যায় ইহা হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং চিরকালের জন্য বুদ্ধি বৈকল্য সংঘটন করে।

রোগোৎপত্তির কারণ—এ পর্য্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্‌গণের গবেষণায় ইহার

দুইটি কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১ম—ভারতে ভারতবাসীর নম্রস্বভাব, ২য়—ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন। ভারতবাসী সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতি ও ধীরস্বভাব। নম্রতা ও বিনয় তাহাদের চরিত্রের প্রধান সদ্গুণ। ইংরাজী শিক্ষা লোকের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করে। ভারতবাসীর এই স্বাধীনতা-লিপ্সাই বাবু-ভীতির একটি প্রধান কারণ। রোগের বিস্তৃতি ও সংক্রামকতা বৃদ্ধি হইবার বহুবিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাবুদের প্রার্থনা পূরণ, এবং তাহাদের অভিমতানুযায়ী শাসনতন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের আশঙ্কাই প্রধান।

রোগের লক্ষণ—এই রোগ মজ্জাগত, অস্থিগত ও স্বার্থগত। কিন্তু প্রধানতঃ ইহাকে যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়াই বলা যাইতে পারে। যকৃৎ বিকৃত হইলে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং মেজাজ সদা সর্বদাই বিগড়াই থাকে। মেজাজ খারাপ হইলে কাণ্ডাকাণ্ড, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বক্তব্যাবক্তব্য জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে; নিজের কার্য্য ও চিন্তা প্রভৃতির উপর আয়ত্ত থাকে না, আত্ম-শাসন নষ্ট হয়। পীড়িতাবস্থায় রোগী এমন কথা বলে, এমন কাজ করে যে রোগোন্মুক্ত হইলে তাহা স্মরণ করিতেও মরমে মরিয়া যায়। ইহার আর একটি লক্ষণ এই যে রোগী পীতবর্ণ বা কামলা রোগগ্রস্ত হয়। যকৃৎ যেমন পিত্তের, মস্তিষ্ক তদ্রূপ চিন্তার আধার। যকৃতের পীড়া হইলে যেমন পিত্ত দোষিত হয়, মস্তিষ্কের পীড়া হইলে সেইরূপ হিতাহিত জ্ঞান বা বিবেক অন্তর্হিত হয়। কোপিত পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ন্যাবা বা কামলা রোগ উৎপন্ন করে। পীতবর্ণ চক্ষুই এই রোগের লক্ষণ। কামলারোগী সকল বস্তুই পীতবর্ণ দেখে। তদ্রূপ "বাবু-ভীতি" রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দর্শন শক্তি এরূপ বিকৃত ও বিসদৃশ হয় যে কোন পদার্থের প্রকৃত বর্ণ সে নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। অতএব এই রোগের লক্ষণ ১ম—বিকৃত মেজাজ, ২য়—কূট বা বিকৃত দৃষ্টি-শক্তি।

চিকিৎসা—এ পর্য্যন্ত এই রোগের কোন ঔষধই আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার অব্যর্থ বা অমোঘ কোন ঔষধ নাই—ইহার ডীঃ গুপ্ত এখন পর্য্যন্ত উদ্ভূত হন নাই। যকৃৎ পীড়ার যে চিকিৎসা, ইহাতেও তাহা ফলদায়ক হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। তবে ঠেঙ্গাপাথি মতে মুষ্টিযোগ প্রয়োগেও দু এক স্থলে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। জোলাপ, জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ, শিরাচ্ছেদ দ্বারা রক্তনিঃসারণ, বিশেষ উপকারী। কোন কোন স্থলে পদোন্নতি, ফার্লো, প্রিভিলেজ লিভ, স্থান পরিবর্তন, বাতুলালয়ে বাস ও হাইকোর্টের গুতায় এ রোগের আশু উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ রোগের প্রকোপ হ্রাস করিবার শেষোক্তটি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যা পথ্য—কোন প্রকার মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য সেবন নিষেধ। গরম মসলা

ও মাংস অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শৈলাবাস আবশ্যক। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, ফার্লো লইয়া বিলাত যাত্রা প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকারের উদ্বেগ উত্তেজনার কারণ সর্বথা পরিহার একান্ত কর্তব্য।

মন্তব্য—এই পীড়া মারাত্মক না হইলেও অতিশয় সংক্রামক বটে। এই বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে পুত্র পৌত্রাদি পর্যন্ত রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহা একেবারে কখন আরোগ্য হইতে দেখা যায় নাই। ইহা হইতে নানা প্রকার জটিল রোগের উৎপত্তি হয়, অতএব রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্বে এই পীড়া কেবল শাসনকার্যে লিপ্ত ইংরাজগণের মধ্যে দেখা যাইত, এখন অনেক দেশীয় লোককেও বাবু ভীতি রোগগ্রস্ত দেখা যায়, যথা—সতীশ বাবু। বিচার ভিন্ন অন্য বিভাগেও ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। শিক্ষাবিভাগে সম্প্রতি ইহার বিকটমূর্ত্তি বর্ত্তমান ; যথা—নিয়োগ সম্বন্ধে নূতন সারকিউলার।

যাহাতে এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং ইহার অধিক বিস্তার ঘটিতে না পারে, তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি এখন হইতে কর্ত্তৃপক্ষ ইহার সংক্রামকতা নিবারণে সচেষ্ট না হয়েন, তবে অতীত বাবু, বর্তমান বাবু, ভবিষ্যৎ বাবু, ভ্রূণ বাবু, আদি বাবু ও অন্ত বাবু, বাবু-ভীতি বিকার গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভয়ানক মারী ভয় ও অনর্থ উপস্থিত করিবে। ইহার বিস্তার নিবারণ ও রোগ শান্তির জন্য একটি আশ্রম বা asylum, এবং এ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কারার্থ পুরস্কার ঘোষণা করা কর্ত্তব্য।

জনৈক "বাবু-ভীতি" চিকিৎসক

—ভারতী। কার্ত্তিক ১৩০১। পৃ ৪০৬-৪০৮।

কুটুম্বিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বরের স্বয়ং দৌত্য

হরিহরপুরের বিনোদবিহারী পালের স্ত্রীর এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামচরণ পাল তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিল "আপনার জ্যৈঠতুত ভাই গোপাল গোবিন্দ পালের এক অবিবাহিতা কন্যা আছে, মাসীমার ইচ্ছা তার সঙ্গে আপনি আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন, খরচ পত্র যা লাগে তা আমি আপনার হাতে দিতে প্রস্তুত আছি।"

বিনোদবিহারী পালের বাড়ীতে যখন রামচরণের আবির্ভাব হইল তখন বেলা আটটা, বিনোদবিহারী তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে কতকগুলি চাউল ছড়াইয়া দিয়া 'খোপ' নির্ম্মুক্ত পারাবত কুলের আহার গ্রহণ ও তাহাদের বিচিত্র বিচরণ নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং যখন সেই হর্ষোন্মত্ত পারাবতবর্গের কতকগুলি তাহাদের কণ্ঠনিস্থত বক্ বকম্; রূপ গুঞ্জরণে, কখন কাপড় শুকাইবার আড়ার উপর উঠিতেছিল, কখন খোপের চালে বসিতেছিল, আবার কখন বা উড়িয়া আসিয়া তাহাদের জন্য রক্ষিত জলাধারে চঞ্চু ডুবাইয়া জল পান পূর্ব্বক সহর্ষে ঝাঁকের সঙ্গে মিশিতেছিল, তখন বিনোদবিহারীর মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত কোন কবি বর্ণনা করেন নাই। হঠাৎ অসময়ে এক অচিন্তিত পূর্ব্ব শ্যালক পুত্রের আবির্ভাবে বিনোদবিহারী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পড়িল এবং মেরজায়ের পকেট হইতে একখানি জীর্ণ, সূত্রবদ্ধ, পৈত্রিক চসমা বাহির করিয়া চোখে দিয়া এই অভ্যাগত যুবকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল "তোমার নাম?"— রামচরণ বুঝিল পিসেমহাশয় চিনিতে পারিতেছেন না, সুতরাং বলিল "আমার নাম রামচরণ, আমার ঠাকুরের নাম ৺গৌরচরণ পাল। পিতা ঠাকুরের মৃত্যুর পর আগড়পাড়া ছেড়ে শিকারপুরের বাবুদের আশ্রয়ে বাস কচ্ছিলাম, ছেলেবেলা হতে এ জায়গা ছাড়া, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই—কাজেই চিন্‌তে পারছেন না।" যুবকের কথা শেষ না হইতেই বিনোদবিহারী বলিল "ওঃ বুঝেছি, তুমি আমাদের অন্নপূর্ণার ছেলে, এস বাবা ওই চৌকীখানার উপর ব'স; আমি ততক্ষণ কবিতরগুলোকে দানা দিয়ে নিই, তা শিকারপুরে কি করা হয়?

"শিকারপুরের বাঙ্গলা ইস্কুল হ'তে ছাত্রবৃত্তি পাশ ক'রে ওখানকার ডাক্তার আনন্দ বাবুর ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী করছি।"

বিনোদবিহারী বলিল, "বেশ, বেশ, তা ক'টি টাকা পাওয়া হয়?" "এখন মাসে আট দশ টাকা পাই, উন্নতিরও আশা আছে।"

বিনোদ। "বেশ, কিছু উপরি পাওনা আছে ত?"

রাম। "বড় বেশী নয়, তবে এক রকমে চলে যায়, আপনি ভিন্ন আমার আর অধিক আত্মীয় কে আছে, একবার শ্রীচরণ দর্শন কর্ত্তে এলাম।"

স্নেহমধুর স্বরে বিনোদবিহারী উত্তর করিল "তা আসবে বই কি বাবা, কতকাল তোমাকে দেখিনি, তুমি এত বড়টি হয়েছ দেখে বড় সন্তোষ হ'লাম।"

সেইদিন অপরাহ্ণে রামচরণ কথা-প্রসঙ্গে বিনোদবিহারীর নিকট তাহার হরিহরপুরে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়ে পার্লিয়ামেণ্ট

পরদিন কাজলার স্নানের ঘাটে মেয়েদের ভারি জটলা। একজন বর্ষীয়সী রমণী বিনোদবিহারীর স্ত্রী চিন্তামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁলা চিন্তে—কাল হতে তোদের বাড়ীতে একটি ছেলেকে দেখ্‌ছি, ওটি কে?"

"ও আমার এক মাস্‌তুতো বোনের বেটা, ছেলেটি ভাল, পান্নালালের যে বোন আছে তাকে বে করবে ব'লে এয়েচে।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "ছেলেটি থাকে কোথা?"

চিন্তামণি। "শিকারপুরে এক ডাক্তারের কাছে কাজ করে।"

আর একটি রমণীর কৌতূহল প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "ছেলেটির আর আছে কে?"

"এক মাসী, ওরা আছে ভাল, মাসে বেশ দশটাকা উপায় করে।"

তরঙ্গিনী মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "ছুঁড়ীর কপাল ভাল, দু তোলা খেয়ে পরে বাঁচবে, আমাদের যেমন কর্ত্তাটি, মনোরমার বিয়ের জন্যে সারা দেশ বছর ধ'রে পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন, মেয়ে লোক ঘরে ব'সে কাল মেয়ে পার কর্ত্তে পারে, আর উনি পুরুষ হ'য়ে একটা পাত্র জুটাতে হাপ্‌সে গেলেন, অমন পুরুষের মুখে আগুন।"

গোপালগোবিন্দ পালের স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী হরমণি নদীতে স্নান করিতেছিলেন,

বোনঝির গাত্রবর্ণের প্রতি কটাক্ষপাত দেখিয়া তিনি তরঙ্গিনীকে দশ কথা শুনাইয়া দিলেন, তরঙ্গিনীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন ; দেখিতে দেখিতে কুরুপাণ্ডবের মত দুইটা দল বাঁধিয়া উঠিল এবং স্নানের ঘাটে কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের সূত্রপাত হইল। দুই পক্ষ হইতে এমন বাক্যবানসকল বর্ষিত হইতে লাগিল, যাহার কাছে কুরু পাণ্ডবের ব্রহ্মাস্ত্রসমূহও হারি মানে।

ঝগড়ার মধ্যে একটি অল্পবয়স্ক যুবতী বলিলেন "ও বিয়ে কেমন ক'রে হবে? যে ছেলেটি এসেছে, গোবিন্দ পাল সম্পর্কে তার পিসে হয়, পিসের মেয়ে বোন, বোনকে কি বিয়ে করা যায়?"

ঘটকদের চারুশীলার বয়স দশ বৎসর, ভারি বুদ্ধিমতী, আর চোখে মুখে কথা, সে তার গোলাপফুলের গায়ে-জল ছিটাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল "বিনোদ পাল তার পিসে, গোবিন্দ পাল পিসের ভাই, তাতে কি বিয়ে আটকায়? কথায় বলে :—

"মামার শালা পিসের ভাই
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।"

ঝগড়া করিতে করিতে অনেকেই হাসিয়া উঠিল, যেন বরুণাস্ত্রে অগ্নিঅস্ত্র কাটিয়া ফেলিল, কিন্তু সে যুদ্ধ শীঘ্র থামিল না, আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। কিন্তু তরঙ্গিনী হরমণিকে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না ; তরঙ্গিনী আহত ফণিনীর মত গর্জ্জন করিতে লাগিল, অবশেষে ফুলিতে ফুলিতে উঠিয়া গৃহে চলিল, যাইবার সময় সকলকে শুনাইয়া বলিল "দেখবো কেমন ক'রে এ বিয়ে হয়!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুপিতা ভার্য্যা—শঙ্কটাপন্ন ভর্ত্তা

তরঙ্গিনী রাগে গরগর করিতে করিতে বাড়ী আসিয়া ঘরের মেঝের উপর ঘড়াটা 'ধুপ' করিয়া নামাইয়া রাখিল, ধাতুপাত্র না হইয়া মৃৎপাত্র হইলে ঘড়াটাকে সে আঘাতে আস্ত থাকিতে হইত না। তরঙ্গিনীর স্বামী গঙ্গারাম নন্দী তখন দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল ; নদী হইতে প্রত্যাগতা সদ্যোস্নাতা পত্নীর ভাব-বিপর্য্যয় দর্শনে তাহার মনে যথেষ্ট বিস্ময়ের সঞ্চার হইল, নিতান্ত অপরাধীর মত তাহার দিকে দুই-একবার চাহিয়া দেখিল বটে কিন্তু তাহার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ত চাহিতে সাহস হইল না, কারণ পত্নীর জিহ্বাকে যে 'পড়ুয়া'দিগের নিকট গুরুমহাশয়ের বেতের অপেক্ষা অধিক ভয় করিত, সে জানিত বেতও সময়ে সময়ে মারের চোটে ভাঙ্গিয়া অকর্মণ্য হইয়া

পড়ে, কিন্তু তাহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর শাণিত জিহ্বা অকর্মণ্য হইবার নহে ; অতএব সে অনন্যমনে তামাক টানিতে লাগিল এবং এক সিলিমের পর আর এক সিলিম পুড়াইয়া তাম্রকূট ধূম্রের সহিত তাহার হৃদয়োদ্গত কৌতূহলস্পৃহা পরিপাক করিয়া ফেলিল।

কিন্তু তাহাতেও অব্যাহতি নাই, আজ তাহার পত্নীর ক্রোধ রন্ধনাগারেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এই জন্যই উনানে ভাত ধরিয়া গেল, ডাইলে বিপর্যয় সারই হইল ও মাছের সঙ্গে লবণের কোন সম্পর্ক রহিল না ; গঙ্গারাম তাহাই অম্লানবদনে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে গলাধঃকরণপূর্বক ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল।

স্বামীর এইরূপ সহিষ্ণুতায় তরঙ্গিনীর ক্রোধ অধিককর বৃদ্ধি হইতেছিল, তাই আহারান্তে খড়ম পায়ে দিয়া কলিকাটি হাতে লইয়া গঙ্গারাম যখন রান্নাঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন কুপিতা কর্ত্রীঠাকুরাণী মহা গর্জ্জনে স্বামীরত্নকে আক্রমণ করিল, বলিল, যে দগ্ধললাট অল্পায়ুবিশিষ্ট পুরুষাধম—অবিবাহিতা ববস্থা কন্যা গৃহে রাখিয়া নির্ভাবনায় আহার নিদ্রায় কুণ্ঠিত হয় না এবং পাত্র অন্বেষণে অকৃতকার্য্য হয় তাহার জীবনে ধিক্, কলিকাতে অগ্নির সঞ্চার না হইয়া তাহার মুখে হওয়াই উচিত এবং তাহার পৃষ্ঠের সহিত অন্য পদার্থ অপেক্ষা সম্মার্জ্জনার সম্বন্ধ স্থাপন করাই যোগ্যতর ব্যবস্থা।

স্ত্রী স্বামীর প্রতি এইরূপ বহুবিধ শিষ্টাচার প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, অতএব এ ক্ষেত্রে নীরব থাকাই শ্রেয়। সে আরও বুঝিতে পারিল আজ নদীতে স্নান করিতে গিয়া তাহার স্ত্রী বিশেষরূপে অপদস্থ হইয়াছে, ইহার প্রতিকার করা উচিত ; অতএব আগন্তুক রামচরণ পালের সহিত গোপালগোবিন্দ পালের কন্যার উপস্থিত বিবাহ যাহাতে না হইতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।

কর্ত্তাটি তখন কলিকার তামাকুটুকু নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া তাহার মাতুল কানাই বিশ্বাসের সহিত কিংকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ আঁটিবার জন্য মাতুলালয়ে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র

গঙ্গারাম নন্দীর মাতুল কানাই বিশ্বাসের বাড়ী কাঁসারী পাড়ায়। সংসারে কানাই বিশ্বাসের সম্পত্তির মধ্যে একখানা চৌরি ঘর, ভগ্নপ্রায় বড় রন্ধনশালা, বাড়ীতে একটি কুলগাছ একটা লাঙ্গলা এঁড়ে এবং এক গুণধর খোঁড়া পুত্র। পত্নীটি বহুদিন গত হইয়াছে,, সম্প্রতি একটি পুত্রবধূ গৃহে আনিবার জন্য সে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছিল

এবং এজন্য সমাজের চাঁই কৃষ্ণচরণ নন্দীকে যথেষ্ট অনুরোধ উপরোধও করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, কারণ স্বসমাজে নন্দীবৃদ্ধের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সত্বেও কেহ খোঁড়া জামাই গ্রহণের উচ্চাভিলাষ প্রকাশ করে নাই, সুতরাং কানাই বিশ্বাস আপাততঃ পুত্রের বিবাহ স্থগিত রাখিয়া কাঁসারীপাড়ার হরিসংকীর্ত্তনের দলে গান বাঁধিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

গঙ্গারাম নন্দী মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়া সেখানে মাতুলের সন্ধান পাইল না, অতএব মাতুলের আড্ডা নফর কাঁসারীর বাসনের দোকানে চলিল, দেখিল, তাহার মাতুল তখন অতি উৎসাহের সঙ্গে "পঞ্চাশ কাবার" করিতেছে ; গঙ্গারাম গম্ভীর মুখে বলিল "মামা শোন তো একটা কথা "মামা তখন তাস ক্রীড়ার উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান, বলিল, "কি, এখানেই বল·" "না, না, গোপনে কথা আছে" বলিয়া উপযুক্ত ভাগিনেয় মাতুলের হস্ত হইতে ডাবা হুঁকা টানিয়া লইয়া একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া তামাক টানিতে লাগিল, মাতুল বলিল "একটু ব'স তিনখান কাগজ হয়েছে, পঞ্জাটা ধ'রে যাই।"

গঙ্গারাম প্রায় একঘণ্টা বসিয়া থাকিল। কতবার তাস ধরা হইল, কতবার উঠিয়া গেল, অবশেষে এক বোম্ এবং সুবিশাল টাকের উপর দুইটি অত্যুগ্র চাটি খাইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে কানাই বিশ্বাস উঠিয়া গেল, সে আজ 'বোম্' হারিয়াছে শুনিয়া তিন চারিটি ছেলে বোম্ বোম্ শব্দে চিৎকার পূর্ব্বক হাত তালি দিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

কানাই গৃহে আসিয়া ভাগিনেয়ের সঙ্গে মাদুরের উপর বসিল, অনন্তর উভয়ের কথা আরম্ভ হইল।

পরামর্শশেষে কানাই বলিল "রাত্রে কৃষ্ণচরণ নন্দীর সঙ্গে পরামর্শ এঁটে কাল এক বৈঠক বসাতে হবে, সেই বৈঠকে ব'সে রামচরণ পালের কাছে ভোজ ফলারের বাবদ দেড়শ টাকা দাবী করা যাবে, এত টাকা দেওয়া আর তার কর্ম্ম নয়, কাজেই বিয়ে হওয়াও কঠিন হবে ; সকলে এককাট্টা হলে বিয়ে বন্ধ কর্ত্তে কতক্ষণ লাগে ?"

গঙ্গারাম উত্তর করিল "তা বটে কিন্তু কৃষ্ণচরণ দা যদি এত টাকা দাবী কর্ত্তে না চান তখন উপায় ? আমার বিবেচনায় আগে কতকগুলো লোককে হাত ক'রে তারপর নন্দী দাকে একথা বলা, আমরা বৈঠকের আগে অনেকে যদি বলি দেড়'শ টাকার কম কিছুতে ভোজ ফলার হবে না, তাহলে তিনি আর সে কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারবেন না।"

ইহাই সৎযুক্তি বলিয়া কানাই বিশ্বাস তাহাতে সায় দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈঠক

পরদিন বৈকালে পরাণ মল্লিকের চণ্ডীমণ্ডপে সমারোহে বৈঠক বসিল। বৈঠকের অধিকাংশ মেম্বারই বলিল "আমরা ভোজ ফলারে জন্য দেড়শ টাকা চাই, যদি দু পাঁচটাকা বাঁচে ত বারয়ারী পূজার জন্যে রেখে দিলেই চল্‌বে।"

আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত কৃষ্ণচরণ নন্দী বলিলেন "তোমরা ত দেড়শ টাকা দেড়শ টাকা ক'রে ক্ষেপেছ, কিন্তু যে টাকা খরচ করবে সে কোথা? যদি সে বলে অত টাকা দিবার ক্ষমতা নেই তা হ'লে তোমরা কি করবে?"

অনেকে এ কথার জবাব দিতে পারিল না. গঙ্গারাম বলিল "তা হলে কি রকম ক'রে বিয়ে হবে? ওর কোন পুরুষে কুটুম্বিতার জন্যে একটি পয়সাও খরচ করে নি, আর আজ কিনা ঝাঁ ক'রে এসে বলা নাই কহা নেই, খামকা একটা মেয়ে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে?"

দোকড়ি সরকার বলিল "কক্ষণ না, সহজে কি কাজ আদায় হয়, ও ছোকরার মাসীর অনেক টাকা আছে একটু প্যাঁচ দিলেই ভোজ ফলার পাওয়া যাবে।"

তখন কৃষ্ণচরণ বলিলেন "ওহে শঙ্কর পরামাণিক, ডাকত ও পাড়ার বিনোদ পালের বাড়ী যে ছোকরা এসেছে তাকে, তার নামটা কি ভাল ভুলে যাচ্ছি—"

নফর সিকদার বলিল "রামচরণ পাল।"

"হ্যাঁ রামচরণই বটে, রামচরণকে ডেকে আনতো।"

শঙ্কর পরামাণিক রামচরণকে ডাকিতে চলিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে রামচরণ বৈঠকে আসিয়া হাজির হইল। এতগুলি বিভিন্ন মূর্ত্তি কুটুম্ব সন্তানকে একত্র দেখিয়া বেচারা কিছু ভীতি, কতকটা অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চাঁই কৃষ্ণচরণ তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে বাবাজীর কি বিবাহের অভিপ্রায়ে এখানে আসা হয়েছে? রামচরণ সম্মতিলক্ষণজ্ঞাপক মৌনাবলম্বন করিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া থাকিল।" নন্দীবৃদ্ধ উত্তরের জন্য আর পীড়াপীড়ি না করিয়া বলিলেন, "তা বেশ তো, এখন বয়স হয়েছে, গৃহ ধর্ম্ম করাই ত উচিত, তা বাপু সঙ্গে টাকা আছে কতটি? আমাদের কাছে কিছু গোপন করবার আবশ্যক নেই, আমরা সকলেই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, বিয়েটা যাতে সুসম্পন্ন হ'য়ে যায় তার জন্যে আমাদের সকলেরই চেষ্টা।"

রামচরণ কিন্তু বিপদে পড়িল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "টাকা বেশী নেই, তবে আপনাদের কি আদেশ বলুন, দশ ঠাকুরের আদেশ আমি শিরোধার্য্য ক'রে নেব।"

একটু কাশিয়া চাঁই মহাশয় বলিলেন "তুমি বিদেশ হতে এসেছ, একটি গরীবের মেয়েকে বিবাহ করে যে এক অনাথাকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার করবে এ পুণ্যের কথা, কিন্তু বাপু, তোমার ভাবী শাশুড়ী যে বিবাহরাত্রে কুটুম্ব স্বজনকে দুটি খেতে দেন সে ক্ষমতা তাঁর নেই, তোমাকেই এ কার্য্যের ভার নিতে হবে। আর তুমি বিদেশ হ'তে এসেছ, কুটুম্বদের আহ্বান অভ্যর্থনা যাতে একটু ভাল রকম হয় তাও কর্ত্তে হবে।"

রামচরণ। "আজ্ঞে আমি আমার সাধ্যানুসারে বিবাহরাত্রে আহারাদির আয়োজন করবো।"

কৃষ্ণচরণ বলিলেন, "তাই তো বাপু আমি বলছিলাম তোমার সাধ্যটা কি রকম শুনি?"

রামচরণও বড চতুর, "আপনারাই আদেশ করুন আমার কি করা দরকার।"

"দরকার?"—বলিয়া চাঁই মহাশয় একবার বৈঠকস্থ মেম্বরদিগের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন "তোমাকে একটি ভোজ ও একটি পাকা ফলার দিতে হবে।"

রামচরণ বলিল "কি পরিমাণ খরচ পড়িবার সম্ভব?

কৃষ্ণচরণ উত্তর করিলেন "ভোজের খরচ আর বেশী কি? বিশ পঁচিশ টাকা হলেই হবে তবে ফলারের খরচই যা কিছু বেশী--ধর ত হে বিশ্বাসের পো—একটা ফর্দ্দ" তখন ফর্দ্দ ধরা হইল। পাকী দে৬মণ ময়দা, তদনুযায়ী ঘৃত, পাঁচ রকম সন্দেশ, ক্ষীর, শুকোদই ইত্যাদি। সর্বসমেত পচানব্বুই টাকা কয়েক আনা হইল। কৃষ্ণচরণ তাঁহার তর্জ্জনী আঙ্গুলটা দেখাইয়া রামচরণকে বলিলেন "ফলারে তোমার এই (অর্থাৎ এক শত টাকা), পড়বে। ভোজ ফলার বাদ দিয়ে বিয়েতেও পঁচিশ ত্রিশ টাকা ধর, অবশিষ্ট গহনাপত্র বাদ; ঢুলি বাদ্যকরও হয়ে উঠবে না, আর তাতেই বা দরকার কি? হাড়ী মুচির পেট ভরান বৈত না, সে সব বাহুল্যে দরকার কি? যাহোক মোটের উপর দেড়শ টাকার কমে হচ্ছে না—এই পরিমাণ টাকার জোগাড় আছে ত?"

রামচরণ কখনই ভাবে নাই তাহার ঘাড়ে এ রকম একটা লম্বা ফর্দ্দ আসিয়া পড়িবে, সে গরীব মানুষ, সাতআট টাকা মাহিনাতে কম্পাউণ্ডারী করে, দেড়শ দুইশ টাকা কোথা পাইবে? সুতরাং কাতরভাবে বলিল "আজ্ঞে তা হ'লে বিয়ে করা আমার অদৃষ্টে নেই।"

মুখপোড়া গণেশ বলিল "তবে তুমি কত হ'লে পার?" রামচরণ বলিল "যখন

দেড়শ টাকার কমে হবে না বল্লেন, তখন আর তা শুনে দরকার কি? আপনারা আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বটে! কাজ নেই আমার বিয়েতে।"

রামচরণ আর সে বৈঠকে তিলমাত্র অপেক্ষা করিল না। দুই চারি কথার পর বৈঠক ভাঙ্গিয়া, গেল। ভাঙ্গা বৈঠকে গঙ্গারাম বলিল, "দেড়শ টাকা খরচ কর্ত্তে পারে না, বিয়ে কর্ত্তে এসেছে, সুবিধেমত ভোজ ফলার না দিয়ে বিদেশে লোক আমাদের গাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করে যাবে! এত বড় যুগ্যতা?"

কালাচাঁদ ভড়, বাঁশিরাম গুঁই, নদেরচাঁদ সেনা ও দুর্গতি হালদার এক সঙ্গে কলরব করিয়া উঠিল "তোমরা যে রকম চাপ দিলে, সব কিন্তু ফস্‌কে গেল, কাজটা ভালো হলো না।"

কানাই বিশ্বাস বলিল "ওর কমে কি রাজী হওয়া যায়? বাজারটা ত একেবারে মাটী করা ভাল নয়। নেমন্তন্নের বাজার আজকাল মন্দা বটে কিন্তু নিজের জেদ্ বজায় রাখাও দরকার, আমরা যদি কিছুতে বিয়ে না দিই তা হলে দেখ্‌বে ঘুরে ফিরে ঐ দেড়শ টাকাই দেবে, সরকার মশায় ত বল্লেনই যে, ওর মাসীর অনেক টাকা আছে, আরে দাদা, আজকালের দিনে সহজে কি কেউ গাঁটের কড়ি খসাতে চায়?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুহৃদের উপদেশ

বিনোদবিহারী পাল একটু কাজে ভিন্নগ্রামে গিয়াছিল, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রামচরণ শয্যাহীন চৌকীর উপর শুইয়া আছে, গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন! কাপড় না ছাড়িয়াই রামচরণকে জিজ্ঞাসা করিল "আজ বৈকালে না কি কুটুম্বিতা বৈঠক করেছিল, কি খবর কিছু জান?"

রামচরণ পিসে মহাশয়ের নিকট সকল কথা সবিস্তারে বিবৃত করিল, পরে বলিল, "পিসে মশায়, আপনি ত আমার অবস্থা জানেন, আমি কি দেড়শ টাকা দিতে পারি? কোথা পাব এত টাকা, বড জোর সত্তর পঁচাত্তর টাকা পর্য্যন্ত আমি খরচ কর্ত্তে পারি?" বুঝলাম এখানে বিবাহ হওয়া অসম্ভব।

বিনোদবিহারী দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "তাইত গো, গরীবের উপর সকলেই অত্যাচার করতে চায়, সকল কুটুম্ব যদি একজোট হয়, তবে ত দেখ্‌ছি উপায় নেই. আমি গরীব মানুষ; জনবলও নেই, যদিও আমার জ্যেঠতুতো ভায়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে বটে, কিন্তু কুটুম্বদের যোগ ছাড়া ত একাজ হ'তে পারে না।"

রামচরণ বিষণ্ণ ভাবে বলিল, "তবে আর কি হবে? আপনার উপর নির্ভর করেই আমার এখানে আসা, আমি এখানে আর কাকেও জানি নে, আপনি যদি কোন উপায় কর্ত্তে না পারেন ত আমাকে শুধু শুধু ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা এ গাঁয়ে কি এমন একজনও লোক নেই, যিনি গরীবের দিকে হ'য়ে এই সকল পেটুক কুটুম্বদের সঙ্গে লড়েন?"

"কৈ এমন লোক ত দেখছি নে, তবে ওপাড়ার দে মশায়রা আছেন, তাঁদের ছোটবাবু বড অমায়িক লোক। এঁরা সকলেই বেশ লেখাপড়া জানেন, আর চাই কৃষ্ণচরণের কোন ধার ধারেন না, পাঁচজন কুটুম্বও তাঁদের হাত ধরা আছে, যদি ছোট দে মশায় একটু চেষ্টা করেন তবে কৃষ্ণচরণ নন্দীর দল কিছু করে উঠতে পারবে না, কিন্তু তাঁরা এ কাজে যে হাত দেবেন এমন বোধ হয় না।"

রামচরণ। "আচ্ছা একবার তাঁদের ধ'রেই দেখি না, গরীবের উপর কি আর তাঁদের দয়া হবে না—বিশেষ যখন একদল লোক একযোগ হয়ে আমাকে এমন বিব্রত করবার চেষ্টা করছে।"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদবিহারী বলিল "তাহ'লে কাল সকালে আমরা ক'জন একত্র হয়ে তাঁদের গিয়ে ধরবো, আজ ত রাত হয়ে গিয়েছে।"

পরদিন সকালে বিনোদবিহারী, রামচরণ, রামচরণের ভাবী শ্যালক পান্নালাল, বিনোদের ভাগ্‌নে জামাই বিপিন নন্দী, পান্নালালের বড ভগিনীপতি বৃন্দাবন প্রামাণিক সকলে দে মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সুকুমার দে ওরফে ছোটবাবু তাঁহাদের দক্ষিণদ্বারী চণ্ডীমণ্ডপে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, কয়েকজন কুটুম্বকে হঠাৎ একত্র আসিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, কাগজ বন্ধ করিয়া সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক বসিতে বলিয়া দুঃখীরামকে তামাক দিতে আদেশ করিলেন।

বিনোদবিহারী রামচরণের পরিচয় দিয়া সংক্ষেপে সকল কথা জ্ঞাপন করিল। কুটুম্বদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া সুকুমারবাবু বড়ই বিরক্ত ও ব্যথিত হইলেন, বলিলেন "তোমরা যে টাকা খরচ করতে পার তার মধ্যেই যাতে বিয়ে হয়ে যায় তার চেষ্টা করা যাবে; আগামী ৫ই আষাঢ় বিয়ের দিন আছে, ঐ দিনেই তোমরা বিয়ে দেওয়া ঠিক কর, আমরা যে কয় ঘর এক পরামর্শে আছি, একত্র হয়ে বিয়ে দেব, কে আট্‌কায় দেখা যাবে। ২রা তারিখে লগ্নপত্র হোক, সেদিন ও বিয়ের দিন যেন কুটুম্বদের যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হয়। কুটুম্ব সংখ্যা ত বেশী নয়, বড় জোর ৬০।৭০ জন হবে, এক মণ ময়দা ভাজলেই চলবে, লুচি সন্দেশের লোভ কেউ সামলাতে

পারবে না ; সকলে আসে ভাল, না আসে খোসামোদ আবশ্যক নাই, তারা বাদ থাকবে।”

এই সহজ কথা শুনিয়া সকলে হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল, বুঝিল কৃষ্ণচরণ নন্দীর দল আর বিবাহে বাধা দিতে পারিবে না। সুকুমারবাবু ইতিমধ্যে কলিকাতায় যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন, বিবাহটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকাই স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লগ্নপত্র

সেইদিন বৈকালে কুটুম্বগণ সভয়ে শুনিতে পাইল যে, দে মহাশয়েরা রামচরণকে অভয় দিয়াছেন, যাহাতে এ বিবাহ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয়, সে জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিবেন ; অতএব কি করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্য গঙ্গারাম নন্দী, কানাই বিশ্বাস প্রমুখ কুটুম্ববর্গ কৃষ্ণচরণ নন্দীর নিকট উপস্থিত হইল। কৃষ্ণচরণ সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন, গঙ্গারামকে বলিলেন “তোমরা সকলে শুন্‌লে না, এতটাকা চাপ দেওয়া ভাল হয় নি, আর যাই হোক লোকটা যে আমাদের হাত ছাড়া হ’লো এ বড আক্ষেপের বিষয়। সমাজের যা কিছু কাজ তা এত কাল ধ’রে আমি ক’রে এলাম, এখন যদি অন্যের হাত দিয়ে সেই কাজ হয় ত কুটুম্ব সমাজে আমার মুখ দেখানই ভার হবে।”

দোকড়ি সরকার হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিল “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, নন্দী মশাই যা বলেছেন, তার আর মিথ্যে কি ? মহৎকে যদি খাট হতে হয় তাহলে মনে যে কষ্ট হয় সে বিষয়ে আজ ক’দিন হ’ল আমি একটা পয়ার লিখেছি।”

মুখপোড়া গণেশ চটিয়া উঠিল, বলিল “আমরা সব এলাম এক কাজে, আপনি কোথা হতে পয়ারের কথা পাড়তে বসালেন, ঐ জন্যেই ত কারো সঙ্গে আপনার বনে না, পয়ার লিখে থাকেন ঘরে দুয়োর দিয়ে নিজের বাড়ীতেই পড়বেন, এখন যে জন্যে আসা গিয়েছে তা হোক।”

তাড়া খাইয়া সরকারের মুখ বন্ধ হইল। কৃষ্ণচরণ জিজ্ঞাসা কল্লেন “লগ্ন পত্রের দিনও কি ওরা স্থির করেছে ?”

কানাই বলিল “শুনচি কালই নগন ধরা।”

কৃষ্ণচরণ উত্তর করিলেন “তাহলে এখন চুপচাপ করে থাক, যা হবার তাও হয়ে গিয়েছে, কাল ওরা কি করে, তা দেখে তারপর অন্য কথা।”

লগ্নপত্রের দিন সকলকেই অধিষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করা হইল। তখন কানাই বিশ্বাস, গঙ্গারাম, মুখপোড়া গণেশ, কালাচাঁদ ভড় প্রভৃতি পাঁচ সাত জন কুটুম্ব কৃষ্ণচরণকে বলিল "যে রকম আয়োজন দেখা যাচ্ছে তাতে ওরা বিয়ে দেবেই, আমাদের সাধ্য নেই তাতে বাধা দিই, কিন্তু আপনি যদি আজ লগ্নপত্রের আসরে হাজির হন, তাহলে ওদের আস্পর্দ্ধা আরও বেড়ে যাবে, আমাদের একটুও মান থাকবে না, তা হলে আমরা একেবারেই মারা যাব। আমরা যে কাজ কল্লাম না, দে-রা সেই কাজ করে যে বাহাদুরী নেবে তা কখনই সবে না।"

চাঁই মহাশয় মুখখানি অসম্ভব গম্ভীর করিয়া উত্তর দিলেন "বাপু সকল, তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আমি কি তোমাদের ত্যাগ ক'রে যেতে পারি? তবে কিনা ওদের ভাবগতিকটা ভাল করে বুঝতে হচ্ছে; তোমরা ত জান দে-রা প্রকাশ্যে আমাকে অসম্মান দেখাতে সাহস করে না, আজ যদি আমি না যাই, তাদেরও ত লোকবল আছে, ধাঁ করে যদি তারা কাজটি সেরে ফেলে তাহলে তোমাদের ফলার ত মারা যাবেই, আমার চাঁইগিরিও খর্ব্ব হয়ে আসবে। আমাকে বাপু যেতে হচ্ছে, তোমাদের যার যার আপত্তি থাকে গৌরাঙ্গ হালদারের দোকানে বসে থাক। আমি তেমন দরকার বুঝি ত তোমাদের খবর দেব, তখন যেয়ো।"

নিকুঞ্জ চৌধুরী বলিল, দে-দের কি এতই সাহস যে আমাদের বাদ দিয়েই কাজ সেরে ফেলবে, তাহলে আমাদেরও কি হাত নেই?"

কৃষ্ণচরণ বলিলেন "কি করবে?"

গঙ্গারাম সদর্পে উত্তর করিল "কেন, ওরা এমনি কি বড় যে আমরা ওদের কিছু কর্ত্তে পারিনে, সমাজের কাছে কারো পাকামী খাটে না, আমরা কি সকলে মিলে ওদের একঘরে কর্ত্তে পারিনে?"

কৃষ্ণচরণ বলিলেন "বেশী বাজে কথা বোল না, তোমাদের ভারি ক্ষমতা, সেবার ত ভিন্ন মেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্যে ওদের একঘরে কর্ত্তে গিয়েছিলে, কিছু কর্ত্তে পেরেছিলে কি? তোমাদের হয়ে নড়তে গিয়ে মধ্য হ'তে আমাকেই অপ্রতিভ হ'তে হয়েছিল। আমি যা বল্লাম সেই রকম করগে যাও।"

সন্ধ্যাকালে গোপালগোবিন্দ পালের গৃহ-প্রাঙ্গণে লগ্নপত্রের আসর বসিয়াছে; পাত্রপক্ষ হইতে দই, মাছ, বাতাসা, পান, সন্দেশ আসিয়াছে। সতরঞ্চির উপর কুটুম্বের দল সার দিয়া বসিয়া চুপে চুপে আলাপ করিতেছে, সকলেরই ইচ্ছা ফলারটা খুব ভাল হয়, সুতরাং অনেকেই গোল পাকাইবার চেষ্টায় আছে; এমন সময় সভাস্থলে সুকুমার দে কয়েকজন স্বপক্ষীয় কুটুম্বের সহিত উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কুটুম্বগণ

আরো গোপনে পরামর্শ আঁটিতে লাগিল, কেহ বলিতেছে বাজারে যে রকম কথা তা বলনা কেন?" আর একজন উত্তর করিল "আরে, তুমিই না হয় আগে কথাটা পাড়লে?" কিন্তু কেহই কথা পাড়িল না, গুণ গুণ শব্দে কানে কানে কথা চলিতে লাগিল।"

দে মহাশয়দের পক্ষে যাহারা, তাহারা একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—তাহাদের মুখে একটা কৃতনিশ্চয়তার ভাব পরিস্ফুট, তাহারা স্থির করিয়াছে যতই গোলযোগ হউক, এ বিবাহ বাদ থাকিবে না।

চাঁই কৃষ্ণচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "এই যে বিবাহ উপস্থিত, এতে বোধ করি আপনাদের কারো আপত্তি নেই।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কথা কহে না। অবশেষে দোকড়ি সরকার তাঁহার সাদা লম্বা দাড়ী বাম হস্তে দুই চারিবার আলোড়ন পূর্বক অতি গম্ভীর স্বরে বলিল [বলিলেন] "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" এই নীরস, গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি অনেকের কর্ণে পেচকের কঠোর আর্ত্তনাদের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সকলেই বুঝিল সরকারজীর কিছু বক্তব্য আছে, সকলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

দোকড়ি বলিল "রামচরণ কখনও কুটুম্বিতা করে নাই, এই বিবাহে তাকে ভোজ ও ফলার এ দুইই দিতে হবে।"

সুকুমারবাবু বলিলেন "আর সে যদি অক্ষম হয়? তবে কি তার বিয়ে বন্ধ থাকবে? মশায় আপনি শুনেছি অতি ধার্ম্মিক, 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক আপনি কথায় কথায় আউড়ে থাকেন বাঙ্গলা পয়ারে তার নাকি তর্জ্জমাও করেছেন, আপনি একটু সাবধান হয়ে কথা বলবেন, আজ বাদে কাল আপনার ছেলের বিয়ে দেবেন তখন ভোজ ফলার দিতে রাজী আছেন ত?"

দোকড়ি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর করিল "আমার কি সেই রকম অবস্থা? আয় বুঝে ব্যয় করার ত একটা নিয়ম আছে?"

বিদ্রূপের সুরে সুকুমারবাবু বলিলেন "তা আছে বই কি—তাতেই ত আজ আমাকে গরীবের পক্ষ হতে এত কথা বলতে হচ্ছে; রামচরণকে হঠাৎ আপনারা এত পয়সাওলা ঠাওরালেন কি করে?"

দোকড়ি—"শুনেছি তার মাসীর অনেক টাকা আছে।"

সুকুমার—"যদি থাকেই তাতে তার কি, তার পৈত্রিক সম্পত্তি কিছু আছে কি? আর তার মাসীর যে টাকা আছে তা কি আপনি চক্ষে দেখেছেন? আমিত শুনেছি কিছু নেই; বিয়ে করবার জন্য রামচরণ গুটিকত টাকা যোগাড় করে এনেছে। এ

রকম অবস্থায় দয়া করে তার কাছ হতে ভোজ ফলার না নিয়ে বিয়ে দেওয়াতে কি আপনাদের কোন অপমান আছে—না তাতে আরও মহত্ত্ব বাড়ে ? সে গরীব, অসহায় পিতৃমাতৃহীন আপনাদের কাছে এসে পড়েছে, কোথায় আপনারা তার সাহায্য করবেন, না হঠাৎ আজ আপনাদের ক্ষুধা অসম্ভব বৃদ্ধি হয়ে উঠলো, তাকে দেড়শো টাকার এক লম্বা ফর্দ্দ দিলেন।"

কৃষ্ণচরণ মনে করিলেন কথাটা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, কারণ টাকার কথা তিনিই বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি অনুসারেই ফর্দ্দ ধরা হয়। সুতরাং নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য বলিলেন "রামচরণই ত নিজে ভোজ ফলার দিতে সম্মত ছিল।"

সুকুমার—"ভোজ ফলার দিতে ঠিক সম্মত ছিল না, তবে আপনাদের খাওয়ান বাবদ সাধ্যমতে খরচ কর্ত্তে তার আপত্তি নেই।"

কৃষ্ণচরণ বলিলেন, "তবে সেই ভাল, কেন আর গরীবকে কষ্ট দেওয়া ? কিন্তু আর কারো কোন আপত্তি নেই ত ? গঙ্গারাম, কানাই, এরা সব কোথা ?"

গঙ্গারাম সভার একপ্রান্ত হইতে বলিল "আজ্ঞে আমি এসেছি : মামা এলেন না : তিনি চতুর্ভুজের দোকানে ব'সে আছেন।"

"না আসবার কারণ ?"—যেন কিছুই জানেন না এই স্বরে কৃষ্ণচরণ কথাটা জিজ্ঞাসা করিলেন।

গঙ্গারাম উত্তর করিল, "তিনি গোপালগোবিন্দ পালের মামাশ্বশুর হন, কন্যাপক্ষ হ'তে তাঁকে এ বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আমিও এখানে বেশীক্ষণ থাকছিনে, রামচরণ সম্পর্কে আমার ভাইপো, আমার কাছে একটা পরামর্শও জিজ্ঞাসা কল্লে না! আমরা কেউ এ বিবাহে উপস্থিত থাকবো না, কথাটা আগে জানান ভাল বলেই এসেছিলাম।"

কৃষ্ণচরণ নন্দী বলিলেন "ডাক তোমার মামাকে, তারপর তোমাদের একথার বিচার হবে।"

গঙ্গারাম মাতুলের সন্ধানে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ যায় কিন্তু মামা ভাগিনেয়ের কেহই ফিরিয়া আসে না দেখিয়া সমবেত কুটুম্ববর্গ ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল, শেষে অসহিষ্ণু হইয়া বলিল "আর আমরা ব'সে থাকতে পারি নে, ঠিক সময়ে যে আসবে না তার জন্যে কে দায়ী হবে ? শীঘ্র কাজ শেষ করা হোক।"

কৃষ্ণচরণ নন্দী সকলকে আর একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন, কিন্তু পুরোহিত ঠাকুরকে শান্ত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল ; তিনি মস্তকে চাদরের এক প্রকাণ্ড পাক বাঁধিয়া "মাথায় পাগড়ী ও'র মত বেশে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন,

আর লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে বাতাসার ধামার দিকে এক একবার লোলুপ দৃষ্টি-ক্ষেপণ করিতেছিলেন, অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হওয়াতে অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন "এক উটবট্টি বিয়ে হাতে নিয়ে এমন ঝকমারিতে ত কখন পড়িনি, রাত্রি দুপুর হয়ে গেল, এদের ঘোসাই মেটে না. এমন কাণ্ড হবে জান্‌লে কক্ষণ এ কাজ হাতে নিতাম না, এই আযাঢ়ের হিমে ব'সে থেকে মারা পড়বো দেখছি। আবার এরপর অসময় পড়বে, তখন শুভ কাজ করা কি ভাল হবে ?"

অসময়ের কথা শুনিয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল না. তাড়াতাড়ি লগ্ন পত্রের কাজ শেষ করা হইল, নাপিত কনেকে কোলে লইয়া জলের ধারা দিয়া ঘরে তুলিল, মেয়েরা মহানন্দে হুলুধ্বনি করিতে লাগিল। জলযোগ শেষ করিয়া কুটুম্বেরা বাড়ী ফিরিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

বিবাহের দিন সকালে কুটুম্বদের আর এক বৈঠক বসিল। কানাই বিশ্বাস ও গঙ্গারামের উদ্যোগেই এ বৈঠক. এই বৈঠক দে মহাশয়দের পক্ষের লোকও দুই একজন উপস্থিত ছিল। গঙ্গারাম প্রস্তাব করিল—"রামচরণ আমার ভাইপো হয় আর সে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস কল্লে না, লগ্নপত্রের দিন রাত্রে আমাদের অপেক্ষা না ক'রেই কাজ শেষ করা হ'লো এটা কি আমাদের অপমান করা নয় ? তারপর পরদিন পাড়ার সকলকে দৈ সন্দেশ বিলানো হ'লো, আমি বাদ যাই কেন ?"

শ্যামাপদ মজুমদার উত্তর করিল "আপনার বাড়ীতে দই সন্দেশ নিয়ে দুবার লোক গিয়েছে, আপনার সদর দরজা বন্ধ থাকলে আর উপায় কি ?"

গঙ্গারাম গর্জ্জন করিয়া বলিল "আমি সমস্ত দিন বাড়ী ছিলাম, আমার বাড়ীতে যে পাঠান হয়েছে তার সাক্ষী কোথা ?"

শ্যামাপদ বলিল "তা হ'লে বল্‌তে হবে আপনি দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে বসেছিলেন। দেনা পাওনা প্রভৃতি কাজেই লোকে সাক্ষী রেখে করে, দৈ সন্দেশ বিলোবার সময় কেউ সাক্ষী রাখা দরকার মনে করে না। আপনি ত ক্রমাগতই বল্‌ছেন আপনার ভাইপোর বিয়ে, কিন্তু পাক জুড়বার সর্দ্দারই আপনি, বড় শুভাকাঙ্ক্ষী খুড়োতো ? আপনি যে রামের খুড়ো তা আপনার ব্যবহার দেখে কার সত্য বলে মনে হবে ?—ভাইপোর বিয়েতে কোন খুড়ো এমন পাক জুড়ে যাকে ?—সে যদি আপনার ভাইপো হয় তবে তার সঙ্গে

সেই রকম ব্যবহার করুন, সে বিদেশ হতে এসেছে তাকে জান্‌তে দেন যে আপনি তার খুড়ো, তা না আপনি শুধু তার 'মুখালিব' কচ্ছেন। এই কি উচিত?"

কানাই বিশ্বাস বলিল "লগ্নপত্রের দিন আমার জন্যে একটু অপেক্ষাও করা হলো না, আমার অপরাধ?"

শ্যামাপদ উত্তর করিল "সকলেই সেখানে সময় মত উপস্থিত হলো, আর আপনি গেলেন না, না যাওয়ার অর্থ কি? কেন সকলে আপনার জন্যে রাত্রি তিন প্রহর পর্য্যন্ত ব'সে থাকবে?"

কানাই মাথা নাড়িয়া বলিল "আমি যে যাইনি তার একটু মানে আছে, আমার ভাগ্নীর মেয়ের বিয়ে, অথচ সে আমাকে ডেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কলে না, এটা কি ভাল কাজ হয়েছে? আমাকে কি অন্তরঙ্গ ভেবে আলাদা নিমন্ত্রণ করেছিল? না কল্লে কেন যাব?"

"কে আপনার ভাগিনী—গোপালগোবিন্দ পালের স্ত্রী? তাতো এই প্রথম আপনার মুখে শুনছি, যেদিন তার ছোট ছেলেটি মারা গেল, সেদিন সৎকারের জন্যে সমস্ত গাঁ খুঁজে আমরা একটা লোক মেলাতে পারলাম না, আপনার কি মনে নেই আপনার কাছে গিয়ে আপনাকে কত অনুনয় বিনয় করা হয়েছিল, কিন্তু আপনি কি আপনার ভাগিনী ব'লে সে সময় একটু দয়া করেছিলেন? সৎকার কথা দূরে থাক একবার এসে নিরাশ্রয় বিধবার কাছে দাঁড়িয়ে দুটো সান্ত্বনার কথা ব'লেছিলেন? তারপর যখন পালালাল জ্বর-বিকারে মারা যাবার দাখিল হয়েছিল তখন একদিনও কি খোঁজ নিয়েছিলেন যে সে কেমন আছে? আজ ত বড় কুটুম্বিতা ফলাচ্ছেন! আপনার যে ব্যবহার তাতে আপনার সঙ্গে ওদের যে কোন সম্বন্ধ আছে তা প্রকাশ করাই অনুচিত।"

স্পষ্ট জবাব শুনিয়া গঙ্গারাম এবং কানাই কেহই আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

নিমাই হালদার মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলিল "দেখ শ্যাম, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার মুখে এসকল কথা শোভা পায় না, তুমি বাড়ী যাও।"

শ্যামলাল আরো চটিয়া বলিল "বুড়োরা যখন লুচির ফলার না পেয়ে দিক্‌ বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখন ছেলেমানুষের মুখে যথার্থ কথা বের হতে দেখা একটু আশ্চর্য্য হলেও অসম্ভব নয়। এ বৈঠকে সকলেরই কথা বলবার অধিকার আছে, আপনাকে যদি বলি মশায়, আপনি বাড়ী যান, তাহলে সে কথাটা আপনার কি রকম লাগে?"

দে মশায়দের পক্ষের যে সকল লোক বৈঠকে ছিল তাহারা বলিল "চলনা আমরা যাই, ওঁদের যা ইচ্ছে হয় তাই করুন, আমাদের আজ কাজ অনেক।"

বৈঠক হইতে তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল। বেলা দুই প্রহরের সময় কৃষ্ণচরণ নন্দী দে বাড়ীতে আসিয়া ছোট দে মশায়কে বলিলেন "কুটুম্বেরা আর ফলার চায় না, তারা বিনি ফলারেই বিয়ে দিয়ে বাড়ী যাবে।"

সুকুমারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "এর মানে চোরের উপর রাগ ক'রে মাটীতে ভাত খাওয়া, কিন্তু লুচি সন্দেশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এখন কুটুম্বেরা খেতে চায় না, তা হলে কি গরীবের জিনিষপত্রগুলো নষ্ট করার অভিপ্রায়? আপনার ইচ্ছা কি? আপনি আসবেন ত?"

নন্দীবৃদ্ধ সহাস্যে উত্তর করিলেন "আমি কি তোমাদের ছাড়া হয়ে কাজ কর্ত্তে পারি? আমাকে আসতেই হবে।"

সুকুমারবাবু উত্তর করিলেন "তবে আর কি? আপনিই আমাদের সমাজের প্রধান ব্যক্তি. আপনি এসে শুভকার্য্য শেষ করবেন, যাদের খুশী না হয় তারা বেশ ফলার না করে।"

"তা ত যথার্থ কথা" বলিয়া কৃষ্ণচরণ প্রস্থান করিলেন। সুকুমারবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "নন্দী মহাশয়ের কি অভিপ্রায়ে আগমন হয়েছিল তা ত বোঝা গেল না।"

সুকুমারবাবু হাসিয়া বলিলেন "বুঝলে না, আমাকে একটু ভয় দেখানর ইচ্ছা ছিল, আমি তাঁর প্রাধান্যটুকু বজায় রাখি. এ অভিপ্রায়ও যে ছিল না তা নয়।"

যুবক হাসিয়া বলিলেন "সাপের হাই বেদেয় বোঝে!' বুঝলাম আমি আপনাদের সমাজ বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।"

রাত্রে নির্ব্বিবাদে বিবাহ হইয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া গঙ্গারাম ও কানাই বরকর্ত্তা ও কন্যা কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মতলব মন্দ ছিল, কিসে গোল বাধবে. কি করিলে আহারাদিতে বিঘ্ন ঘটিবে বন্ধুভাবে দলে মিশিয়া সন্ধ্যা হইতে তাহারা সেই চেষ্টাতেই ফিরিতেছিল। গোলমালের মাঝে তাহারা দুই তিন ধামা লুচি এবং ৫।৭ সের সন্দেশ সরাইয়া ফেলিয়া ও বরাদ্দ অপেক্ষা কম সন্দেশ আনিয়া বিনোদবিহারী লাভের চেষ্টায় আছে বলিয়া তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া, একটা নূতন গণ্ডগোল প্রায় পাকাইয়া তুলিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিন্তু বিনোদবিহারীর স্ত্রী চিন্তামণি সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে। বিবাহের পর ফলার শেষ হইলে সে খুব ঝগড়া বাধাইয়া দিল, ঝগড়ার চোটে সে রাত্রিতে পাড়ার একটি প্রাণীও চোখ বুজিতে পারিল না।

আহারাদির পর বাকি রাত্রিটুকু, বাসর-জাগিয়া শেষরাত্রে মেয়েদের সখ উঠিল যে

তাঁরা শানাই শুনিবেন। তখন আকাশে মেঘ ঘোর হইয়া আসিয়াছিল, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; অনেক রাত্রে ফলার করিয়া রস্নচৌকির দল ঢেকীশালে চাটাই পাতিয়া শুইয়া পরম সুখে ঘুমাইতেছিল, মেয়েদের তাড়ায় জাগিয়া তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া "উঠচি, এই উঠি এখনো রাত্রি আছে"—এই রকম আপত্তিতে দুঘণ্টা কাটাইয়া দিল, তাহার পর তাহাদের সানাই খুঁজিয়া লইতে বাদ্যযন্ত্র যা দিয়া দুরস্ত করিতে আরো আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। শেষে ভোরবেলা যখন পূর্বদিক মেঘে আরও আঁধার হইয়া আসিল এবং প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল তখন দুই একবার ধীরে ধীরে বাঁশীতে ফুঁ দিয়া অতি মধুর করুণ রাগিনীতে গান ধরিল—

"দাসখত লিখে দিলাম রাই হে তোমার চরণমূলে।"

—ভারতী। আশ্বিন ১৩০২। পৃঃ ২৯০-৩০৫।

—দীনেন্দ্র কুমার রায়

কার্ত্তিকেয়ের বক্তৃতা

পরীক্ষিত কহিলেন, "ভগবন্, প্রত্যহই আপনার নিকট হস্তলিখিত অতি জীর্ণ পুঁথি দেখিতে পাই, আজ আপনার হস্তে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর লেখা যুক্ত কাগজ খানি কি? জনমেজয় উত্তর দিলেন "এখানি স্বর্গস্থিত জনৈক মানব সম্পাদিত "দেব বার্ত্তা" নামক সংবাদ পত্র। শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহার গত মর্ত্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে দেবতাদিগকে একটি বক্তৃতা দেন। আমি তাহাই পাঠ করিতেছি।" পরীক্ষিত বক্তৃতাটি প্রথম হইতে পাঠ করিবার নিমিত্ত জনমেজয়কে অনুরোধ করিলেন। জনমেজয় নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করিলেন।

(আমাদের সংবাদদাতার পত্র।)

গতকল্য "দেব-হলে" শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহার মর্ত্তে ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করেন। সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় সভাগৃহটি দেব দেবী ও মানবগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন পঞ্চমুখ ব্রহ্মা সভাপতি, নারায়ণ ও তৎপত্নী লক্ষ্মী; স্বর্গীয় আবগারির কর্ত্তা শিব ও তৎপত্নী দুর্গা; রাবণ জেতা শ্রীরামচন্দ্র ও তৎপত্নী সীতা; সুর-গুরু বৃহস্পতি, দৈত্যগুরু শুক্র প্রভৃতি দেব ও দেবীগণ! এবং অদ্ভুৎদাতাকর্ণ, অটল প্রতিজ্ঞ দেবব্রত, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তৎভ্রাতাগণ, বঙ্গের শেষবীর মহামহিমান্বিত

প্রতাপাদিত্য, রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ রাণাডে, প্রভৃতি মানবগণ।

সভাপতি মহাশয় ব্রহ্মা উঠিয়া কার্ত্তিকেয়কে তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে দেব সেনাপতি বলিলেন, "সভাপতি মহাশয়, দেবীগণ, দেবগণ ও মানবগণ! আজ আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া আমার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, যে হেতু মদগ্রজ গণেশদাদা মর্ত্ত বিষয়ে আমাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ। মর্ত্তে 'আরম্‌স্ এক্‌ট্' নামক একটি আইন হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীরা আমার পূজা একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। আর মর্ত্তে যাঁহাদেরই "লক্ষ্মী শ্রী" আছে তাঁহারাই তাঁহার পূজা না করিয়া কোন শুভ কর্ম্ম করেন না। অধুনা আমার পূজা বারাঙ্গনার গৃহেই অধিক হইয়া থাকে। আমি অত্র যাহা যাহা বলিব তৎসমস্তই আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবেন।

আমি স্বর্গ হইতে একেবারে মর্ত্তে ঝাঁপ দিলাম। ময়ুরটি কিন্তু সঙ্গে লইলাম না, কারণ দেখিতে পাই মানবগণ তাহাকে বধ করিয়া তাহার পালকে বিবিধ সৌখীনের দ্রব্যাদি করে।"

এই সময় সভাগৃহে ইন্দ্রের আলো জ্বলিল। মনে হইল যেন সূর্য্য পুনরায় উঠিলেন। আপনাদের ইলেকট্রিক লাইট ইহার নিকট প্রদীপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমান কার্ত্তিকেয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ঝাঁপ দিয়া দেখিলাম সেখানে সন্ধ্যা উপস্থিত। আমি যে স্থলে পতিত হইয়াছিলাম, সে স্থলের নাম শুনিলাম "ইডেন গার্ডেন।" তথায় মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছিল। কিন্তু তৎপরে অবগত হইলাম যে, ঐ আলো অপেক্ষা ভূমণ্ডলে আর উজ্জ্বলতর আলোক আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হউক আমি উঠিলাম। উঠিয়া দেখি তলায় বিবিধ লোক। এক প্রকার লোকের বালিসের খোলের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, তন্মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কদাচিত হস্তের অঙ্গুলি, নয়ন গোচর হয়। ইহারা সর্ব্বদা বৃহৎ লাঙ্গুল সংযুক্ত পশুর ন্যায় দ্রুত চলিতে সক্ষম। আর একপ্রকার লোক দেখিলাম, ইহাদের হস্ত, পদ প্রভৃতি আমাদেরই মত অনাবৃত। ইহারা সহজেই কিছু নম্র, এজন্য ইহাদের চালচলন উভয়ই নম্র। সর্ব্বাঙ্গাবৃত লোকদিগকে সাহেব কহে ও অপর জাতিটি "বাবু" নামে অভিহিত। একজন দেবতা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ভূমণ্ডলে "সাহেব" বা কে? এবং "বাবু" বা কে? ইহাদের পরস্পর মধ্যে সম্বন্ধই বা কি?"

শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয় উত্তর করিলেন, "সাহেব এবং বাবু উভয়েই দুইটি ভিন্ন জাতি। সাহেব হলেন রাজা, বাবু হলেন প্রজা। বাবু হলেন খাদ্য, সাহেব হলেন খাদক।

সাহেবরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ব্যতীত সমস্ত অঙ্গই ঢাকা দিয়া রাখেন পাছে "নেটিভদের" (অর্থাৎ "বাবুদের") হাওয়া গায়ে লাগে। বাবুরা আমাদিগেরই মত, কিন্তু কতিপয় বাবুও সাহেব হইয়া যান, যখন তাঁহারা সাহেবদিগের দেশে একবার পদার্পণ করেন। জগতে যতস্থান আছে, তন্মধ্যে ভারতভূমি অবতারের ভূমি। পূর্বে এ স্থানে মাত্র নয়জন অবতার ছিল, কিন্তু কালের ও ভারতের মৃত্তিকার কৃপায় অধুনা যে, সাহেব এখানে পদার্পণ করেন, তিনিই এক একটি অবতার হইয়া উঠেন, এবং একটি না একটি নেটিভের প্লীহা ফাটাইয়া, তাহার স্বর্গের সোপান নির্মাণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইহাদের ও ইহাদের শঙ্কর বংশধর ফিরীঙ্গিদের সংখ্যা বড় ন্যূন নহে। সেইজন্য আমি এই সাহেবগণকে দশ অবতার শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাই, যথা,—প্রথম অবতার, বড়লাট, ইহার অস্ত্র মিষ্ট বাক্য, ইহার বধ্য করদ রাজা। দ্বিতীয় অবতার, প্রাদেশিক লাট, ইহার অস্ত্র সহানুভূতি, ইহার বধ্য প্রজাদের স্বত্ব। তৃতীয় অবতার, হাইকোর্টের বড় জজ, ইহার অস্ত্র বে-আইন, ইহার বধ্য নেটিভ হিতৈষী জজ। চতুর্থ অবতার, মিউনিসিপালিটির কর্তাকর্তা, ইহার অস্ত্র বাইল, ইহার বধ্য করদাতারা। পঞ্চম অবতার বণিকসভার কর্তাসাহেব, ইহার অস্ত্র বাণিজ্য, ইহার বধ্য বেচারা বড় লাটটি পর্য্যন্ত। ষষ্ঠ অবতার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার অস্ত্র পুলিশ, ইহার বধ্য জমিদার, দোষী-নির্দোষী প্রভৃতি জেলার সমস্ত লোক। (ইনি পূর্ণাবতার!)। সপ্তম অবতার, চাকর, ইহার অস্ত্র প্রলোভন, ইহার বধ্যে কুলি রমণী ও পুরুষ। অষ্টম অবতার গোরাসৈন্য, ইহার অস্ত্র সবুট আঘাত ইহার বধ্য পাখা টানা কুলি, নবম অবতার বড় দোকানদার, ইহার অস্ত্র বড় বিজ্ঞাপন, ইহার বধ্য ধনী বাবু। এবং দশম অবতার কাগজের সম্পাদক, ইহার অস্ত্র প্রবল আড়ম্বর, ইহার বধ্য নেটিভ কাগজগুলা এবং খোদ গবরমেণ্ট।"

এই স্থলে কার্ত্তিকেয় প্রশ্নকারী দেবতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অত্যন্ত সময় নষ্ট হয়, আশাকরি এরূপ আর করিবেন না।"

"এখন যে বিষয় বলিতেছিলাম, আমি ত উঠিলাম। উঠিয়া বাগান পার হইয়া আসিয়া একটি রাস্তায় পড়িলাম। তথায় দেখিলাম সাহেব ও বিবিরা (সাহেবের স্ত্রীলোককে বিবি কহে) বেড়াইতেছেন। আমার পরনে আধুনিক বাবুর বেশ ছিল। আমি সেইপথে গেলাম, অমনি লাল পাগড়িধারী একটি কালা পাহারাওয়ালা আমায় নিষেধ করিয়া বলিল, "উরাস্তা সাহাব কা ওয়াস্তে হায়, তোমরা বাস্তে নেহি হ্যায়। হট্ যাও উহাঁসে।" এই রাস্তাটি রেড রোড নামে অভিহিত। আমি পাহারাওয়ালার বাক্য শুনিয়া ফিরিতে বাধ্য হইলাম। ফিরিয়া—"

এমন সময় আর একজন দেবতা উঠিয়া বলিলেন, "বক্তা মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, বাবু

কি প্রকার জাতি সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহারা কেনইবা প্রজা, আর সাহেবরা কেনই বা তাহাদের রাজা ? তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কি অনুগ্রহ করিয়া আমায় সবিস্তারে বলুন না, আর আপনাকে এই প্রকার বাধাদান করিব না।"

বক্তা মহাশয় উত্তর দিলেন "মহাশয়, বাবুরা কেন যে প্রজা ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের দোষে। তাঁহাদেরও দুই হাত, দুই পা এবং সাহেবদেরও তাহাই, যা কেবল পরিচ্ছদ ও আহারের বিভিন্নতা। বাবুদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ বলিয়া থাকেন যে সাহেবরা আমিষ ভোজী বলিয়া তাহারা অধিক বলশালী সুতরাং তাহারা বাবুদের রাজা। কিন্তু আমি জ্ঞাত আছি জাপান নামক একটি প্রবল পরাক্রান্ত দ্বীপের অধিবাসীরা সকলেই নিরামিষ ভোজী, কিন্তু তাঁহারা অতিশয় বলশালী। অধিকন্তু এই জাপান বাবুদেরই রাজা এই জাপান দ্বীপের সহিত সভ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে অতি মহান্ বলিয়া মনে করেন। আরও আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, এককালে এই বাবুরাই স্বাধীন ছিল। কিন্তু এখন তাহারা পরপদানত। মহাশয়, অধীন ওপর পীড়িত হইলে লোকের অনেক দোষ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং ইঁহাদেরও অনেকগুলি দোষ বর্ত্তমান। আমরা পরশ্রী কাতর এবং সকলেই "হাম বড়" হতে চায়। তাহারা তাম্রকুট পরিত্যাগ পূর্বক সিগারেট এবং সিগার নামক এক প্রকার বিদেশী অপদার্থ পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। চা নামক আর একটি পানীয় প্রত্যুষে তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার অর্থপূর্ণ নশ্বর দেহবিশিষ্ট চা সাহেব শুধু যে কুলির প্রতি ভীষণ অত্যাচার করে তা নয়, ইহার লাভের এক কড়া, কানাকড়িও দেশে থাকে না। আমার মতে বাবুরা সকলে মিলিয়া চা ও সিগার ও সিগারেট ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করা বিধেয়। উক্ত প্রকার এবং অন্যান্য প্রকারে অর্থ বিদেশে যাইতেছে। এখানে ইহাদের দেশের দুরবস্থা এমন যে, দেশের সকল লোকের ভাগ্যে দুইবেলা অন্ন জোটা ভার। ইঁহারা—"

এই স্থলে পরীক্ষিত অশ্রুপূর্ণ লোচনে জনমেজয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবান্, যে দেশের কথা শুনিতেছি, ইহা আমাদেরই দেশ বলিয়া মনে হইতেছে। এ দেশকে এককালে সুজলা, সুফলা, নামে জানিত। এখন কিনা সেইদেশে অন্নের অভাব। থাক, আর পড়িবেন না।"

বক্তার বক্তৃতা প্রবাহ অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। সংক্ষুব্ধ ভীম গর্জ্জিত সমুদ্রের ন্যায় সেই কোলাহল নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হইল। সভাস্থ সকলে সভয়ে দেখিল মহাবীর হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘনকালে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিশাল, ভীতিবর্দ্ধক দেহ দর্শন করিয়া বানরগণ ত্রাসে বাক্‌শূন্য

হইল। ঘন ঘোর মেঘ গর্জ্জনের তুল্য গভীর স্বরে হনুমান কহিলেন, "কিষ্কিন্ধ্যা নিবাসী পণ্ডিতগণ! আমাকে তোমরা সমাজচ্যুত কর, অথবা আমার নিন্দা কর তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু জীবনে সাধ থাকিলে জানকী অথবা শ্রীরামচন্দ্রের অবমাননাসূচক বাক্য আমার সমখ্যে মুখে আনিও না। তোমাদের বাক্যশ্রবণ করিয়া আমাদের পূর্ববিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। রাজরাজেশ্বরী রাজলক্ষ্মী জননী জানকীর উদ্ধারের নিমিত্ত, অথবা তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য লঙ্কায় গমন ত অতি তুচ্ছ কথা, সপ্তসমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারি, হাস্যমুখে এই দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি।"

শ্রীরাধাকান্ত বসু

ভারতী, আশ্বিন ১৩১০

শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল *

[টিকীন্দ্রজিদ্দেবতা, টিকি দাসো ঋষিঃ। টিক্‌টিক্ ছন্দঃ টিট্‌কার্য্যাং—বিনিয়োগঃ]

মূল গায়েন।—

ভো ভোঃ কারণ সলিলে কুঁকুড়ি সুকুড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা ছিল চইতন চুট্‌কি আদিতে টিকি হয় যার বংশ।
তারে 'চই' 'চই' করি আদিম আঁধারে ডাকিল সপ্ত ঋষি গো,
তাই চইতন নাম হইল তাহার যে নামে ভরিল দিশি গো!
তারে ব্রহ্মা কহিলা "টিকিয়া থাকহ" তাই তারে "টিকি" কয়,
আহা মগজ-আগুন-অঙ্গার-টিকি টিকি সামান্য নয়।

দোহার কী গোহার।—

এ-রি-হুম্!—তেরি না।
টিকি রাখ,—দেরী না আ আ!

* জঙ্গল মহলের অন্তর্গত রামটিকি পর্ব্বতের 'আঠারোঘা নামক গুহা হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সংকলিত এবং মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল গায়েন।—

হাঁ হাঁ— টিকির প্রভাবে টিকিয়া রয়েছি টিকিতেই বাঁধা বিশ্ব,
আর টিকি না থাকিলে হইত দুনিয়া টিকটিকি চেয়ে নিঃস্ব।
ওগো টিকি যেই রাখে ধর্ম্ম মোক্ষ পায় সেই হাতে হাতে,
দেখ বিপুল টিকির বহরে উড়িয়া বেঁধেছে জগন্নাথে !
তবে দোফলা টিকির চাষকর ভাই, টিকি মূলে ঢাল তৈল,
আহা যেতে ভবপার বিনা পয়সার টিকিট যে টিকি হৈল !

দোহার কী গোহার।—

এ-রি-হুম !—তেরি না !
টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ।

মূল গায়েন।—

আহা কামনা বহ্নি অন্তরে যার প্রেমি হইবে যেবা,
ওগো সেইজনে জানে টিকির কদর, সেই করে টিকি সেবা।
আর টিকি না রাখিলে প্রেমিকই হয় না শাস্ত্রে রয়েছে লেখা,
যখন প্রেমে হাবুডুবু লোকে বলে "আহা টিকিও না যায় দেখা।"
টিক রোমিয়োরও ছিল, হোমিওপ্যাথিক ইথে নাই কোনো ভুল,
পোড়ো মগজ-মহলে মাকো যা ঢুকিলে বেরবেই টিকি ঝুল।
ওগো মোক্ষ ও কাম পুরা হবে, হও থরকাটা প্রেমচাঁদ,
ওরে টিকি রাখ তোরা ভব দরিয়ায় টিকির জাঙাল বাঁধ।

দোহার-কী-গোহারি।—

এরি-হুম ! তেরি না !
টিকি রাখ ! দেরী না-আ-আ।

মূল গায়েন।—

ওগো টিকি রাখ যদি অর্থও পাবে অর্থই যদি চাও,
তখন চোরাই চাল্‌তা টিকিতে বাঁধিয়া হাত নাড়া দিয়া যাও।
আর টাকাটা সিকিটা দক্ষিণা পাবে হজমী টিকির জোরে,
আর রাতের ফাউল্ প্রভাত না হতে ফেলিবে হজম ক'রে।
কহ কুড়ি দরে তুমি মুর্গী কিনিতে ? বয়স যখন কাঁচা ?
বাপু ! অধম-তারণ টিকি রাখ মাথে ভয় কি তোমার বাছা ?
দেখ ধর্ম্ম-মোক্ষ অর্থ ও কাম সকলই টিকির ন্যাওটা

ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর কে ধরে তখন ম্যাওটা ?

দোহার কী গো হার।

এ-রি-হুম্—তেরি না !—

টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—

ওগো শুধু 'এক' লেখ অর্থ হবে না এলেক্‌টি দাও দিকি,

তখন একের অর্থ হবে এক টাকা অঙ্কে এলেক্—টিকি।

ওই এলেক্‌টিকির দোহাই না দিলে তারের খবর বন্ধ

তোমরা এলেক্‌-টিকি তো দিব্যি মানছে টিকির বেলাই 'সন্দ' ?

দেখ বৃক্ষের টিকি শিকড়,--সটিকি ডিগ্‌বাজী খায় বৃক্ষ,

আর বৃত্তের টিকি ট্যাঞ্জেণ্ট, কোথি নাই টিকি দুর্ভিক্ষ।

ওগো আমরা টিকির, টিকি আমাদের ঢাল তেল টিকিমূলে,

আর টাকে যদি টিকি নেহাৎ ঘোচায় (টিকি ' বানাইব পরচুলে।

দোহার কি গোহার।—

এ-রি-হুম !—তেরি না !—

টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ—।

মূল গায়েন।—

দেখ দেবতার টিকি ছিল কি না ছিল শাস্ত্রে লেখে না তাহা,

তবে বিচারের মুখে সূক্ষ্ম টানিলে বাহিরিবে টিকি তাহা।

যথা ব্রহ্মার টিকি নাভির মৃণাল, তৃতীয় চরণ বিষ্ণুর,

আর মহেশের টিকি জটা জালে ঢাকা, টিকি প্রতি শিব নিষ্ঠুর।

আর গণেশ দাদার শুঁড়ময়ী টিকি দাদার টিকিটি খাসা,

আর আদি বৈষ্ণব গরুড়ের টিকি তার সে টিকল নাসা !

আর সূর্য্যের টিকি রাহুর মুঠায় রাহুর টিকি সে কোথা গো ?

বুঝি রাহুর টিকিটি অন্তঃশীলা যেন ফল্গুর সোঁতা গো !

তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই,টিকি কভু নয় তুচ্ছ,

ওগো কানুর টিকি সে তৃতীয়চরণ.হনূর টিকি সে পুচ্ছ !

দোহার-কী-গোহার !—

এ-রি-হুম্ !—তেরি না !—

টিকি রাখ ! দেরী না-আ-আ

মূল গায়েন।—

দেখ অসুর পুরের শুম্ভাসুরের টিকি ছিল তাই রক্ষে,
হুঁহুঁ নহিলে তাহারে বাগানো কঠিন হ'ত কালিকার পক্ষে।
আহা সুরাসুর জন টিকির বাহন ত্রিলোক টিকি-ব্রত,
ওরে টিকি আছে ব'লে ট্রাম গাড়ী চলে নইলে অচল হ'ত।
জড় বিজ্ঞানে যাহা মাধ্যাকর্ষ টিকি সেই পৃথিবীর,
সেই টিকিটি ধরিয়া সূর্য্য তাহারে শূন্যে রেখেছে থির।
তোরা টিকির মূল্য বুঝিতে নারিস্ এযে অতি অদ্‌ভূত,
আরে টিকি যদি হায় না থাকে মাথায় কি ধরিবে যমদূত ?

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-স্তুম !—তেরি না !—
টিকি রাখ।—দেরী না-আ-আ।

মূল গায়েন।—

আহা ! টিকি সে স্বর্গ-চতুর্ব্বর্গ টিকি সে মোক্ষ কাম,
ওচা মুর্গীর মাথে টিকি আছে ব'লে রামপাখী তার নাম।
হায় ম্লেচ্ছরা এরে 'পিগ্‌টেল' ব'লে অহহ শূকর পুচ্ছ,
ওগো। তোমরা আর্য্য মর্য্যাদা রেখো টিকিরে ক'রো না তুচ্ছ।
দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছে,
তাই নরের মতন হতে সে পারে নি উঠিতে পারেনি উচ্চে।
মোরা পুচ্ছেরে শিরোধার্য্য করেছি মহৎ হ'য়েছি তাই,
আর ডারুইন ওই তত্ত্বলিখি যা করিয়াছে একজাই।
এখন টিকি রেখে পায়া ভারি হ'ল ভায়া আর কে মোদের পায় হে.
দেখ নরে ও বাপরে তফাৎ যা শুধু টিকিরই মর্য্যাদায় হে !
তবে মিলি কলু তেলি এস ভিড় ঠেলি' (এই) টিকিমূলে ঢাল তৈল .
আহা যেতে সশরীরে স্বর্গেতে টিকি রাবণের সিঁড়ি হৈল।

দোহার-কী-গোহার !

এ-রি-স্তুম্ !—তেরি না।—
টিকি রাখ।—দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—

দেখ শ্রীশ্রী টিকির অপমান করি চীনের কি দুর্গতি,

আহা বুড়া বয়সেতে আফিম ত্যজিল হ'ল তার ভীমরতি।
যাহা টিকি গেল খোয়া রাজা হল ধোঁয়া অরাজক হ'ল দেশ,
যত গোঁয়ারে মিলিয়া করিল দেখ না খোয়ারের এক শেষ!
দেখ আকাশের টিকি বিদ্যুৎ আর পাতালের টিকি সর্প,
আর তোমরা ভেবেছ টিকি রাখিবে না ভারি তোমাদের দর্প।

দোহার—কী-গোহার।—
এরি-হুম্। টেরি না!—
টিকি রাখ। দেরী না-আ-আ।

মূল গায়েন।—

ওগো যেই শোনে আর যেজন শোনায় টিকি মঙ্গল গান,
কভু টাক অসুরের কোপে তার টিকি নাহি হয় তিরোধান।
যত টিকি-ঘেঁসা টাক সারিবে বেবাক এগান শুনিলে কানে,
আর টিকি-বর্জ্জিত বৃথা টাকে চুল গজাবে টিকি-স্থানে।
ওগো টিকি মঙ্গল গাহিবার কালে যে করে বাহির দন্ত,
ওগো দন্ত তাহার টিকিবে না,-ঠিক বুড়া কালে হবে অস্ত।
ওগো জনমে জনমে পোকা হবে দাঁতে যুগে যুগে হবে শাস্তি,
এই হাসির জন্য কাঁদিতে হইবে মার্জ্জনা এর নাস্তি!

দোহার—কী গোহার।—
এ-রি-হুম্! তেরি না।
টিকি রাখ।—দেরী-না-আ-আ।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

ভারতী
বৈশাখ / ১৩২১

শ্রীশ্রী টিকিমঙ্গল

ভারতী বৈশাখ, ১৩২২

[টিকীন্দ্রজিদ্দেবতা। টিকি দাসো ঋষিঃ। টিক্ টিক্ ছন্দঃ। টিটকার্য্যাং বিনিয়োগঃ]

মূল গায়েন।—

ভো ভোঃ কারণ-সলিলে কুঁকুড়িস্কুকুড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা ছিল চইতন চুট্‌কি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ।

তারে 'চই' 'চই' করি আদিম আঁধারে
ডাকিল সপ্ত ঋষি গো,
তাই 'চইতন' নাম হইল তাহার
যে নামে ভরিল দিশি গো।
তারে ব্রহ্মা কহিলা "টিকিয়া থাকহ"
তাই তারে "টিকি" কয়,
আহা মগজ-আগুন-অঙ্গার টিকি
টিকি সামান্য নয়।

দোহার কী-গোহার।—

এ-রি-হুম্! -তেরি না!—
টিকি রাখ,—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই,
টিকি মূলে ঢাল তৈল,
আহা যেতে ভবপার বিনা পয়সার
টিকিট যে টিকি হৈল!

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-হুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ!-দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

আহা কামনা-বহ্নি অন্তরে যার
প্রেমিক হইবে যেবা,
ওগো সেইজন জানে টিকির কদর,
সেই করে টিকি সেবা।
আর টিকি না রাখিলে প্রেমিকই হয় না
শাস্ত্রে রয়েছে লেখা,
যখন প্রেমে হাবুডুবু লোকে বলে "আহা
টিকিও না যায় দেখা!"
টিকি রোমিয়োরও ছিল, হোমিয়প্যাথিক
ইথে নাই কোন ভুল,
পোড়ো মগজ-মহলে মাকোষা ঢুকিলে
বেরুবেই টিকি ঝুল।

---

* জঙ্গল মহলের অন্তর্গত রামটিকি পর্ব্বতের 'আঠারো ঘা' নামক গুহা হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং উক্ত ভদ্রমহোদয়ের অনুমত্যানুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হাঁ হাঁ টিকির প্রভাবে টিকিয়া রয়েছি
টিকিতেই বাঁধা বিশ্ব,
আর টিকি না থাকিলে হইত দুনিয়া
টিক্‌টিকি চেয়ে নিঃস্ব !
ওগো টিকি যেই রাখে ধর্ম্ম মোক্ষ
পায় সেই হাতে হাতে,
দেখ বিপুল টিকির বহরে উড়িয়া
বেঁধেছে জগন্নাথে !

ওগো মোক্ষ ও কাম পূরা হ'বে, হও
থরকাটা প্রেমচাঁদ,
ওরে টিকি রাখ্ তোরা ভব-দরিয়ায়
টিকির জাঙ্গল বাঁধ।

দোহার-কি-গোহার।—
এ-রি-হুম্ !-টেরি না !—
টিকি রাখ !-দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—
ওগো টিকি রাখ যদি অর্থও পাবে
অর্থই যদি চাও,
তখন চোরাই চাল্‌তা টিকিতে বাঁধিয়া
হাত নাড়া দিয়া যাও।
আর টাকাটা সিকিটা দক্ষিণা পাবে
হজ্‌মী টিকির জোরে,
আর রাতের ফাউল্ প্রভাত না হতে
ফেলিবে হজম ক'রে।
কহ কড়ি দরে তুমি মুর্গী কিনিতে ?
বয়স যখন কাঁচা ?—
বাপু ! অধম-তারণ টিকি রাখ মাথে
ভয় কি তোমার বাছা ?
দেখ ধর্ম্ম মোক্ষ অর্থ ও কাম
সকলই টিকির গ্যাওটা
ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর
কে ধরে তখন ম্যাওটা ?

দোহার-কী-গোহার।—

ওই এলেক্ টিকির দোহাই না দিলে
তারের খবর বন্ধ
তোমরা এলেক্-টিকি তো দিব্যি মান হে
টিকির বেলায় সন্দ' ?
দেখ বৃক্ষের টিকি শিকড়,—সটিকি
ডিগ্‌বাজী খায় বৃক্ষ,
আর বৃত্তের টিকি 'ট্যাঞ্জেন্ট', কোথি
নাই টিকি দুর্ভিক্ষ।
ওগো আমরা টিকির, টিকি আমাদের ঢাল
তেল টিকিমূলে,
আর টাকে যদি টিকি নেহাৎ ঘোচায়
(টিকি) বানাইব পরচুলে।

দোহার-কী গোহার।—
এ-রি-হুম্ !-তেরি না !—
টিকি রাখ !-দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—
দেখ দেবতার টিকি ছিল কিনা ছিল
শাস্ত্রে লেখে না তাহা,
তবে বিচারের মুখে সূক্ষ্ম টানিলে
বাহিরিবে টিকি তাহা।
যথা ব্রহ্মার টিকি নাভির মৃণাল,

এ-রি-হুম্‌-তেরি না !—
টিকি রাখ ! দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন ।—

ওগো শুধু 'এক' লেখ অর্থ হবে না
এলেকৃটি দাও দিকি,
তখন একের অর্থ হবে এক টাকা
অঙ্কে এলেক্‌-টিকি ।

বুঝি রাহুর টিকিটি অন্তঃশীলা
যেন ফল্গুর সোঁতা গো ।
তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই
টিকি কভু নয় তুচ্ছ,
ওগো কানুর টিকি সে তৃতীয় চরণ
হনুর টিকি সে পুচ্ছ !

দোহার কী-গোহার ।—

এ-রি-হুম ! তেরি না !—
টিকি রাখ ! দেরী না-আ-আ ।

মূল গায়েন ।—

দেখ অসুরপুরের শুম্ভাসুরের
টিকি ছিল তাই রক্ষে,
হুঁহুঁ নহিলে তাহারে বাগানো কঠিন
হ'ত কালিকার পক্ষে ।
আহা সুরাসুর হন টিকির বাহন
ত্রিলোক টিকি-ব্রত,
ওরে টিকি আছে ব'লে ট্রামগাড়ী চলে
নইলে অচল হ'ত ।
জড় বিজ্ঞানে যাহা মাধ্যাকর্ষ
টিকি সেই পৃথিবীর,
সেই টিকিটি ধরিয়া সূর্য্য তাহারে
তৃতীয় চরণ বিষ্ণুর,
আর মহেশের টিকি জটাজালে ঢাকা,
টিকি প্রতি শিব নিষ্ঠুর ।
আর গণেশদাদার শুঁড়ময়ী টিকি
দাদার টিকিটি খাসা ;
আর আদি বৈষ্ণব গরুড়ের টিকি
আর সে টিকিল নাসা !
আর সূর্যের টিকি রাহুর মুঠায়
রাহুর টিকি সে কোথা গো ?

মূল গায়েন —

আহা ! টিকি সে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ
টিকি সে মোক্ষ কাম,
ওচ. মুর্গীর মাথে টিকি আছে ব'লে
রামপাখী তার নাম ।
হায় ম্লেচ্ছেরা এরে 'পিগ্‌টেল' বলে
অহহ শূকর পুচ্ছ,
ওগো ! তোমরা আর্য্য-মর্য্যাদা রেখো
টিকিরে ক'রো না তুচ্ছ ।
দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি
রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছ,
তাই নরের মতই হ'তে সে পারেনি
উঠিতে পারেনি উচ্চে ।
মোরা পুচ্ছেরে শিরোধার্য্য করেছি
মহৎ হ'য়েছি তাই,
আর ডারুইন ওই তত্ত্ব লিখিয়া
করিয়াছে একজাই ।
এখন টিকি রেখে পায়াভারি হ'ল ভায়া
আর কে মোদের পায় হে,
দেখ নরেও বানরে তফাৎ যা' শুধু
টিকিরই মর্য্যাদায় হে !

শূন্যে রেখেছে থির।
তোরা টিকির মূল্য বুঝিতে নারিস্
এ যে অতি অদ্‌ভুত,
আরে টিকি যদি হায় না থাকে মাথায়
কি ধরিবে যমদূত ?
দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-হুম্ !-তেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ !

তবে মিলি' কলু তেলি এস ভিড় ঠেলি'
(এই) টিকি মূলে ঢাল তৈল ;
আহা যেতে সশরীরে স্বর্গেতে টিকি
রাবণের সিঁড়ি হৈল।
দোহার-কী-গোহার !
এ-রি-হুম্ !-তেরি না !—
টিকি রাখ !-দেরী না-আ-আ !
মূল গায়েন।—
দেখ শ্রী শ্রী টিকির অপমান করি
চীনের কি দুর্গতি,

আহা বুড়া বয়সেতে আফিম ত্যজিল
হ'ল তার ভীমরতি।
হায়! টিকি গেল খোয়া রাজা হল ধোঁয়া
অরাজক হ'ল দেশ,
যত গোঁয়ারে মিলিয়া করিল দেখ না
খোয়ারের একশেষ।
দেখ আকাশের টিকি বিদ্যুৎ আর
পাতালের টিকি সর্প,
আর তোমরা ভেবেছ টিকি রাখিবে না
ভারি তোমাদের দর্প।
দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-হুম্ !-টেরি না !—
টিকি রাখ ! -দেরী না-আ-আ !
মূল গায়েন।—
ওগো যেই শোনে আর যে জন শোনায়
টিকি-মঙ্গল-গান,

কভু টাক-অসুরের কোপে তার টিকি
নাহি হয় তিরোধান।
যত টিকি ঘেঁসা টাক সারিবে বেবাক
এ গান শুনিলে কানে,
আর টিকি বর্জ্জিত বৃথা টাকে চুল
গজাবে টিকি স্থানে।
ওগো টিকি-মঙ্গল গাহিবার কালে
যে ক'রে বাহির দন্ত,
ওগো দন্ত তাহার টিকিবে না,—ঠিক
বুড়াকালে হবে অন্ত !
ওগো জনমে জনমে পোকা হবে দাঁতে
যুগে যুগে হবে শাস্তি,
এই হাসির জন্য কাঁদিতে হইবে
মার্জ্জনা এর নাস্তি।
দোহার-কী-গোহার।—
এ-রি-হুম্ !-তেরি না।
টিকি রাখ ! -দেরী না-আ-আ।

শ্রী নবকুমার কবিরত্ন।
ভারতী। বৈশাখ। ১৩২১

রামেয়াড্

অথবা ডাক্তার বাল্মীকি এল্. এল্. ডি. এফ্. আর. সি. এস. কৃত উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ।

পুণ্যতীর্থ তমসা নদীর তীরে ডাক্তার বাল্মীকির তপোবন। তার কণ্ঠী কুক্কুট কুক্কুটী বিহঙ্গেরা মনের উল্লাসে গান করিতেছে; কোথাও বা আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ সুখে অস্থি-দূর্ব্বা রোমন্থ করিতেছে। ডাক্তার বাল্মীকি আশ্রম-কুটীরে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ফায়েরসাইড্ অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঈজিচেয়ার বেদীতে হেলান দিয়া ম্যানিলা পত্রের ধূমপান করিতেছেন; চুরট প্রান্ত হইতে ঘন ধূমরাশী কুণ্ডলী পাকাইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, সেই ধূপধূনার পুণ্য গন্ধে আশ্রম কুটীর আমোদিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মুনিবর পার্শ্বস্থিত বোতল কমণ্ডলু হইতে শ্যামপেনের সোমপান করিতেছেন; এমন সময়ে কুটীর দ্বারে ঘা পড়িল। মুনিকুমার মাষ্টর ভরদ্বাজ, ডাক্তার বাল্মীকির নিকটে আসিয়া সমাচার দিল,—"রেবেরণ্ড মিষ্টর নারদ আসিয়াছেন।" ধ্যানমগ্ন বাল্মীকির চমক্ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন এবং হাইচার্চ্চ মিসনরি সোসাইটির পরিব্রাজক মিশনরি, সঙ্গীতের অধ্যাপক, সহস্র চুরট ভস্মকারী গোখাদক-দিগের অগ্রগণ্য রেবেরেণ্ড নারদের সহিত চটুলভাবে হস্তালোড়ন পূর্ব্বক "কেমন করিতেছ" বলিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ উত্তর করিলেন, "সম্পূর্ণ ভাল—ধন্যবাদ তোমাকে।" অতঃপর বাল্মীকি নারদকে আহ্বান পূর্ব্বক কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি ধুচুনি উষ্ণীষ মস্তক হইতে অবতারণ পূর্ব্বক চেয়ারে উপবেশন করিলেন, পরে চেয়ারের নিম্নে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া বলিলেন, "বাল্মীকি! তোমায় আজ এত ভাবিত দেখিতেছি কেন?" বাল্মীকি উত্তর করিলেন, "প্রিয় খুড়া, সত্য বলিয়াছ, আমি কিছু ভাবিত আছি, অনেকদিন হইতে আমি মনে করিতেছি এরটি মহাকাব্য লিখিব—কে নায়ক হইবার উপযুক্ত তাহাই এতক্ষণ আমি এই অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম, বুদ্ধিকে সতেজ করিবার জন্য গ্যালন্ গ্যালন্ সোম পান করিয়াছি, তথাপি তাহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে, খুড়া তুমি কি এত দয়ালু হইবে যে, ইহার একটা সৎপরামর্শ দিয়া আমাকে বাধিত করিবে?" সুবিজ্ঞ নারদ আজানুলম্বিত পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিলেন "দেখ বাপু বাল্মীকি, মহাকাব্য, ভাষায় যাহাকে এপিক্‌পোয়েম বলে, তাহা অতি দুরূহ ব্যাপার, তাহা লেখা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। এক যা লিখিয়াছিলেন

মহর্ষি হোমর; তেমন এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ লিখিতে পারে নাই, পারিবেও না; তুমি সে দুরাশা পরিত্যাগ কর।" বাল্মীকি বলিলেন, "খুড়া অমন আশীর্ব্বাদ করিও না—মনুষ্য যাহা করিয়াছে, মনুষ্য তাহা করিতে পারে। হোমর ইলিয়াড্ লিখিয়াছেন, আমি কি কিছুই লিখিতে পারি না? হোমর ইলিয়াড্ লিখিয়াছিলেন আমি রামিয়াড্ লিখিব। আমার ইন্‌স্‌পিরেসণ আসিয়াছে তোমার হার্পটা আমাকে দেও, আমি রাময়াড্ গান করি।" এই কথা বলিয়া বাল্মীকি হার্প বাদন পূর্ব্বক গর্দ্দভ বিনিন্দিত সুমধুরস্বরে উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ গান আরম্ভ করিলেন। বাল্মীকির স্বহস্তপালিত আশ্রম মৃগ, কুক্কুরগণ প্রভু,-প্রসাদ গো—অস্থি রোমন্থ করিতেছিল—গীত মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক ভেউ ভেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। উভয় স্বর মিলিয়া একটি মধুর সঙ্গীত-লহরী গগনতলে সমুত্থিত হইল।

রাম নামে একজন দোর্দ্দিপ্ত প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার দেহ মধ্যমাকার, হর্কুলিসের ন্যায় দৃঢ় গঠন, নাসীকা রোমীয়ছাঁদের, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ চাপা, ইহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সূচিত হইতেছে। তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তল আবলুষ কাষ্ঠ বিনিন্দিত মসৃণ ললাটে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে যেন বিশাল ওক গাছে আইবিলতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই লোক পূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে নেষ্টরের ন্যায়, ধৈর্য্যে আল্প গিরির ন্যায়, বীর্য্যে এথিলিসের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে ক্যুপিডের ন্যায়, ক্ষমায় যীশুখৃষ্টের ন্যায়, ধনে রথচাইল্ডের ন্যায়, শাস্ত্র-জ্ঞানে মোক্ষমূলারের ন্যায় অসাধারণ ছিলেন। তিনি রাজা দশরথের প্রিনস্ অফ্ ওয়েল্‌স্। একদিন রাম মৃগয়ার্থ মিথিলা সন্নিহিত কোন অরণ্যে থ্যাক শিয়ালী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী। নীলাভ উৎকৃষ্ট বনাতের কোট্ ও নব্যতম ঢপের চোস্ত পেন্‌ট্‌লুন পরিধান, মস্তকোপরি সোলার হ্যাট্, পদদ্বয়ে শীকারোপযোগী ওয়েলিংটন বুট্ আজানু সমুত্থিত এবং উইস্কির বোতল ও কাট্‌লেট্ সম্বলিত চর্ম্মঝুলি চর্ম্মোপবীতে আলম্বিত রহিয়াছে। শিঙ্গার নিনাদে, কুক্কুরের চীৎকারে, শীকারী গণের হুররে রবে, অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে কাপন—প্রদেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র বর্শা উদ্ধত করিয়া শৃগালের পশ্চাৎ, ধারমান হইয়া একেবারে কাননের প্রান্ত দেশে উপস্থিত হইলেন। শৃগাল দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। রাম নিরাশ হইয়া একটা বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন মুখ পুছিতে লাগিলেন। সহসা রমনীকণ্ঠ নিঃসৃত কাতর চীৎকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাম এক জন গ্যালাণ্ট্ লোক। তিনি তৎক্ষাণাৎ সেই ধ্বনির অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, একটি চত্বারিংশৎ বর্ষীয়া বালিকা মূর্চ্ছিতা। রাম অত্যন্ত

ব্যাকুল হইলেন—তাঁহার ব্যাগের মধ্যে আভ্রান লবণ খুঁজিলেন কিন্তু পাইলেন না। পরে উইস্কির বোতলে যে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ ছিল তাহার এক ডোজ বালিকাটীর মুখে ঢালিয়া দিলেন—দিবা মাত্রই সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল—ক্রমে ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত হইল, চক্ষু মেলতেই সম্মুখে রামকে দেখিতে পাইলেন—অমনি "O.My" বলিয়া দুই হাতে পুনর্ব্বার চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। রাম বলিলেন "ভয় নাই আমি আপনার রক্ষা হেতু আসিয়াছি। কি জন্য আপনি ভয় পাইয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকা উত্তর করিলেন, "আমি আরণ্যক দৃশ্যের স্কেচ তুলিতেছিলাম আর আমার গাউনের আঁচল ঘেসিয়া কেমন একটা জন্তু—বোধ হয় শৃগাল দৌড়িয়া চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি।"

রাম। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আছেন কেন?

বালিকা। আমার ভয় হইতেছে পাছে আবার শৃগালটা আসে—আমাকে যদি কেউ, এই অরণ্য পথের রক্ষক হইয়া আমার বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দেন, তবে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

রাম। তার জন্য চিন্তা কি?

এই বলিয়া বালিকাকে উঠাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি কি আপনাকে বাহুদান করিতে পারি?" সীতা বলিলেন "ধন্যবাদ আপনাকে।" রাম হস্ত বাড়াইয়া দিলেন, বালিকা ঈষৎ ব্লষ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি যে আমাকে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহার ঋণ আমি কিরূপে পরিশোধ করিব?"

রাম। আমি যে উপকার করিলাম তাহা অতি সামান্য।

বালিকা। ও কথা বলিবেন না—আপনার ন্যায় বীরপুরুষ উপস্থিত না থাকিলে নিশ্চয়ই আজ শৃগালের হস্তে প্রাণ হারাইতাম।

রাম। আমি থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই। এক্ষণে পরস্পরের নিকট অপরিচিত থাকা আর কর্ত্তব্য নয়। আমার নাম রাম—আপনার নাম জিজ্ঞাসার স্পর্দ্ধা কি মার্জ্জনা করিবেন?

বালিকা। আমার নাম মিস্ সীতা জনক। রাম। ও! আপনি হিজ ম্যাজেষ্টী জনকের কন্যা? তিনি খুব একজন এন্‌লাইটেণ্ড লোক। আমার বলিতে সাহস হইতেছে না—প্রথম দৃষ্টিতেই আমি আপনাকে ভাল বাসিয়াছি। এ ভক্ত কিঙ্কর কি আপনার পাণি গ্রহণের আশা করিতে পারে?

সীতা। (সলজ্জভাবে) সে পিতা জানেন।

রাম। তাঁর কাছে কি আমি প্রস্তাব করিতে পারি? তিনি সম্মতি হইলে আপনার কোন আপত্তি থাকিবে না?

সীতা। ব্লষ করিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে উভয়ে জনক রাজার প্রাসাদে পৌছিলেন।

রাম জনক রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক আপনার কুলের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার কন্যার হস্তের নিমিত্ত আমি উমেদার"। জনক রাজা বলিলেন, "অতি উত্তম! কিন্তু আমার একটি বন্দুক ভঙ্গ পণ আছে, তাহার আমি অন্যথা করিতে পারি না। আমি টাইম্‌স্ সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে কোন পর্য্যটক আফ্রিকাবাসী গরিল্লা নামক বীর চূড়ামণিকে বন্দুক মারিতে যাওয়াতে তিনি তাঁহার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া এক মোচড়ে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরত্বের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমি আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমি দেশ-বিদেশে প্রচার করিলাম যে, গরিল্লা বীরকে আদর্শ মানিয়া, তাঁহার ন্যায় যিনি বন্দুক ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিব।" রাম বলিলেন, আচ্ছা আমি প্রস্তুত আছি।" অমনি একজন তৈয়ার ভৃত্য দ্রুতগতি একটা মার্টিনি রাইফেল আনিয়া রামের সম্মুখে ধরিয়া দিল। রাম তাহা দুই হস্তে ধরিয়া একটি মোচড়েই কর্ম্মনিকাশ করিয়া সাত হাত হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। জনক রাজা এবং পরিষদ্‌গণের তাক লাগিয়া গেল। জনক রাজা আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি যেরূপ অসামান্য বলবীর্য্য দেখাইলে, কন্যা সম্প্রদানের অগ্রে, তাহার উপযুক্ত একটি উপাধি তোমাকে আমি প্রদান করিতে অভিলাষ করি। অনেকের অনেক প্রকার উপাধি আছে, যথা—নর-ব্যাঘ্র, নরপুঙ্গব, নর-ঋষভ, কিন্তু সেই সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তুমি আজ হইতে লোকে নর-গরিল্লা নামে খ্যাত হইবে। এক্ষণে মিস্ জনকের সম্মতির কেবল অপেক্ষা, অতএব যাও তাঁহাকে রাজি কর গিয়া।" রাম সদাসর্ব্বদাই কোর্টসিপ সুরু করিলেন। সীতা যদিও চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকা, বই নয়, কিন্তু তিনি সকল গুণেই গুণবতী ছিলেন। জনক রাজা একজন এন্‌লাইটেণ্ড লোক ছিলেন; তিনি বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অনেক সভায় বক্তৃতা দিতেন। তিনি আপন কন্যাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সীতা তাঁহার যত্নে সর্ব্বগুণে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। তিনি কার্পেট বুনানি কার্য্যে অতিশয় নিপুণা ছিলেন। ফরাশীশ ভাষায় নবেল পাঠ করিতেন। পল্কা এবং ওয়াল্‌টস্ নাচিতেন। প্যারিস নগরের নব্যতম ফেসিয়ানের গাউন পরিতেন—সহজে ব্লষ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলেই মূর্চ্ছা যাইতে পারিতেন। এমন রূপগুণে বিভূষিতা চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়া রাম যে মুগ্ধ হইবেন ইহাতে

বিচিত্র কি! তিনি শীঘ্রই কোর্টসিপ শেষ করিয়া ফেলিলেন এবং বিবাহের পর এক্ষণে তিনি মনের সুখে মধুচন্দ্র ভোগ করিতেছেন। ইতি সাত ক্যাণ্ডো রামিয়াডের হনিমূন নাম কোহয়ং প্রথমঃ ক্যাণ্টো সমাপ্তঃ।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

১৩

প্রবাহ পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৯। পৃঃ ৫৯

"খেচর প্রতিভা"

যখন গুরু মহাশয়ের পাঠশালে অধ্যয়ন করি তখন প্রতিদিন অপরাহ্নে উচ্চশ্রেণীস্থ একজন ছাত্রকে পাণ্ডুলিপি মহাভারত পড়িতে হইত। দুই চারিটি গ্রাম্য প্রবীণ পাঠশালার আশ্রয়ীভূত আটচালায় বসিয়া শুনিতেন, কথনও তৎসংক্রান্ত একটা বিষয় লইয়া তুমুল তর্ক বাধাইয়া বসিতেন। আমি কদলী পত্রের শ্রেণী অতিক্রম করি নাই সুতরাং আমাকে সেরূপ অবৈতনিক পাঠকের কর্ত্তব্যে দীক্ষিত হইতে হয় নাই! তথাপি সতর্ক হইয়া দুর্দান্ত গুরুমহাশয়ের কার্য্যপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। কেননা সাভিনিবেশ শ্রোতৃবৃন্দেরা অর্দ্ধঘণ্টা কাল নিঃশব্দে পাঠ শুনিলে পাঠকের অপরিবর্ত্তনীয় নিদ্রাকর্ষক স্বরে গুরু মহাশয় ক্ষণিক মহানিদ্রায় মগ্ন হইতেন। সতত কলহশীল বালক বর্গের শ্রুতিকটু কলরবে সহসা চেতনা লাভ করিয়া অমনি ধৃতবংশশীখ হইয়া মুখ বিনিঃসৃত জঘন্য পিণ্ডদানে শূদ্র বালকদের পিতৃবর্গের পরিতর্পণ করিয়া অপরাধী নির্ব্বিশেষে বেত্র বর্ষণ করিতেন, তখন যদি সৌভাগ্য ক্রমে সদ্য নিদ্রোত্থিতের পরিধেয় শ্লথ হইয়া কটিভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইত তবেই দুই একজন "যং পলায়তে স জীবতি" প্রত্যক্ষ করিত নচেৎ বক সারসের দশা অপরিহার্য্য, অপ্রতিবিধেয়। যাহা হউক অবহিত থাকিয়া দুই একটা তর্কের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিতাম। একদিন শুনিলাম "পুষ্পক রথ" কি পদার্থ এই লইয়া বাদানুবাদ হইতেছে। কাহার কি যুক্তি, স্মরণ হয় না কিন্তু সিদ্ধান্তটি মনে আছে। "পুষ্পক রথের" চক্রগুলি কদম্ব পুষ্প বিনির্ম্মিত। চূড়া ত্রয়োদশটি রজনীগন্ধের। কিসের রজ্জু, কে বা টানে তাহার নিরাকরণ হইল না কিন্তু আমি শেষ দুইটি মনে মনে স্থির করিয়া লইলাম। তখন আষাঢ় মাস, কদম্ব

পুষ্প ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে পাঠশাল হইতে আসিয়া একগাছি নূতন নারিকেল পত্র শিরা-রচিত সম্মার্জ্জনী হস্তে বাটী হইতে বাহির হইলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে কদম্বমূলে উপস্থিত। কদম্বমূলবিহারী বংশিধর যেমন গোপবধূদিগের পথ চাহিয়া থাকিতেন, আমি সর্ম্মার্জ্জনী হস্তে তদ্রূপ একটি অঙ্কুশীদণ্ডের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কোথাও না পাইয়া অবশেষে সাহসে ভর করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। ইচ্ছামত পুষ্প চয়ন করিয়া অবতীর্ণ হইলাম। অবিলম্বে নারিকেল পত্রশির অবলম্বনে পুষ্পকরথ নির্মাণ করিয়া গৃহে আসিলাম। আমাদের গৃহে একটি জগন্নাথ শুভদ্রার পট ছিল। অপরাহ্নে সেইখানি লুপ্তভাবে লইয়া পুষ্পকের দেবথানস্থ সাধন করিলাম। সে দিন পাঠশালা যাওয়া হইল না। গ্রামে কতিপয় কৃত পাটশালাবিস্থ তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি অপরাহ্নে ধাউষঘুড়ি উড়াইত। আমি পুষ্পক লইয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে সারথি পদে বরণ করিলাম, সে ঘুড়ির পশ্চাতে রথ সংযোজনা করিয়া আকাশ পথে ছাড়িয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে গ্রন্থি চ্যুত হইয়া পুষ্পক ভূতলে পড়িল। কিন্তু পট কোথায়? ভাবিলাম যেরূপ দৃঢ়ভাবে সূত্রবদ্ধ করিয়া দিলাম তাহাতে বাতাসে খুলিবার নহে। তবে দেবত্রয় সকাশে স্বর্গে উপস্থিত হইয়া রথ ফিরাইয়া পাঠাইয়াছেন সন্দেহ নাই। তখন মনে বড় ভয় হইল। তখন জ্ঞান হইল দেবতাদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়া কি কুকর্মই করিয়াছি। পিতামহী স্নানান্তে প্রতিদিন ঐ মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীক্ষেত্রের প্রসাদ গ্রহণ করেন। বড় বধূ ঠাকুরানী খোঁকাকে দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় ঐ মুগ্ধকরী মূর্ত্তির বিভীষিকা দেখাইয়া তাহার রোদন সম্বরণ করাইয়া থাকেন। আবার নূতন সম্মার্জনী গাছি নিঃশেষ করিয়াছি, কল্য আর নিস্তার নাই। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিলাম। তখন মনে হইল পাঠশালায় যাই নাই। গুরুমহাশয় কল্য অনুপস্থিতির শোধ লইবেন। বাটীতেও সম্মার্জনীর শোধ লইবে। কিন্তু সম্মার্জনীর শোধ লইবে কি প্রকারে? আমি এক গাছি ভাঙ্গিয়াছি উহারা আমার পৃষ্ঠে একগাছি ভাঙ্গিবে! ভাল, পিতামহী কি শোধ লইবেন? কেন, আমার হস্তপদের বিকার জন্মাইয়া আমাকেই জগন্নাথে পরিণত করিবেন? কিন্তু গুরুমহাশয়ের, কিছু ধার করি নাই, তিনি কিসের শোধ লইবেন? আর কি বা লইবেন? আকাশ পাতাল ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না ভাবিতে ভাবিতে গাত্রদাহ আরম্ভ হইল, ক্রমে স্পষ্ট জ্বর হইল। নানা বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, পুষ্পক রথ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। ভাবনা হইল আমি পুষ্পকরথ নির্ম্মাণ করিয়া হয় ত বিশ্বকর্ম্মার অন্নে ধূলা দিয়াছি। সৃষ্টিকর্ত্তার কারখানায় বিশ্বকর্ম্মার যে চাকুরি ছিল, হয়ত সেটি গেল ভাবিয়া বিশ্বকর্ম্মা আমাকে অভিশাপ করিবেন। আবার ভাবিলাম, তাঁহাতে পদচ্যুত করিয়া

স্বয়ং সেই পদে অভিষিক্ত হইতে পারি, তবে ত তাঁহার বিষদন্ত ভাঙ্গা পড়িল। আপীসের বড় সাহেবের দক্ষিণহস্ত হইয়া একটা অকর্মণ্য ভৃত্যের কাছে ভয় কিসের? সে অভিসম্পাত মন্ত্রমুগ্ধবৎ হীনবীর্য হইয়া যাইবে। আমার তখন আশঙ্কা ঘুচিয়া আশার উদ্রেক হইল। উল্লাসে আকাশে উঠিতে লাগিলাম। কিয়ৎ দূর উঠিতে না উঠিতে দেখিলাম, একটা কি জীব পক্ষ বিস্তার করিয়া বেগে অবতীর্ণ হইতেছে। সেই বৎসর একজন পাদরী সাহেব আমাদের গ্রামে বাইবেল বিলাইতে গিয়া বলিয়াছিল স্বর্গীয় দূতেরা পাখায় ভর দিয়া ভূপৃষ্ঠে অবতার্ণ হয়। আমি স্থির করিলাম, সেই দূত আমাকেই লইতে আসিয়াছে। আমি জগন্নাথ সুভদ্রাকে মর্ত্তভূমি হইতে উদ্ধার করিয়াছি, তাঁহারা আমার সৎকারে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে রেকমেণ্ডেসন অর্থাৎ অনুরোধ পত্র দিয়া থামিবেন। পূর্বে শুনিয়াছিলাম সাহেবেরা সস্ত্রীক যাহার প্রতি প্রসন্ন হয় তাহাদের চাকরীর ভাবনা থাকে না। দেবতারাও বোধ হয় শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মত সাহেবদের কোন কোন বিষয়ে অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমি তখন আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছি ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতেছি। খেচর আসিয়া বামপক্ষাগ্র দ্বারা আমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিল, "তিষ্ঠ! পৃষ্ঠে একি?" আমি দেখিলাম কিসের ভারে আমার মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। বায়ু আর আমার ভার বহন করিতে পারে না, আমি ভূতলে পতিত হইতে যাইতেছি। অমনি দ্রুততর বেগে আমার বামপার্শ্ব দিয়া নিম্নে গিয়া পুনর্বার দক্ষিণ পার্শ্বে উঠিয়া নিশ্চলভাবে তথায় ভাসিতে লাগিল। আমি ভূ-পৃষ্ঠে দৃষ্টিবদ্ধ লইয়া সেই স্থানে থাকিলাম। যখন দূত নিম্ন দিয়া গমন করে, দেখিতে পাইলাম একটি অগ্নিজিহ্বাকৃতি জ্যোতিঃপদার্থের দুই পার্শ্বে কতকগুলি ভূর্জ পত্রিকা, তালপত্র, পেপাইরস্ ও কাগজের খণ্ড পক্ষপল্লববৎ বদ্ধ হইয়া দুইটি পতত্রের মত দেখাইতেছে। তাহার উপর নানা বর্ণে কি রঞ্জিত ও উৎকীর্ণ রহিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু! তুমি কি অদ্যই অতগুলি চিঠি বিলি করিবে? খেচর হাসিয়া বলিল, 'তুমি বাতুলের মত কি বলিতেছ? তুমি প্রথমে যাহা পতত্র ভাবিয়াছিলে আর এখন যাহা পত্র ভাবিতেছ এগুলি দুই এর একটিও নহে। অন্তরীক্ষে গতায়াত করিতে আমার পতত্রের কিছুই প্রয়োজন করে না। তবে কতিপয় ইয়ুরোপীয় কবি ও তদনুকারী জনকত বাঙ্গালি কবিনামধারী আমাকে পক্ষী বলিয়া স্ব স্ব ভাষায় আমার স্তব করিয়া উপহারপত্র প্রদান করিয়াছে। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আমাকে ঐগুলি পতত্রবৎ সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। ঐগুলি আমার সার্টিফিকেট বলিয়া জানিও। আমি দূত নহি। আমি কল্পনা—দেবকন্যা, আমার রাশি নাম প্রতিভা।" আমার ইচ্ছা হইল ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি। কিন্তু ভূমি পর্য্যন্ত যাইবার শক্তি নাই।

প্রতিভা গণ্ডি দিয়া রাখিয়াছেন। আমার চেষ্টা বৈকল্য দেখিয়া দেবী উচ্চ হাসিয়া উঠিলেন। তাহাতে শত ক্ষণপ্রভা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর জ্যোতির বিকাশ হইল। আমার চক্ষু ক্ষণকালের জন্য নিস্তেজ হইল। দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া ভূপৃষ্ঠের নব ভাব অবলোকন করিলাম। ইতিমধ্যে প্রতিভা আমার পৃষ্ঠের ভার লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি ঐ ঋণের ভার লইয়া স্বর্গে যাইতেছিলে? অব্যবসায়ি! লগেজ লইয়া কি সেখানে যাওয়া যায়? তোমার কেহ উত্তরাধিকারী আছে? যদি থাকে তাহার ঘাড়ে বোঝাটি চাপাইয়া দিয়া তাহার পর পূর্ণ মূল্যে টিকিট কিনিতে পার যাইতে পাইবে নচেৎ তোমাকে ত্রিশঙ্কুর মত পথে থাকিতে হইবে। কথা সমাপ্ত হইবামাত্র আমি ভূতলের পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর করিলাম। দেখিলাম সহস্র সহস্র লোক মোট মাথায় করিয়া ছত্র বা শীতবস্ত্রে মোটগুলি ঢাকিয়া তীর্থ যাত্রা করিতেছে। দেখিলাম, যাহাদের বোঝা যত বড় তাহাদের শরীর ও পরিচ্ছদ তত সৌখিন; যাহারা অপেক্ষাকৃত সামান্য লোক তাহারা খালি গায়ে শরীরে বাতাস লাগাইতে লাগাইতে দুই হাত নাড়িতে নাড়িতে চলিতেছে। আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। কোন্ তীর্থে যাইতে এ ব্যবস্থা পালন করিতে হয়, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। করুণাময়ী প্রতিভা আমার সংশয় যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া বলিলেন, 'তুমি যে বোঝা দেখিতেছ ও সকলই ঋণের বোঝা। যাহারা ভদ্র বলিয়া সমাজে আখ্যাত, তাহারা পসার নষ্ট হইবে বলিয়া কেহ ছাতা অন্তরাল দিয়া কেহ বা শাল চাপা দিয়া চলিয়াছে। দেখিতেছ, যাহারা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইতেছে উহাদের মোটগুলি সমস্ত অনাবৃত ও লাল মার্কা দেওয়া। কাগজের লেবেল দেওয়া। তুমি মনে করিতেছ, উহারা পথে পোল টাক্স দিয়া আসিয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে। ও গুলি রেজেষ্টরীর লাল কালী অথবা টিকিটের উপর দস্তখত। উহারা ঠিকানায় না পৌছিলে বোঝা নামাইতে পারিবে না। তবে ছলে কলে ছয় বৎসর পথে কাটাইতে পারে তবেই একরূপ নিশ্চিন্ত। ওদিকে দেখিতেছ কত লোক পথের ধারে মোট নামাইয়া সহযাত্রীকে আপন মোট হইতে জল খাবার বাহির করিয়া খাওয়াইতেছে ও আপনারাও খাইতেছে। ঐ সহযাত্রীগণ উহাদেরই মহাজন। উহারা জল পান করিয়াই আপন ভার কমাইতেছে। যাহারা এই পর্বের দিনে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ফুলের গড়ে গলায় পরিয়া আমোদের পরিমল ছড়াইয়া যাইতেছে, ওগুলি ফুলের গড়ে নয়; হাণ্ডনোটের নকলগুলি হার করিয়া পরিয়াছে। যাহারা তীর্থভূমি হইতে ফিরিতেছে উহাদের মধ্যে অনেকেই রিক্ত হস্ত নহে। কেহ সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া একখানি পরীর পট ক্রয় করিয়াছে। উহারা সকলেই বংশজ ব্রাহ্মণ। উহারা পৈত্রিকভূমি বিক্রয় দ্বারা ঋণভার লাঘব করিয়াছে, শেষে হয়ত উদ্বৃত্ত আটশত

টাকায় একটি সতের মাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ভিক্ষুকের কমণ্ডলুর ন্যায় তাহাই হস্তে করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। দুই চারিজন চাসা তীর্থ ভূমির বাজারে শীল নোড়া কিনিয়া ঘাড়ে করিয়া আসিতেছে। ভাবিতেছে ইহাতে দুই তিন পুরুষ কাটিয়া যাইবে। ঐ তীর্থ ভূমি দেনা পরিশোধের ধার্য্য দিবস ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর ঐ অল্প বুদ্ধি ঋণগ্রাহকগণ অধিক সুদে অর্থ গ্রহণ করিয়া অবশেষে সর্বস্ব বন্ধক দিয়া আপন গলে আপনি পাথর বাঁধিয়াছে। আবার দেখিতেছ কতকগুলি অকর্মণ্য বাবু নূতন ফ্যাশনের এক চক্রগাড়ী চড়িয়া ইক্ষুদণ্ড মর্দনকারী কৃষকের ন্যায় পদ চালনা করিতে করিতে ছুটিতেছে। মনে করিতেছে কি অপূর্ব্ব সুখ! অশ্ব চাহি না, সহিস চাহি না, সারথী চাহি না, অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। উহারাই ভাণ্ডার শূন্য করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা দিয়া কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়াছে। উহাদের নিজের ঘাড়ে মোট নাই। যাহা আছে তাহা রেলের গাড়ীতে বা ডাকে গিয়া পৌঁছিবে। যাহারা মোট বহিবার ভার লইয়াছে তাহারা মোট স্পর্শও করে না। কলের বলে মোট ভারী বলিয়াই বোধ হয় না। কিন্তু বাবু স্বয়ং যে চক্রে আরোহণ করিয়াছেন সে চক্রের সৃষ্টি কর্ত্তাই তাহার গূঢ় জানেন। তাহার কৌশলকে ধন্যবাদ! বাহক চাহি না! অশ্ব চাহি না! সারথী চাহি না! দাওয়ান চাহি না, মুহুরী চাহি না, সরকার চাহি না এমনই কল, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে, যখন ইচ্ছা সুদ লইবে। কিন্তু চক্র একবার একপাশ হইলে যে হস্ত পদ ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাতে আরোহীর লক্ষ্য নাই। তখন যে স্প্রীং সেই স্প্রীং থাকিবে, চক্র যেমন অটুট সেই অটুটই থাকিবে, লাভের মধ্যে আরোহী চলংশক্তি-রহিত হইবে। শ্রমদ্বেষী বাবু তাহা একবারও ভাবিলেন না। নূতন ফ্যাসনের চক্রে চড়িয়া একবার সাধ মিটাইবেন।

আবার নব্য ভদ্রসম্প্রদায়ে নূতন রকমের বোঝা বহিবার ঝাঁকা উঠিয়াছে; উহারা একখানি কাপড় হাতে লইয়া যাইতে লজ্জায় গতায়ু হইবেন; এক মণ একটা ব্যাগ বা পোর্টমেণ্ট্‌ অনায়াসে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইবেন। সে বোঝা মাথায় বা পৃষ্ঠে লইলে অসভ্য হইতে হইবে। কিছুদূর গিয়া একটি সঙ্গীকে বলিলেন 'ভাই! আমার বোঝাটা একবার ধর ত, আমি চাদরটা খুলিয়া গায়ে দিয়া লই' অথবা "মোজার বন্ধনটা আঁটিয়া লই" অথবা "কোটের বোতাম দিয়া লই।" কতদূর যায় তাহার চাদর আর গায়ে দেওয়া হয় না, মোজা বাঁন্ধা হয় না, কোটের আর বোতাম দেওয়া হয় না। যেমন হইল অমনি অপর কথা উঠিল। সহযাত্রী ভদ্রলোক ব্যাগ ফিরিয়া লইতে বলিতে পারে না। যদি নিজেরই ঐ ব্যাগ হইত তাহা হইলে লইয়া যাইতে হইত না? একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পরোপকার করিলে তাহাতে ধর্ম্মই হয়, ক্ষতি কিছুই নাই। মিষ্টালাপ

করিতে করিতে তীর্থ-ভূমি পর্যন্ত যাইল তখনও ব্যাগ লইবার কথা নাই। সেখানে গিয়া বন্ধুর নূতন আপত্তি উপস্থিত। রাত্রে স্বচ্ছন্দে দশ ঘণ্টার নিদ্রা দিয়া প্রাতে ফিরিবার সময় বলিলেন কল্য হাতের বেদনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। ভদ্র সহযাত্রী কি করিবেন, ব্যাগ আবার ঘাড়ে করিয়া চলিলেন। উহাদিগকে চিনিতে পার ? উহারা ঋণ লইবেন তাহার রসিদ চাহিলে অভদ্র বলিয়া লোকের নিকট কুৎসা করিবে। সুদ চাহিলে সুদখোর বলিয়া তিরস্কার করিবে। টাকা পরিশোধের সময় উপস্থিত হইলে কত লজ্জা, নিদ্রাভাব প্রকাশ করিবে, কত নূতন বিপদ জানাইবে। ভদ্রলোক কি করিবে ? আবার অর্থ দিয়া নূতন বিপদে বন্ধুর সহায়তা না করিলে থাকিতে পারে না। বন্ধু কিন্তু ভদ্রলোকের যথার্থ কষ্ট চক্ষে দেখিয়াও দেখিবে না। ভদ্রলোক যদি আবার একটু অর্থবল সম্পন্ন হইল তবে দুইবার তাহার বলের প্রশংসা করিয়াই সমস্ত পথ বোঝা বহাইয়া চলিল। আবার দেখ ঐ যাত্রীদের সঙ্গে দুই চারি জন পেশাদার মুটে পর্ব উপলক্ষে কুটুম্ব বাড়ীর তত্ত্ব আন ও সন্দেশ বাঁকে করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে সন্দেশের থাল হইতে দুই চারিটি সন্দেশ ও আমের ডালা হইতে বাছিয়া বাছিয়া আম তুলিয়া খাইতেছে, উহারা ভাড়া লইবে আর দ্রব্যও ঠিকানায় পৌছিয়া দিবে তাহার অন্যথা করিবে না, উহাদিগকে চিনিতে পার ? উহারা চিরকাল পরের পুস্তক লইয়া পাঠ করিয়া থাকে। যদি নাটক পড়িতে লইয়া দুই একটি ভাল গীত পাইল তবে সে পাতাগুলি ছিঁড়িয়া লইবে অথবা অপর পুস্তকে দুই একটি ভাল প্রয়োজনীয় বিষয় পাইল তবে তাহার অধ্যায়কে অধ্যায় খুলিয়া লইয়া যথাসময়ে পুস্তক ফিরিয়া দিল।

তুমি মনে করিতেছ গুরমহাশয়ের কিছু ক্ষতি কর নাই, তিনি কিসের শোধ লইবেন ? মূঢ় ! তুমি জান না যাহাকে গুরমহাশয় মনে করিতেছ তিনি স্বয়ং সমালোচক অবতার। তোমার মত কলাপেতে পড়ো হয়ত তাঁহার চক্ষেই পড়িবে না। কিন্তু যদি পড তবে তাঁহার বংশ প্রচলিত দণ্ডে বিদ্যার চরম ফল কল্যই লাভ করিবে। পিতামহী ঠাকুরাণীর মোকদ্দমায়ও গুরুমহাশয়ের ধর্ম্মাসনে বিচার হইবে। দেখ ! সম্মার্জ্জনীর রথে চড়িয়া জগন্নাথ সাজিতে হয় বুঝি। আমি প্রতিভাকে একখানি প্রশংসা পত্র দিবার মানস করিলাম। বুঝিতে পারিয়া বলিল। "ছাপাইয়া প্রবাহে উড়াইয়া দিও। আমি ধরিয়া লইব" এই বলিয়া আমার গণ্ডী মোচন করিয়া দিল। আমি দেখিলাম নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া ঘর্ম্ম দিয়া জ্বর ত্যাগ হইল। ইতি

"প্রবাহ পত্রিকা"

১লা ভাদ্র ১২৮৯।

বিষ্ণু নারদ সংবাদ (শ্রীযুক্ত সত্যনিধান ন্যায়াত্ন)···১৫৫-১৫৮

বৈকুণ্ঠধাম,—বেলা ঝিকিমিকি—বড় গ্রীষ্ম; তুলসীতলায়, লক্ষ্মীর উরুদেশে মস্তক রক্ষা ক'রে অনাদি অনন্তদেব বিষ্ণু কিঞ্চিৎ আরাম করতেছেন। তুলসীপত্রের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে ঠাকুরের তন্দ্রা আসছে। ঠাকরুণ অন্যমনস্কভাবে ভগবানের পাকা চুল তুলছেন। এক গাছ,—দুই গাছ—তিনগাছ,—ক্রমে নখর বৃদ্ধি। অনেক বয়স কিনা, প্রায় সব চুলগুলিই পেকেছে তথাপি দেবী তুলতে ছাড়েন না! স্বামীর চিরযৌবন কোন্ স্ত্রীলোক না ইচ্ছা করে? ঠাকরুণের চক্ষে কিঞ্চিৎ ঘোলা পড়েছে, সূক্ষ্ম নজর হয় না, একটু ঝাপসা ঠেকে কাঁচা পাকা সব সময় ঠিক করতে পারেন না-- এক একবার কাঁচায় টান পড়ছে, ঠাকুর অমনি চমকে উঠছেন; তবু তাকাবেন না, পাছে আরামটুকুর ব্যাঘাত জন্মে। দেবদেবীতে আছেন ভাল। উভয়ের এই ভাব, এমন সময় বৃদ্ধ দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে তান ধ'রে, মুখে গুন গুন স্বরে হরিগুণ গাথা গান ক'রতে ক'রতে ঢেঁকীর পৃষ্ঠে কশাঘাত ক'রে আকাশ মার্গে শাঁ শাঁ শব্দে এসে তুলসীতলায় উপস্থিত।

ভক্তের মুখে নিজ গান শুনে ঠাকুরের তন্দ্রা ছুটে গেল—হাঁই তুলে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। লক্ষ্মী আঁচল দিয়ে বিষ্ণুর চখের পিঁচুটি মুছে দিলেন। দেব বড়ই খুশী। প্রেমে গদ গদ; প্রেমের বেগ একটু সামলে, নারদের প্রতি ক্ষণকাল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেবাদিদেব জিজ্ঞাসা করলেন। "বাপু নারদ! ভবের সংবাদ কি?"

নারদ কথঞ্চিৎ রুক্ষভাবে কহিলেন "ঠাকুরের কি একটুও দয়া মায়া নাই! ধন্য যাহোক! আপনার দয়া মায়া যত তা কৃষ্ণলীলাতেই প্রকাশ আছে! এই তেঠেঙ্গে ঢেঁকীতে চড়ে আকাশ পথে 'হাঁকোচ কুঁচ হাঁকোচ কুচ' ক'রতে ক'রতে এত পথ এলাম একটু হাঁপ জিড়ুতে দিন! বিশেষতঃ কদিন থেকে আমার বাহনের তস্য ঘর কিঞ্চিৎ শিথিল হওয়ায় চলাফেরার বড়ই মুস্কিল হয়েছে, ঠাকুর বড়ই মুস্কিল! বেতো ঘোড়া কি পশ্চিমে এক্কায় চড়লে যেমন গা গতর বেদনায় অস্থির হ'তে হয়, আমার বাহন শ্রীমান ঢেঁকী অবতারও ঠিক সেই রকম হয়ে পড়েছে। ঠাকুর একটু ঠাণ্ড হতে দিন। তায় আবার যে গরম পড়েছে, বাপ, শরীরের রক্ত সব ঘাম হয়ে গেল; তাই বলি ঠাকুর ঠাণ্ডা হতে দিন।

বিষ্ণু। ভাল নারদ! তোমাকে লোকে যে ঝগ্‌ড়ার গুরু বাচাল ঠাকুর বলে সে কথা মিথ্যা নয়। তুমি ঝগ্‌ড়া টেনে আন, তুমি এত বক্‌তে পার্‌লে, আর আমার কথায় উত্তর দিতেই তোমার যত ক্লেশ হল!

নারদ। হুঁ! ঠাকুরের খুব অভিমান টুকু আছে দেখ্‌ছি!

লক্ষ্মী। আহ! বাছার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে,—তুমি তুলসীতলায় এস, তুলসীর ঠাণ্ডা বাতাসে তোমার শরীর ঠাণ্ডা হবে এখন!

নারদ। মা! আমি তোমার মধুর বচনেই ঠাণ্ডা হয়েছি।

বিষ্ণু। নারদ! তোমার পৃষ্ঠবল বড় জাঁকালো। যখন স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী তোমার সহায়, তখন আর ভাবনা কি?

নারদ। ঠাকুর! লক্ষ্মী যদি আমার সহায় হলেন, নারায়ণ কি আমার পর!

লক্ষ্মী। নারদ! তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুণের মিষ্টতাও বৃদ্ধি হ'তেছে! তা যা হোক, দেব যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর প্রদান করে সকলকে সুখী কর। তোমার বচন সুধা স্বরূপ। ভারতের সংবাদ বল শুনে আমরা সুখী হই।

নারদ। ভারতের কথা শুনে যদি আপনি সুখী হতেন তবে আর আপনি ভারত ছাড়তেন না। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, এক বাঙ্গালা দেশের ভাব দেখেই আমি অবাক হয়েছি।

লক্ষ্মী। সে কি?

নারদ। সে কি আবার? আপনি ত বঙ্গদেশ একবারে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন হাতে হাতে তার ফল ফল্‌ছে;—অজন্মা আর দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। দেশের বনিয়াদী ঘরগুলি সব ক্রমে দেউলে হয়ে গিয়েছে; বাঙ্গালায় আর ধনী নাই বল্যেই হয়। যে দুই একজন চুরি চামারি ক'রে অথবা তিসি, মুগ, কলাই বেচে কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় ক'রে অবশেষে মাটি কিনে জমিদার হতেছে, তাদের এক নূতন রোগ এসে আক্রমণ করেছে—সে রোগের নাম 'উপাধি আকাঙ্ক্ষা।' 'উপাধি আকাঙ্ক্ষা' যাকে একবার ধরে তার আর নিস্তার নাই। এ রোগে হাত খুলে দেয়। যার কাস্মিনকালে হাতে জল সরে না, এই রোগে ধর্‌লে তার হাত গড়ের মাঠের ন্যায় দরাজ হ'য়ে যায়। খয়রাত—খয়রাত—খয়রাত, এইমাত্র মুখে বুলি হয়। লাক টাকা, লাক টাকা, লাক টাকা এক এক ঝোঁকে দান করে ফেলে। ইংরাজ রাজ এ রোগের চিকিৎসক। রোগের ক্রম বুঝে এক একটি বটিকা বিধান করেন। কোন বটিকার নাম 'রায় বাহাদুর', কোন বটিকার নাম 'সি. এস. আই.' ইত্যাদি এক একটি বটিকার পৃথক পৃথক নাম। একটি বটিকায় রোগের উপশম হয় বটে পুনর্ব্বার দেখা দেয়; তখন চিকিৎসক ইংরাজ রাজ আবার

একটি তীব্রতম বটিকা ঝাড়েন। এইরূপ যাবজ্জীবন। জমিদার বটিকার পর বটিকা সেবনে ভোঁ হয়ে থাকুন,—এদিকে লোহার সিন্দুক খালি আর প্রজার সর্বনাশ।

বিষ্ণু। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক) তাইত!

নারদ। আর ঠাকুর 'তাই ত'! আপনি চোখ খুলে মোটে তাকাবেন না, ঠাকরুণকেও একবার ছেড়ে দিবেন না, এতে আর সংসার চলবে কেমন করে?

বিষ্ণু। বাপু নারদ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর পেরে উঠি না, এখন একটু আয়েস কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে, এতে বাপু চটো না। ছেলেটা এখন উপযুক্ত হয়েছে, তার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

নারদ। আপনি তাকে রিকল করুন। সেটা নেহাৎ বয়াটে হয়েছে, আর তার তেরেন্দাজীতে আবালবৃদ্ধ বনিতা, দেশশুদ্ধ লোক অস্থির। দেশ ডুবলো, আর থাকে না।

বিষ্ণু। হা, হা, হা,—তাই ত। বলি নারদ, স্ত্রীলোকদিগের খবর কি?

লক্ষ্মী। হাঁ বাছা! বল, আমার মেয়েরা কেমন আছে?

নারদ। ঠাকরুণ, তাদের মনে পড়েছে, তবু ভাল!

লক্ষ্মী। বলি, তারা ভাল আছে ত?

নারদ। খুব রঙ্গে আছে।

লক্ষ্মী। সে কি নারদ? রঙ্গ কি? বলি ভাল আছে ত?

নারদ। হো! হো! হো!—(বীণা লইয়া) তবে আয় রে বীণা, একবার বঙ্গ নারীর গুণ গাই। উহুঁ—সুরে মেলে না,—বেসুরা; খঃ খঃ খঃ—ওঃ উৎকাশি! বঙ্গনারী! (সুর তুলিয়া) তবে আয় রে বীণা—খঃ খঃ খঃ! অধঃপাতে যাও—(দূরে বীণা নিক্ষেপ) ওঃ! বেটীদের নামে বেসুরা হয়ে যায়। কাশতে কাশতে বুড় প্রাণটা গেল!

লক্ষ্মী। (সস্নেহে) আহা! বাছা! তোর বুকে একটু তেল দিব? মাথায় একটু জল দিব! আহা, চোক মুখ রাঙ্গা হয়েছে!

নারদ। ঠাকরুণ, মাগীদের নামে!

বিষ্ণু। নারদ, স্ত্রীলোক অবলাজাতি তাদের উপর তোমার এত রাগ কেন?

নারদ। আরে ঠাকুর, যাও, আপনিই ত তাদের আস্কারা দিয়েছেন! আপাততঃ দেশ ডুবলো!

বিষ্ণু। নারদ, সোজা কথায় সব খুলে বল।

নারদ। ঠাকুর, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌তে পারিনা। অনেক কথার কথা;

কিন্তু সংক্ষেপে যতদূর পারি, বলি শুনুন: সরস্বতী ঠাকরুণের বরপুত্র বঙ্কিম, গোটা কতক ছুঁড়িকে ইংরাজী ধরণের শিক্ষা দিয়ে আর নিজের মনের মত সাজিয়ে দেশে ছেড়ে দিয়েছেন। আসমানি, কমলমণি, মৃণালিনী প্রভৃতি ছুঁড়িদের নাম। ঘোমটা খুলে মাজা দুলিয়ে ছুঁড়িরা বঙ্গের ঘরে ঘরে যাচ্চো, আর স্বদেশিনী ভগ্নীগণের মন হরণ করুছে। তাদের কথাবার্ত্তা শুনে অপর বাহ্যিক হাবভাব দেখে বঙ্গনারীগণ মোহিত হয়ে তাদের অনুকরণ করছে। এইরূপে নবযুবতীর দল এখন 'বঙ্কিমী' হয়ে উঠেছে, পুরুষগণ অস্থির। আসমানি রাঁড়ি একদিন ইয়ারকিচ্ছলে বিদ্যাদিগ্‌জের গায় পানের পিক্ ফেলে দিয়েছিল, সেই অবধি বঙ্গীয় নারী বোকাবেশে পুরুষ দেখলেই গায়ে পানের পিক্ ফেলে দিয়ে মজা দেখে। কমলমণি স্বামীর গালে একদিন ঠোক্‌না মেরে ছিল, সেই অবধি নববঙ্গীয় স্বামীর দল ঠোক্‌নার জ্বালায় অস্থির! ঠাকুর আমার সঙ্গে নেমে চলুন, এখনি দেখতে পাবেন যে সমগ্র বঙ্গীয় যুবকের গালে দাগ। রঙ্গিনীদের অনিবার ঠোক্‌নার ঘায় বাছাদের গালে কালশিরা পড়েছে।

বিষ্ণু। হো! হো! হো! বাপু নারদ, বল, বল, বল।

নারদ। ঠাকুর, ব'লব কি মাথা মুণ্ডু! মৃণালিনী নামে বঙ্কিমের একটি মেয়ে একদিন চুল এলো ক'রে রাত্রিতে একটা পুকুরের ধারে বসে ছিল, তদবধি ধাড়ী ধাড়ী মাগীগুলো চুল বান্ধা প্রায় বন্ধ করেছে!

লক্ষ্মী। বল কি?

নারদ। ঠাকরুণ, যদি বেলা দশটা অথবা চারিটার সময় কলিকাতার হেদোর ধারে একবার গিয়ে দাঁড়ান, ত দেখবেন যে বেথুন বিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক ছাত্রী, পূর্ণযৌবনা, পালিত সুন্দরী—কিন্তু এলোকেশী।

লক্ষ্মী। বটে!

নারদ। আজ্ঞা হ্যাঁ।

বিষ্ণু। হো! হো! হো!

নারদ। ঠাকুর আর হাসবেন না। দেশ ডুব্‌লো, ডুব্‌লো! মাগীরা মদ্দা হয়ে উঠলো এখন তার একটা উপায় কর।

বিষ্ণু। আচ্ছা নারদ,—বঙ্গের পুরুষেরা এ সম্বন্ধে কি কচ্চো?

নারদ। করবে আর কি—মাথা আর মুণ্ডু! —তাদের কি আর কিছু ক্ষমতা আছে? তারা ভেড়ার মত মাগীদের আজ্ঞা পালন কচ্চো। ওট বল্যে উঠছে, ব'স বল্যে ব'সছে, জুতা, মোজা, জামার খরচ জোগাতে জোগাতেই বাপাজিদের জিব বেরিয়ে পড়ছে তবু হুকুম তালিম কত্তো পিছ পা নন। মিনসেরা যদি মানুষ হত তা হ'লে কি

আর মাগীদের এত আস্ফালানি থাকৃতো ?

লক্ষ্মী। ভগ্নি সরস্বতী এত দিনে করলেন কি ? আমিই যেন দেশ ছেড়েছি. কিন্তু তিনি ত এখনও সেখানে আছেন।

নারদ। আর তাঁর সেখানে থেকে কাজ নাই—তিনি যত কাজের লোক বুঝা গেছে—তাকে ত্বরায় ডেকে আনুন। তিনি এখন আগুনে ঘি ঢালছেন। ঠাকরুণের বয়স হয়েছে, কিন্তু এখন তাঁর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই ; —নবীন ছোকরা চোখে পড়লেই তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। তার ফল, প্রায় দেশ শুদ্ধ লোক কবি হ'য়ে উঠেছে। কাব্য ও উপন্যাসের ছড়াছড়ি। ছোক্‌ড়া বয়সে কবি হয়ে ছোঁড়াগুলো ছুঁড়িদের 'দেবী, সম্বোধনে অনবরত পূজা কচ্চো। "একে মন্‌সা তায় ধূনোর গন্ধ !" তাতে ক্রমেই রমণী কুলের স্পর্দ্ধা বেড়ে উঠ্‌ছে ! এর ফল যে বিষময় হবে তার আর সন্দেহ কি ?

লক্ষ্মী। তাইত, নারদ, এর উপায় কি ?

নারদ। উপায় আর কি, ছাই আর ভস্ম। আপনারা একবার ভুলেও তাকাবেন না ! যার যা ইচ্ছে তাই কচ্চো।

বিষ্ণু। তাই ত ভারী মস্কিল দেখ্‌ছি। —আচ্ছা বাপু. যারা আজকাল বিলেত থেকে ফিরে আসছে, তারা কর্‌ছে কি ?

নারদ। কর্‌ছে আবার কি ! ঠাকুর যেন কিছুই জানেন না ! ধন্য আপনাকে, সবই জানেন. কেবল ছল ক'রে জিজ্ঞাসা করা মাত্র। আপনি কি জানেন না যে তারা পুঁজির উপর এক কাটি ? তারা আবার মাগীদের তুরুকসোয়ার বারবার চেষ্টায় আছে।

বিষ্ণু। কি, কি বল্যে ? কি বল্যে ? তুরুকসোয়ার ? সত্য না কি ? হোঃ হোঃ হোঃ !

লক্ষ্মী। ও মা ছিঃ কি লজ্জা !

বিষ্ণু। নারদ, আমি নানা স্থানে নানাবিধ লীলা করেছি, বৃন্দাবনে আমার ঢের কাণ্ডকারখানা আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হচ্যে। গোপবধূগণের সঙ্গে আমি কত আহ্লাদ আমোদ করেছি—উভয়ে ডালে ব'সে দোলন পর্য্যন্ত খেয়েছি, কিন্তু গোপীদের তুরুকসোয়ার বারবার ইচ্ছা ত কখন স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। স্ত্রী লোক তুরুকসোয়ার ! বঙ্গনারী তুরুকসোয়ার ! রুদ্রদেব ! কোথায় তোমার ত্রিশূল ? ইন্দ্র কোথায় তোমার অশনি ?

(আকাশ অন্ধকারে পূর্ণ হইল, মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, বড় বড় শব্দে বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল !) যবনিকা পতন।

১৪

ভাই হাততালি

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

ভাই হাততালি! তোমার দুটি হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও, তোমার চট চট গর্জ্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিডম্বনায় অগাধজলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত আডম্বর কেন?

তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্তের মাটি করিয়াছিলে। সেই প্রশস্ত হৃদয়, সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই আশা ভক্তি, সেই প্রবলা নিষ্ঠা, সেই আনন্দের ব্রহ্মানন্দ। তোমার চাটু-পটু চট চটিতে সে হেন কেশবচন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল, পদস্খলিত হইয়াছিল, তাঁহার শরীর অবশ করিয়াছিল। ভাই! এমনই করিয়া কি বাঙ্গালার মুখ হাসাইতে হয়। কালামুখ হাততালি তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীর গর্জ্জনের তাডনায় দুর্জ্জয় কেশবচন্দ্রের তির্য্যক গমনের কথা ভাবিতে গেলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প হয়। প্রথম সেই সুন্দর, গৌর, সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তির ছদচ্ছাদিত সেই দেবব্রত, উপাসনা রত, নিষ্ঠাপূর্ণ, ভক্তিভর হৃদয়ের কথা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে সেই কূট-দর্শন-তর্ক-ভেদকারিণী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রালোচনায় যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর অবিরাম ধর্ম্মালোচনা, সেই উজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ কারিণী উদ্দীপনা—সকলই মনে আসে। তাহার পর তোমার তালি-তাড়িত বায়ুবিগুণে, সেই ধীর প্রশান্ত মানবের, তখন ভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় বিপক্ষেবিপথে, কেন্দ্র হইতে দূরে বিদূরে হিমপরিপূরিত নীহারিকাময় গগনে প্রান্তে পরিভ্রমণ সকলই মনে পড়ে। তখন ভাই হাততালি তোমার কৃতিত্ব চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তোমাকে ভাই বলিতে লজ্জা হয়; তোমার কৃতকার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আর তুমি একটির পর আর একটি, তাহার পর আর একটি এমনই করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের সকল শুভগ্রহেরই নিগ্রহ করিতেছ;—তোমার শান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই, শান্তি নাই। বরং জয়োন্মাদে উল্লাসিত হইয়া দিন দিন আরও বলসঞ্চয় করিতেছ—এই সকল কথা ভাবিয়া মন অস্থির হয়, হৃদয় নিরাশ হয়, প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যে দিন শুনিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়া মানুষকে অতিমানুষ বলিয়া পূজা করিতে লওয়াইয়াছ, আর তাহারা ভক্তিতামসে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া, স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্তের দেবতা বানাইতেছে, তখনই বুঝিলাম দুরাত্মন্ হাততালি তোমার নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে। তোমার চাটু-পটু রসনাধ্বনিতে নর-নারায়ণ অর্জ্জুন বিচলিত হইয়াছিলেন, দুর্ব্বল বঙ্গসন্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশবচন্দ্র য়ুদীয় অবতার খ্রীষ্টের পূর্ণসত্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের বিমল দর্পণে ঈশ্বরের অতুল জ্যোতি উজ্জ্বল কিরণে প্রতিভাত দেখিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে, গভীর গর্জ্জনে সিয়ালদহের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন (Father forgive them; they knownot what they do.) "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।" সেই দিনের সেই ভক্তি হুঙ্কারে উপস্থিত সাক্ষণের পাষাণ হৃদয়ও চমকিত হইয়াছিল, দুর্জ্জয় ইংরেজও সেই ক্ষেত্রে তখন একবার ভাবিয়াছিলেন—বাস্তবিক তাঁহারা যে কি করিতেছেন, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? কেশবচন্দ্রের সেই একদিন—আর সেই কেশবচন্দ্র কয়বৎসর পরে, তেমনই প্রকাশ্য স্থানে, তেমনই জনতা মধ্যে তেমনই উচ্চকণ্ঠে, পাতকি! তোমার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—(yet I am a singular man) "তথাপি আমি একজন বিচিত্র মানব।" য়ুদীয় অবতারের পরিত্যক্ত সেই উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত কেশবচন্দ্র, আর এই গৌরীভার সেন বংশের ধরাতলস্থ কেশবচন্দ্র; সুমেরু কুমেরু ব্যবধানেও এই দূরত্ব পরিমাণের মানদণ্ড হয় না। পোড়া হাতাতালি! তোমার কলঙ্কের কীর্ত্তিতেই না এই কাণ্ড হইল। ইহাতেই কি তুমি ক্ষান্ত হইয়াছিলে? তাহার পর সেই বিচিত্র মানবকে কন্যার সুখ্যাতিলাভে বৈষয়িক করিলে, তাঁহার বক্ষ বিক্ষত করিলে, বুদ্ধি বিড়ম্বিত করিলে,—এখন সে সকল কথা ভাবিতে গেলেও শরীর সিহরিয়া উঠে। তাই হাতে ধরে, ভাই হাততালি তোমাকে বলিতেছি—ভাই দিন কতক তুমি ক্ষান্ত হও। আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিও না।

তোমার আর একবারের কলঙ্কের কথা বলি। বিদেশিনী দুঃখিনী বিদুষী রমাবাই ভিক্ষা করিতে ভ্রাতাসঙ্গে বঙ্গদেশে আসিলেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিতা, ভাগবতে বুৎপন্না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, পরিশ্রম নিরতা ও কার্য্যে পটীয়সী। এ জেন স্ত্রীরত্ন ভারতের আদরের ধন, সাধের সামগ্রী, আরাধ্য বস্তু, পূজনীয়া দেবতা। তিনি তখন কুমারী নবদুর্গা; সাক্ষাৎ ভগবতী। কুমারী পূজা ভারতে চির প্রচলিত। কিন্তু অভাগা বঙ্গবাসী তাহার চিরপ্রচলিত প্রথা এইবার পরিত্যাগ করিল। সসম্মানে কুমারীর পূজা করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় দিতে পারিত; তাহা করিল

না ; বুঝিল না। তুমি হাততালি, বালকের সহায়, নবরঙ্গের রঙ্গী ; কিন্তু প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলে তোমাকে সহায় করিয়া রমার তোষামোদ করিল। রমা বিদুষী হইলেও অবলা, পণ্ডিতা হইলেও কোমলপ্রাণা, বুদ্ধিশালিনী হইলেও ক্ষীণমতি। কাজেই রমার মাথা ঘুরিল ; মন টলিল ; হৃদয় গলিল , আগুন জ্বলিল ।—সে আগুন এখনও নিবে নাই।

একদিন ছিল, এক সময় ছিল, তখন রমার অগ্রজ সস্নেহ অথচ কর্কশ কণ্ঠে "এ এ রমা" বলিয়া ডাকিলে রমা ভয়ে ভয়ে, ধীর পদবিক্ষেপে, ললাটে নাদবিন্দুধারিণী সাক্ষাৎ গায়ত্রী মত অগ্রজের পার্শ্বে সলজ্জভাবে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি পবিত্র সাবিত্রী বলিয়াই বোধ হইত। সেই রমা তোমার বায়ুবিগুনে বৈদেশিক আসুরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া যে দিন দয়ানন্দ স্বামীকে সাহঙ্কার উত্তর প্রদান করিলেন ; ভারতের গৌরবশ্রী যে দিন সেই উত্তরের অহম্মুখতায় অধোবদনে রোদন করিল ; সেই আর এক দিন—আর-আর—যে দিন সেই রমা বিদেশে, বিবান্ধবে, বিচলচিত্তে বিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—সেই একদিন সেই এক দুর্দ্দিন। তাই বলিতেছিলাম—পোড়া হাততালি তুমি কি সকল সময়েই আমাদের কেবল অহিত সাধন করিবে ? তোমার কি শ্রান্তি নাই, শান্তি নাই, শান্তি নাই।

ভাই হাততালি ! পার যা কর, তা কর, দিন কতক গোটা দুই তিন লোককে স্থির থাকিতে দাও। স্থির হইতে দাও। দোহাই তোমার হাসি মুখের, দোহাই তোমার বিস্ফারিত চক্ষুর, দোহাই তোমার আনত মেরুদণ্ডের, দোহাই তোমার দশ অঙ্গুলির, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই তোমার সহস্র জিহ্বার, দিন কতক গোটা দুই লোককে তুমি স্থির হইতে দাও—তিষ্ঠিতে দাও।

একজন এই সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ তরল, সুরেন্দ্রনাথ চপল ; স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্রনাথ একটুতে চালিত হন, একটুতে তাড়িত হন। স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্র বলিবার সময় কথার ঝোঁক এড়াইতে পারেন না, ছন্দের মায়া ভুলিতে পারেন না, বক্তৃতার লয় তালের জন্য লালায়িত। তবুও সুরেন্দ্রনাথ, দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্য বলেন, দেশের জন্য ভাবেন—আজিকার দিনে, সেকি কম কথা ? স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর। অপরাধ লইও না, সকলে এক একবার আপনার বক্ষে হস্তদান করিয়া উর্দ্ধমুখে বল দেখি, তোমরা কি স্বার্থপর নও। স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর। কিন্তু স্বার্থানুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কি পরার্থ একেবারে ভুলিয়া যান ? তাঁহার চরিত্র যে এরূপ বিসদৃশ তাহা ত স্বীকার করিতে পারিলাম না,—তবে তিনি স্বার্থপর হইলেন ত তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি ? না—ভালতে মন্দতে এখনও সুরেন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব ; জাতির গৌরব ; দেশের গৌরব।

যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়, তবে সে আমাদেরই দোষে হইবে। আর কলঙ্কী হাততালি তোমার দোষে হইবে।

রাজনীতির অকুল-সাগরে সুরেন্দ্রনাথের চপলা-মতি তরণী একটুতেই বিক্ষোভিত হইতেছে; যে পার, সে রক্ষা কর; পাঠাবস্থা শেষ হইতে না হইতে তিনি সিবিল সার্ব্বিশ কমিশনরগণের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত; রাজসেবায় প্রথম বয়সেই চপল স্বভাব নিবন্ধন লাঞ্ছিত; সম্পাদক জীবনের পাঁচ বছর না গত হইতেই সুরেন্দ্রনাথ রচনার অলঙ্কার দোষে কারাবন্দী—যে উঠিতে বসিতে আঘাত খাইতেছে, তাহার রাজনৈতিক জীবন যে কপটতা বা স্বার্থপরতার পরিচ্ছদ মনে করিতে চায় সে করুক, আমরা তাহা করিব না। না সুরেন্দ্রনাথ সত্যসত্যই দেশহিতৈষী—এখনও সুরেন্দ্রনাথ আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব। তাঁহাকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে পারিলে আমাদের দেশের লাভ, জাতির লাভ হইতে পারে—তবে যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়—সে আমাদের দোষেই হইবে—আর কালামুখ তুমি, তোমার চটচটির খরতালে হইবে।

আর একদিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমবাবু বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ষীয়ানগণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের উপহাসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই; তাই হাততালি তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধীরে স্থিরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি তৈল নিবেদিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিবে। সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী,—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্ম-পলাশলোচন সেই ঝামর চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী বিনাম্নিত চিকুল ঝল ঝল মুখ মণ্ডল, সেই রহস্তে আনন্দে মাখান, হাসি খুসী ভরা অধর প্রান্ত সেই সংচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল; তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ্য হস্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতি নিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরেন্দ্র বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গসন্তানের কি তার ধৈর্য্য থাকিবে? তাই স্বীকার করিলাম তুমি

বাহাদুর, তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি, তুমি দিনকতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি ?

নবজীবন। শ্রাবণ ১২৯১। পৃষ্ঠা ৪২৮ হইতে ৪৩২।

১৫
ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী

ভারতবর্ষে কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না স্থির। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্‌সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য্য সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তা এইখানে উদ্ধৃত করি—"প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীন কালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি" !*

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি এইত আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

কোন্ সময়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পূর্ব্বে, কেহ বলে পরে। যদি পূর্ব্বে হয় ত কত পূর্ব্বে ও যদি পরে হয় ত কত পরে ? বহুবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায় ; যথা—

প্রথমত—চারি বেদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব। বেদ চারি কি তিন, এ বিষয়ে

* Memoires of Cattermob Cruikshank Hutchinson. Vol. V. P. 1053. ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকেরা জানিবেন তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাষ্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গালা আমাকে পড়িতে হয় নাই ; কাঁটাগাছের মত বিনা চাষে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে।

কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্তু অনেকেই করেন নাই। বেদ যে তিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে আছে—'ঋষয় স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামজি সাম্নানি।' চতুর্থ শতপথ ব্রাহ্মণে কি লেখা আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদের সূত্র যাঁহারা অবসর মতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাও থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব্ব বেদের সূত্রপাত নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ তিন বই নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কিকি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। বেদে ছন্দ আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোন কথা নাই।* এমন কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতা বশত ভানুসিংহের কোন উল্লেখ নাই।†

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দ বংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে—কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোন কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।* যদি কোন দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিন—তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়—কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন কি মুচকুন্দ, ময়ুর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।*

বিশ্বগুণাদর্শ দেখ—মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

---

* See English Translation of Hitopadesh by H.M. Dibdin. Vol. 3. Page—551.

† কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রমাণিক।

* Vide pictorial Hand book of Modern Geography. vol. 1. Page— 139.

* see Hong, chang-ching. By kong-fu.

দেখ, ইহতেও ভানুসিংহের নাম নাই।*

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কু বেতাল ভট্ট ঘটকর্পূর কালিদাসাঃ

খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈবররুচির্নব বিক্রমস্য।

কই, ইহার মধ্যেওত ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না। P তবে, কোন কোন ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এসন্দেহে নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তির সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়!

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন—দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে। পরম পণ্ডিত বর সনাতনবাবু বলেন খৃষ্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্ব্বলোক পূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপ্যাধ্যায় সরস্বতীর বর পুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃষ্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্ব্বে, না হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোন কোন মূর্খ নির্ব্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোন বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না, যে একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না।

নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।* তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে

* সাহনামা, দ্বিতীয় স্বর্গ।

P Pelerhoff's chromkroptologisheder unterlutungeln.

-রাম। মনে করা যাক, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজ তরঙ্গিনী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃষ্টাব্দের লোক।* তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ভাষায় প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। "গমন করিলাম" হইতে "গেলুম" হয়। "ভ্রাতৃজায়া" হইতে "ভাজ" হয়। "খুল্লতাত" হইতে "খুড়ো" হয়। কিন্তু ছোট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ "পিরীতি" শব্দ "প্রীতি" অপেক্ষা "তিখিনী" শব্দ "তীক্ষ্ণ" অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় "তীক্ষ্ণানি সায়কানি"। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃষ্টের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্ত্তিত হইতে কিছু না হউক দুহাজার বৎসর লাগে।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, খৃষ্ট জন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা খৃষ্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই ত ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্ম ভূমির একটা ঠিক না করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এসম্বন্ধেও মত ভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরম ভক্তি ভাজন রূপনারায়ণবাবু আর একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্ধৃত করিবার কোন আবশ্যকই নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের ওপরে আমার বিন্দু মাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না.

* See the grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language. conjongation of verbs. vol. 3, Page 999.

* History of the Art of Embroidery and crewel work. Appendix.

কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

সিংহল দ্বীপের অন্তর্ব্বর্তী ত্রিনূকমলীতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। "হ" টিকে কেহ বা "ক্ষ" বলিতেছেন কেহ বা "ধ" বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে "হ" তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার "ভ" টিকে কেহ বা বলেন "র্চ." কেহবা বলেন "ক্লৈ," কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, "ভানুসিংহ" শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব ভানুসিংহ ত্রিনূকমলীতে বাস করিতেন, কূপের মধ্যে কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আবার আর একটা কথা আছে। নেপালে কাঠমুণ্ডের নিকটবর্তী একটি পর্ব্বতে সূর্য্যের (ভানু) প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্ত্তিটা পাওয়া গেলনা। পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংশ হইয়াছে; সেই সময়ে ঔরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংশ হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে সিংহের প্রতিমূর্ত্তি-খোদিত ফলকখণ্ড বাহির হইয়া পড়িয়াছে— স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইহা সেই নেপালের ভানুপ্রতিমূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার কোন অর্থই থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্য্যগতিকে নেপাল হইতে পেষোয়ারে যাতায়াত করিতেন কিনা সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। এবং স্নান-উপলক্ষে মাঝে মাঝে ত্রিনূকমলীর কূপে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে। ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্ত বুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশ চন্দ্র বাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা সহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতায় বাস করি— কিন্তু তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ আছে কোথাও কি প্রমাণ সমেত একটা প্রস্তর ফলক পাওয়া যাইত না? শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিনূকমলীর অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়ত বা অন্যান্য মতিমান্ লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্তু এ লেখক বিনীতভাবে তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতাগুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয়বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে। বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি ছিল কি না ছিল তাহাই তাঁরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয় রূপে স্থির করা গেল। তবে, এই ভানুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। হউক বা না হউক সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা ত স্থির হইয়া গেল।

নবজীবন। শ্রাবণ ১২৯১। পৃষ্ঠা ৫৭ হইতে ৬২।

১৩

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকার

বহুকাল হইল, সুন্দর—বন অতি সমৃদ্ধশালী জন পদ ছিল। এখনও তাহার নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। নিবিড় জঙ্গল মধ্যে প্রস্তরময় সোপান শোভিত বৃহৎ সরোবর, কারুকার্য্য খচিত বিশাল শিব মন্দির, ভগ্ন অট্টালিকা সমূহের ক্রোশ ব্যাপী ধ্বংশাবশেষ, সুন্দর বনের যেখানে সেখানে এখনও আছে। ফরাসী রাজধানী পারিস্ নগরে বঙ্গদেশের যে অতি পুরাতন মান চিত্র আছে তাহাতে সুন্দর—বনমধ্যে পাঁচটি জীবন্ত নগরের নাম ও চিহ্ন আছে, আর সুন্দর বনের সমৃদ্ধির কথা বৃদ্ধ জনগণের মুখেও শুনা গিয়াছে। কিন্তু এখন সমস্তই কাল কুক্ষিগত। কিসে গ্রাম নগর গৃহ গোষ্ঠ সমস্তই উৎসন্ন গেল? কেমন করিয়া জনাকীর্ণ জনপদ গভীর নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল?

প্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের যোগীকে ভট্টপল্লীর একজন ভট্টাচার্য্য ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যোগী নিতান্ত স্বল্প ভাষী ছিলেন, উত্তরে বলেন যে, "সুন্দর বলে ব্যাঘ্রা-ধিকার হওয়াতে এবং সুন্দর বনবাসীরা দুর্ম্মতি বশত ব্যাঘ্রধর্ম্ম অবলম্বন করাতে, কালে সুন্দর বন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।"

একথা বড বিচিত্র। ইতিহাসে এরূপ আর কোথাও হইয়াছে কি না জানি না। মনুষ্যে ব্যাঘ্র ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, একথা বিস্ময়কর ও হাস্যকর। কিন্তু আবার পরিণাম ভাবিলে বোধ হয় নিতান্ত বিষাদ পূর্ণ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথাটি যে ভাবে বিবৃত করেন, আমরা সেই ভাবেই বিবৃতি করিবার চেষ্টা করিব। তিনি একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, যদি তাঁহার বিবরণে কার্য্যকারণের পরম্পরা নির্দ্ধারণে কিছু গণ্ডগোল থাকে, তবে তাহাতে তাঁহার 'দিধীত' দায়ী।

এক কালে চন্দ্রদ্বীপের রাজারা বড়ই প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। বঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগ তাঁহারা সমস্তই অধিকার করেন। তখন সুন্দর বন বিলক্ষণ সমৃদ্ধশালী ছিল। সাগর সন্নিকট হওয়াতে বৈদেশিক নৌ-বাণিজ্যের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী জাতীয় নিরীহ বণিকগণ ধান্য-তাম্রকূট, মধু, মোম প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া অতুল সম্পত্তি করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্র-বংশীয় অগণিত কৃষি বলের পরিশ্রমে ভূভাগ সম্বৎসর যাবৎ শস্য শ্যামল থাকিত। ব্রাহ্মণগণ দেব-প্রসাদে ঐহিক চরিতার্থতা লাভ করিয়া পারকালিক সুখাশায় দিনাতিপাত করিতেন। দিবসে প্রান্তরে কৃষকগণের নীরব শ্রম চালনায়, গ্রাম নগরে বাণিজ্যের উৎসাহময়ী নিরন্তর গতিতে এবং রাত্রি চারিদণ্ড পর্য্যন্ত দেবমন্দিরের ও বৌদ্ধ মঠসকলের বাদ্যঘণ্টা রবে সমস্ত জনপদ আকুলিত থাকিত।

সুন্দরবনের পূর্ব্বে পশ্চিমে বন ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা পূর্বদিকের বন কাটিয়া নগর পত্তন করিতে লাগিলেন, পশ্চিম দিকের জঙ্গল তারণা করিয়া নবাগত মুসলমানেরা সেনানিবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন। দুইদিক হইতে তাড়িত হইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি শ্বাপদ সকল সুন্দরবন আক্রমণ করিতে লাগিল। এখন, এই মহামারীপূর্ণ বঙ্গদেশের কোন কোন পল্লীগ্রামে যেমন দিবারাত্রি শৃগালের উপদ্রব হইয়াছে, প্রথম প্রথম সেই সময়ে সুন্দরবনে সেইরূপ বাঘের উৎপাত হইল। তবে শৃগালের উপদ্রব অপেক্ষা বাঘের উৎপাত অবশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর। শৃগালে এখন, ছোট ছেলেটিকে তেল হলুদ মাখাইয়া পীড়ার উপর রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিয়া নব প্রসূতি পুকুরঘাটে গিয়াছে দেখিলে, ছেলেটিকে বনে লইয়া যায়, ছোট বউকে মাছ ধুইতে খিড়কীর ঘাটে নামিতে দেখিলে, পাশের কচু বন হইতে মাছের পেতে মাছ ধরিয়া টানা টানি করে, চৌরী ঘরের মেঝে৹ হইতে পাকা কাঁটাল মাথায় করিয়া পালায়,

কাঁধা কাঁধি করিয়া রান্না ঘরের ঘুল ঘুলি দিয়া ইলিশ মাছের হাড়ি খায়, আবার দুই দশটা হন্যে হইলে যাকে পায়, তাকেই কামড়ায়, বাধা বন্ধক মানে না, লোক-জনকে ভয় করে না, মারিতে গেলে, ঘাড় ফিরাইয়া লাঠি কামড়াইয়া ধরে। এখনকার দিনে এই বিপুল অর্থ ধ্বংসকারী পোলিস্ প্রহরী বেষ্টিত বঙ্গমণ্ডলে, এই বন্দুক-বেটন-সাঙ্গিন প্রবল, সঙ্গিন্ দিনে যখন সামান্য শৃগালের এইরূপ উপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে, তখন, সেই সেকালে, সেই, শ্রেষ্ঠী পৌণ্ড্র পূর্ণ নিরীহ নিবাসে আবাস—তাড়িত ব্যাঘ্রের উৎপাত যে কি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমে ছাগ মেষ নিঃশেষ হইতে লাগিল, তাহার পর গোষ্ঠে আর বৎস-তরী থাকে না, ক্রমে বাথানের গো-মহিষ কমিতে লাগিল, দুটি দশটি করিয়া রাখাল বালক মারা পড়িল, তাহার পর অবেলায়, রাত্রিবেলায়, সকাল বেলায় মাঠে ঘাটে আর কেহ চলে না। ক্রমে গ্রাম নগরেও ঐ সময় চলাচল বন্ধ হইল, কাজেই খর দিনের বেলা ছাড়া আর দোকান পশার হয় না। লোমশ লাঙ্গুল উত্তোলন করতে লক লক করিয়া লালায়িত দংষ্ট্র-জিহ্বার মীন প্রভার শ্মশান আলোকে ভীষণ মুখ মুণ্ডল ভীষণ তর করিয়া, বৃহৎ২ রাজ-ব্যাঘ্র সকল পথে ঘাটে পাঁছাড়ে বিচরণ করিতে থাকে, সহজে ক্ষুদা নিবারণের উপাদান না পাইলে গো-শালের নিকটে ভীম-গর্জ্জন করে, দুই একটি ভীরু গোরু দড়ি ছিঁড়িয়া আগড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে, অমনই ঘাড় ভাঙ্গিয়া পীঠে ফেলিয়া লাঙ্গুল আছড়াইতে২ লম্ফে২ পগারের মধ্যে লইয়া গিয়া উদর পুরিয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। ক্রমে গো-সেবক হিন্দু তাহার বহু অভ্যস্থ হিন্দুয়ানি ভুলিতে লাগিল। রোগা ভাঙ্গড়া গোরু আর গোয়ালে বাঁধিত না; ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের নজরানারূপে তাহাই রাত্রিকালে গো-শালার বাহিরে বাঁধিয়া রাখিত। কিছুদিনে গো মহিষ ছাগ মেষ সকলই প্রায় অৰ্দ্ধসার হইল। দুধত আর মেলেই না, চাষির চাষ বন্দ হইবার উপক্রম হইল, ছোট ছোট ছেলেপিলে দুধ বিনে মারা পড়িতে লাগিল, তখন সুন্দরবন অধিবাসীরা দারুণ অন্নকষ্ট আসন্ন দেখিয়া নানারূপ ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মনুষ্য শরীরে ব্যাঘ্রের মত বল নাই বলিয়া মনুষ্যের এরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে; অতএব শরীরে ব্যাঘ্রের মত বল করা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যাঘ্র লম্ফ, ঝম্প দিয়া চলে ফিরে, তাহাতেই উহাদের অত বল, অতএব লম্ফ ঝম্পে চলাফেরা করা নিতান্ত আবশ্যক। রাত্রিতে উচ্চ প্রাচীর বিশিষ্ট সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে কবাটে লৌহ অর্গল লাগাইয়া বালক বৃদ্ধ যুবা ব্যাঘ্রবৎ হুহুঙ্কারে লম্ফ-ঝম্প করিতে লাগিল দুইদিন এইরূপ হয়, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, আবার দশ দিন কামাই যায়।

ধুতি লটপট করিয়া ত শার্দ্দূল কুন্দন হয় না ; ব্যাঘ্রের মত অঙ্গচ্ছদ করাই ভাল ; তাহাতে নানা দিকে সুবিধা আছে, এক ত ব্যাঘ্র ঝম্পের সুবিধা, গরম কাপড়ে শরীরে বলাধান হয়। তৃতীয় আপাদ মস্তক লোমশ কাপড়ে দেহ মোড়া থাকিলে, ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষা আছে। চতুর্থত ব্যাঘ্র বোধেও ভ্রমক্রমে ব্যাঘ্র হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভোটকম্বলের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত "বাঘ থাব্বা" বানাইয়া সুন্দরবনের তদানিন্তন বুদ্ধিজীবীরও ধনজীবীরা তাহাই পরিধান করিতে লাগিলেন। উহারি মধ্যে একজন সুবুদ্ধি বলিলেন যে লম্ফের সহায় লাঙ্গুঁল, বিশেষ পশু-পাখী সরীসৃপ সকল জীবেরই যখন লাঙ্গুল রহিয়াছে, তখন মনুষ্যেরও থাকা চাই ; তবে যে স্বভাব হইতে পাই, সেটা কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্যে। মানুষের গাত্রে দীর্ঘ লোমও ত নাই তাহা বলিয়া মনুষ্য কি লোমশ অঙ্গচ্ছদ পরিবে না ? সিদ্ধান্ত মত কার্য্য হইল ; শুষ্ক বেতস লতায় কম্বল চির জড়াইয়া তাহাই মনুষ্যের অঙ্গচ্ছেদ মেরুদণ্ডের নিম্নে লাগাইয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞেরা লাঙ্গুঁলের আর্য্যা স্থির করিয়া ছিলেন, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ হস্ত ; পনের বৎসর পর্য্যন্ত এক হস্ত ; তাহার পর—
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে সার্দ্ধাদ্বি হস্তকো ভবেৎ। স্থির হইল, যে ব্যাঘ্রের মত এই লাঙ্গুঁল ভয়ের সময় হাতে ধরিয়া টানিয়া নত করিতে হইবে, লম্ফ-ঝম্প কালে, বেতের রোক ছাড়িয়া দিবে, লেজ বাঁকা হইয়া লক্ লক্ করিবে ; ক্রমে অবশ্যই ইহারা বুঝিতে পারিলেন যে হাতে পায়ে না চলিলে লক্ লকায়িত লাঙ্গুঁলের শোভা হয় না ; বিশেষ হাতে পায় হাঁটিলে অনেক চলা যায়, আর শীঘ্র হাঁপাইতে হয় না—সুতরাং বুদ্ধিজীবীরা হাতে পায়েই চলিতে লাগিলেন।

এইরূপ করিতে২ বুদ্ধিজীবীরা ক্রমেই আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে সম্পূর্ণরূপ ব্যাঘ্র ধর্মাবলম্বী হইলেন। শরীরের পশম নষ্ট করাই ভুল এই ধারণা হইল ; প্রথমে দাড়ি রাখিতে লাগিলেন ; তাহার পর মাথায় বড় বড় চুল রাখিলেন, তাহার পর বাঁকা নখ। কাজেই সঙ্গে২ আঁচড় কামড়ের প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে স্নান আচমনাদি মনুষ্যের অহঙ্কারজাত কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ব্যাঘ্র ভয়েও বটে, ব্যাঘ্র রাজ্যাধিকারী বলিয়া তাহাদের অনুকরণেও বটে, ক্রমে রাত্রিতে অর্গল বন্ধ গৃহে কাজকর্ম্ম হইতে লাগিল। তবে যাতায়াতটা, দিন দুপরে চারি পায়ে, লাঙ্গুঁল নত করিয়াই হইত, সেই সময়ে পথিকেরা কম্বলের 'বাঘ থাব্বার' ছিদ্র প্রসারিত করিয়া মুখ ব্যাদান করিতেন, এবং নিজ২ ভাবে লোলজিহ্বা আকুঞ্চন প্রসারণ করিতেন। উত্তীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইয়া, হুঙ্কারে বসিতেন, "আলুম্" তাহাতে আগমন বার্ত্তাও জানান হইত এবং অবলম্বিত ব্যাঘ্র ধর্ম্মও রক্ষা হইত। বুদ্ধিজীবীগণের দেখা দেখি অনেক গরীব দুঃখীত

ব্যাঘ্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিল ; যাহাদের কম্বল জুটিল না তাহারা নারিকেল ছোলের কাঁথার বাঘথাব্বা করিল, আর কুটীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া রাত্রিতে তাহারই মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

ছাগ মেষ কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্যাঘ্রের মত মাংস না খাইলে শরীরে বল হইবে কি প্রকারে ; অনেকেই আহারার্থ কুক্কুট পালন করিতে লাগিলেন ; কুক্কুটগুলা বাঁধিয়া রাখিয়া, লম্ফ দিয়া তাহাই স্বীকার করা হইত, প্রথমেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া আম রক্ত ভক্ষণ করা হইত, ব্যাঘ্রধর্মবিৎগণ বলিতেন, এমন উপকারী পানীয় আর নাই ; আর মাংসও অনেকে অসিদ্ধ ভক্ষণ করিতেন ; যাহারা ঐরূপ করে তাহারাই ত বলশালী। ভক্ষ্যগুলার অস্থিপঞ্জর গৃহমধ্যে ছড়ান থাকিত, পণ্ডিতে স্থির করিয়াছিলেন যে উহাতে দূষিত বায়ুর দোষ নষ্ট করে এবং গন্ধে বলাধান হয়।

সুন্দরবন স্বভাবের উপবন স্বরূপ ছিল। ক্রমে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল ; জঙ্গলে ব্যাঘ্র বাস করে, সুতরাং মানুষগণেরও জঙ্গলে বাস করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইল। কাজেই কেহ আর জঙ্গল কাটে না ; তাহাতে চাষবাসের হ্রাস হওয়াতে মাঠ-ঘাট সমস্তই জঙ্গল পরিপূর্ণ হইল। কুক্কুট গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল ; গ্রামের নিকটস্থ জঙ্গলে পালে পালে বৃহৎ বৃহৎ কুক্কুটগুলা কেবল 'ক্ক. ক্ক' করিয়া পাখা ঝটকাইতেং উড়িয়া বেড়ায়, আর পালেং বানর ডালেং লাফালাফি করে। এখন ব্যাঘ্র ত সুন্দরবনে রাজ রাজেশ্বর হইয়াছে। ব্যাঘ্র শব্দের পূর্ব্বে রাজশব্দ যোগ না দিয়া, কথাটা মুখে আনিতে কেহই সাহস করিত না। সেই অবধি সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের নাম রাজ বাঘ (Royal Tiger) হইয়াছে। সুন্দরবনের বীরগণ সকলেই তখন 'নর ব্যাঘ্র', নরশার্দ্দূল পদে অভিহিত হইতেন ; এবং ঐরূপ বিশেষণে শ্লাঘা মনে করিতেন। 'বিদ্যাবাগীশ,' 'ন্যায়বাগীশ' উপাধির যে দুই দশজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাহাদিগকে কেহ 'বাঘীশ' বলিলে আহ্লাদিত হইতেন।

সকল পৌণ্ড্রেরা অনেকেই 'বাঘ' 'বাঘেয়া' ও 'বাঘচি' উপাধি পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিল। এইরূপেই রামধন বাগের, এবং কৈলাস বাগতির পূর্বপুরুষের নামকরণ হয়। কোন বিশেষণ শব্দে বা জাতিবিশেষের নামেই যে সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকারের পরিচয় আছে, এমন নহে ; বাগ্ পাওয়া বাগিয়ে পাওয়া ইত্যাদি নূতন ক্রিয়া সেই সময় সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে বাঙ্গালার অভিধান পুষ্ট হইয়াছে। সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকারের আরও বিস্তর প্রমাণ আছে ; এখন যদিও প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে, কিন্তু, তথাপি যে দুইদশজন লোক দেখা যায়, তাহারা অনেকেই ব্যাঘ্র ধর্মাবলম্বী।

সুন্দর বনবাসীরা ব্যাঘ্র ধর্মাবলম্বী হওয়াতে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্য উঠিয়া গেল ;

চাষবাস কমিয়া গেল ; অনেকেই নির্ধন হইল। কেবল লম্ফ ঝম্পেই মন, জ্ঞানচর্চ্চা উঠিয়া গেল, তাহারা মূর্খ হইল। অল্লাহারে শরীরে বল করিতে গিয়া, অধিকতর বলহীন হইল ; ঘোরতর জঙ্গলে একরূপ জঙ্গল জ্বর জন্মিল ; তখন সেই দারুণ জ্বরে, অর্থাভাবে, পথ্যাভাবে, ক্ষীণপ্রাণে তাহারা কতদিন যুঝিবে ? প্রত্যহ সহস্র প্রাণী মরিতে লাগিল, ব্যাঘ্রধর্মাবলম্বী অধিবাসীরা প্রায় সকলেই উৎসন্ন গেল, আর রাজব্যাঘ্র সকল সেই ভীষণ গহন শ্মশান বনে শৃগাল হরিণ শীকার করিয়া একাধিপত্য রাজত্ব করিতে লাগিল। কথাটা শুনিলে হাসি পায়, ভাবিলে গা শিহরিয়া উঠে।

নবজীবন।
ফাল্গুন ১২৯১

১৭
॥ ভারত উদ্ধারিণী সভার কার্য্যবিবরণ ॥

বোধহয় আপনি ও আপনার পাঠিকা পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, সহর কলিকাতা * * * ষ্ট্রীট * * নং ভবনে বিগত শনিবারে এক রাক্ষসী মহিলা সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কোন বিশেষ কারণ বশত সভার কার্য্যবিবরণ অদ্য বেলা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অপ্রকাশ রাখিবার কথা ছিল। এক্ষণে আপত্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে এবং সভাও বঙ্গদেশের প্রত্যেক নারীনরের নিকট হইতে সহায়তা আহ্বান করিতেছেন।

উচ্চ ও অনুচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা অন্যূন ৫০টি মহিলা সভাগৃহে উপস্থিতা ছিলেন। তদ্ব্যতীত আরও অনেকে আসিবেন বলিয়া আশাসিতা করিয়াছিলেন। ঘোষিত হইয়াছিল যে, বিলাত প্রত্যাগতা Mrs এন, কে, চৌধুরানী এম· এ, ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রস্তাব করিবেন, মহিলাকুলের পরমবন্ধু বিলাত প্রত্যাগতা Mrs এস, মজুমদার বি· এ, ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন এবং বিশেষ উপযুক্তা শ্রীমতী নিস্তারিনী হালদার বি. এ, শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পারিজাত দত্ত (এফ , এ) দ্বিতীয় অনুরোধ পর্য্যন্ত উক্ত স্বাধীনতা প্রদর্শিত সভার অনুমোদিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।

ঠিক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু যেমন ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিতে আরম্ভ করিল, অমনি একখানি পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, অনিবার্য্য প্রসব বেদনার জন্ত চৌধুরাণী মহোদয়া সভায় যোগদান করিতে অসমর্থা। এই

নিদারুণ সংবাদে সভাস্থ সকলেই নিরাশায় বজ্রাহতা হইলেন। হতাশার স্রোত ক্রমে নিবারিত হইলে, উপস্থিতা মহিলাগণের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, সন্তান প্রসব করিবার কথাই অবশ্য প্রধান ও প্রথম তর্কের বিষয়। এই বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ তর্ক বিতর্ক চলিলে পর, বঙ্গ সমাজে মহিলাকুলের দুরবস্থার বিষয় উপস্থিত হইল। তৎপরে কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার ব্যায়বাহুল্যের বিষয় আসিয়া পড়িল। তর্ক বিতর্ক চলিতেছে এমন সময়ে সপ্তদশ বর্ষীয়া গর্ভবতী শ্রীমতী বীরেন্দ্রবালা গঙ্গোপাধ্যায় নাম্নী জনৈক সভ্যা দণ্ডায়মানা হইয়া উপস্থিতা সভ্যা-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, 'অদ্যকার প্রস্তাবিত বিষয়ের বক্তৃতায় যখন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, তখন কেন, কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার ব্যায়-বাহুল্যের বিষয়েই বক্তৃতাদি হউক না ?' সভাস্থ অনেকেই এই প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন এবং গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়াকে প্রস্তাবকারিনী ও শ্রীমতী চমৎকারিনী গুঁই তর্করত্নকে অনুমোদনকারিনী স্থির করিলেন। শ্রীমতী বীরেন্দ্রবালা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর, শ্রীমতী চমৎকারিনী দণ্ডায়মানা হইয়া ২ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট কাল অগ্নিময় শিলাবৃষ্টির ন্যায় বক্তৃতা করিলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার যুক্তি ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন—কেবল তিনটি পুত্রের জননী একটি রমণীকে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তর্করত্ন মহোদয়া বক্তৃতাকালে তিনবারের অধিক জলপান করেন নাই। যদি আপনার পত্রে স্থান হয়, তাহা হইলে সমস্ত বক্তৃতাগুলি সবিস্তারে পাঠাইতে পারি—মিস্ চারুমুখী দাস বি, এস, সি, সমস্ত বক্তৃতাগুলি সাংকেতিক অক্ষরে ক্ষিপ্র হস্তে শাদায় কালায় উঠাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিষয় ব্যতীত আর * টা বিষয়ে বক্তৃতাদি হইয়াছিল—এইজন্যে বক্তৃতা বহুবচনে প্রয়োগ করা হইল। অনুগ্রহ করিয়া আপাতত সভার মন্তব্যগুলি সাধারণের গোচর করিবেন।

*** তারিখের ভারত উদ্ধারিনী সভার অসাধারণ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

শ্রীমতী রাধামণি গণেশ-সভাপত্নীর আসনে। ৪৮ জন বঙ্গের মুখোজ্জ্বল-কারিণী কুলকামিনী উপস্থিতা। শ্রীমতী কুসুম ঘোষ (এফ্. এ.) কার্য্য সম্পাদিকা।

১॥ এই সভা অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, Mrs এন্. কে. চৌধুরানী এম্. এ. গৃহমধ্যে আবদ্ধ হওয়াতে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতাদি নবমতে ষষ্ঠী পূজার কাল পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

২॥ এই সভা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, অনেক দিন যাবৎ স্ত্রীলোকে প্রসব বেদনা সহিয়া সন্তান প্রসব করিয়া আসিয়াছেন এবং স্ত্রী জাতির স্কন্ধ হইতে এ কষ্টভার বিমুক্ত করিতে আমেরিকাতে কোন চেষ্টা হয় নাই।

৩॥ সংসারে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগের বিবাহে অধিক অর্থ ব্যায় হইয়া থাকে এবং এক্ষণে তার স্ত্রীলোক "রত্ন" নাই সুতরাং স্ত্রী সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্যে দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত কেহ আর কন্যা প্রসব করিতে পারিবেন না। অপিচ রোগীকে অরোগ করা অপেক্ষা রোগ উৎপন্ন হইতে না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া কন্যার বিবাহের ব্যায়-বাহুল্য নিবারণের প্রতি সভা কিছু মনোযোগ দিলেন না।

৪॥ স্ত্রী জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে পুরুষে পরিণত করা সভার অভিপ্রায় বিধায়, স্ত্রীজাতি ষোলআনা পরিমাপে পুরুষে পরিণত হইতে পারে কি না, জানিবার জন্য বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতা শ্রীমতী সুকুমারী চট্টোপাধ্যায় এম্. ডি. মহাশয়াকে পত্র লেখা হইবে এবং কার্য্য সম্ভব হইলে স্ত্রীকে পুরুষ করিবার দেশ বিদেশে উপদেষ্টা প্রেরিত হইবেন।

৫॥ এই সভার মন্তব্য দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে এবং যাঁহারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যোগ দিতে চাহেন, আদরে তাঁহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করা হইবে। সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকদিগকে পত্রাদি লিখিলেই চলিবে।

* নং * স্ট্রীট
* ই আগস্ট, ১৮৮৬

শ্রীমতী * * * এফ, এ.
অবৈতনিক কার্য্যসম্পাদিকা।

'নবজীবন'
শ্রাবণ ১২৯৩

১৮

বিষম বাজার
বা
সম্মার্জনী মেলা

ইংরেজের কল্যাণে, আর কল্যাণেই বা কেন বলি, ইংরেজের কৃপায় আমরা কত কিনা দেখিলাম, আর কত কিনা দেখিব। রাজ্যে দেখিলাম, ভূমিশূন্য রাজা, জমি শূন্য প্রজা। কার্য্যে দেখিলাম যিনি কাপুরুষ, তিনি বাহাদুর ; যিনি সাপুরুষ, তিনি দূর, দূর। রাজায় দেখিলাম—বিচার বিক্রয়, শাসন বিক্রয়, শান্তি বিক্রয় ; দান কেবল আধি-ব্যাধি উপাধি আর সমাধি নগরে দেখিলাম সমর হীনা কুলনারী, আর ধর্ম্মহীনা পাদরি। দেশে দেখিলাম—যবন হিন্দুর সমাজ-সংস্কারক, আর হিন্দু হিন্দুর সর্ব্বনাশক।

ভারতে দেখিলাম জলে বাষ্প বোট-স্থলে রেল-রোড, সিন্ধুকে ব্যাঙ্ক নোট—আর সর্ব্বত্র অনবরত হরির লুট। সভায় দেখিলাম—দেশভক্ত রিজোলিউশন করে, রাজভক্ত সার্টিফিকেট জারি করে, আর প্রজাভক্ত প্রজার রক্ত শোষণ করে। সহরে দেখিলাম নাস্তিকতায় তত্ত্বজ্ঞানী, ধর্মকথায় বিজ্ঞানী, অনাচারে ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ব্যবসাদারিতে হিন্দুয়ানি। বাহিরে দেখিলাম আল্‌তা পায়ে জুতার চটক, বুড়া নাকে নোলক দোলক, বডির উপর বডি, আর বগির উপর জগদ্ধাত্রী। সহরের হাটে দেখিলাম—উশনায় গুঁড়ি, আতপে খড়ি, দুধে জল-ঘিয়ে বাতি, লবণে হাড়, বসনে মাড়, সন্দেশে ময়দা, বারুদে কায়দা। গড়ের মাঠে দেখিলাম হাতীর লীলা, ঘোড়ার খেলা, আর লোকের রেলা। ওদিকে ব্যাপারটি কি? একজন মুসলমান বলিল,—ঝাঁটার মেলা।

সেইদিকে অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম বৃহৎ তোরণের উপর ঢল ঢল লাল কাপড়ে বড় বড় স্বর্ণাক্ষরে ছাপা আছে—

BESOM BAZAR

বিষম বাজার

বুঝিতে পারিলাম না। তোরণের এক পার্শ্বে, ভূমি হইতে তিন হাত উর্দ্ধ একটি ছোট গবাক্ষ দ্বার দিয়া, একটি ফুট্‌ফুটে ক্ষুদে বিবি, মাজেন্টি ঠোঁটে উঁকি মারিতেছে। আমায় কিছু বিস্মিত দেখিয়া, তিনি ইংরাজিতে বলিলেন, "বাবু ভিতরে আসিলেই বুঝিতে পারিবেন, আসুন।" আমি একটু কুণ্ঠিত অথচ প্রফুল্লভাবে বলিলাম আপনি কৃশাঙ্গী বরং এই ঘুলঘুলি দিয়া বাহিরে আসিতে পারেন, আমার এই দেহ লইয়া এই পথে আপনার নিকট যাওয়া অসম্ভব। "রমণী কোন কিছু না বলিয়া, ছোট হাতখানি গবাক্ষ দিয়া আমার নিকট ধরিয়া বলিলেন "টাকা"। আমিও অমনই কলের পুতুলের মত বুকের জেব্ হইতে একটি টাকা তাঁহাকে দিলাম। মনে মনে বলিলাম 'শুভমস্তু'। রমণী তৎক্ষণাৎ একটি শাদা ক্ষুদ্র কুঁচি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন—"ঐ সাহেবের গালে ইহার বাড়ি মারিলেই তিনি আপনাকে ভিতরে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিবেন।" বলিয়া সম্বন্ধ দক্ষিণাবধি এই কথা বুঝাইবার জন্যই যেন আমার প্রতি বিমুখী হইলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট সাহেবের দিকে চাহিলাম। দেখি বিবি যেমন ফুট্‌ফুটে, ছিপ্‌ছিপে, সাহেব তেমনই বিরাট বীভৎস। দুটা কামানের উপর একটা ঢাকাই জালা, তার উপর একখানা জীয়ন্ত মুখস্। সাহেব হাঁসিতেছেন, কি হাই তুলিতেছেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পাশে রাস্তার দিকে চাহিলাম; দেখিলাম আমি সহস্র চক্ষুর লক্ষ্য হইয়াছি। হস্তস্থিত শ্বেত কুঁচিটি আর একবার দেখিলাম। বুঝিলাম সেটি

হাতীর দাঁতের কুঁচিকাটি—অতি পরিপাটী। ধরিবার হাতলে অতি ছোট অক্ষরে লেখা আছে।

Besma = Besem = Besom = Broom.

বিষমা = বিষেম = বিষম = ক্রম।

তখন সেই যে বৃদ্ধ মুসলমান বলিয়াছিল, ঝাঁটার মেলা,—সেই কথা মনে পড়িল। রাক্ষস সাহেবের গালে বিলাতী ঝাঁটা মারিতে হইবে, ভাবনা হইল। আবার পার্শ্বের দিকে চাহিলাম—তখনও আমাকে সকলে সেইভাবে দেখিতেছে। আস্তে আস্তে সাহেবের দিকে অগ্রসর হইলাম। আস্তে আস্তে সাহেবের গালে ঝাঁটা মারিলাম—সাহেব বলিলেন 'এক'। আবার মারিলাম সাহেব বলিলেন 'দুই' পুনরায় মারিতেই, সাহেব 'তিন' বলিয়া আমার হস্ত হইতে কুঁচি কাটিটি গ্রহণ করিলেন। একটা কাটা দরজকট্ কট্ রবে খুলিয়া গেল। আমি মেলার ভবনে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমে কতকগুলি নারিকেল, তাল জাতায় বৃক্ষ, নলখাগড়ার বন, বেণা, কাশের ঝাড়-ঝাঁটির ঝোপ, বড় বড় ঘাসের কেয়ারি। স্থানটি অতি পরিপাটি করিয়া সাজান। সারি সারি সুপারি গাছ থামের ছড়ের মত বসাইয়াছে, পাতায় পাতায় বিনাইয়া দিয়া খিলান করিয়া দিয়াছে। দুপাশে দূরে আবার নারিকেল, তাল, সাগু গাছের সারি বসাইয়াছে; মাঝে মাঝে বেতের কুঞ্জ, শরের গুচ্ছ; আর নানা বর্ণের ঝাঁটি ফুল চারিদিকে রাশি ফুটিয়া আছে। একজন বাবু আপন মনে বলিয়া গেলেন "এই ত ঝাঁটার সূতিকাগার।" কথাটা শুনিয়াই আমার মনে হইল, তবে ত ঝাঁটার অদৃষ্ট আমাদের চেয়ে ভাল। আমাদের সূতিকাগারের কথা ভাবিলে মনে হয় আমরা নিতান্ত দৈবী শক্তিতেই বাঁচিয়া আছি।

ক্রমে অগ্রসর হইলাম। একটি সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে উপনীত, ঝাঁটা, ঝাঁটা, ঝাঁটা। চারিদিকেই ঝাঁটা, কোঁচকা, কুঁচি, ঝাড়ন, ব্রস ও ব্রুম্। থামে ঝাঁটা, দেওয়ালে ঝাঁটা, খিলানে ঝাঁটা। যে বড় বড় দাণ্ডি লাগান ব্রস্ দিয়া কলিকাতার সদর রাস্তার পাশ গুলা ধুইয়া দেয়, তাহাই দেওয়ালে সাজাইয়া কারিগরি করিয়াছে। ঝাঁটা সাজাইয়া বর্ণমালা করিয়াছে, খড়কের কোঁচকাগুলা মাকড়সার মত করিয়া বাঁধিয়া বাহার করিয়াছে। সম্মুখে সমগ্র পশ্চিমদিকের দেওয়াল জুড়িয়া একখানি বিচিত্র চিত্রপট। সেই দিকটা একটু অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। চিত্রপটে সুনীল পটে ছোটবড় তারকাগুলি জ্বলিতেছে আর সেই বিচিত্র পটের নিচে হইতে উপর পর্য্যন্ত কোণাকুণি একটি সুবৃহৎ ধূমকেতু ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে। পটের উপরে লেখা আছে—"স্বর্গীয় সম্মার্জনী"। তখন, ঠাকুমা আমাকে ছোটবেলা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল, বলিতেন

"ঐ যোমের ঝাঁটা উঠিয়াছে রে! কোন দেশের লোককে এবার ঝাঁটিয়ে লয়ে যাবে। প্রণাম কর"। তখন প্রণাম করিতাম। এখনও এই অপূর্ব্ব চিত্রপট দেখিয়া স্বর্গের ঝাঁটাধারী মনে মনে প্রণাম করিলাম। তাহার পর নানাবিধ সম্মার্জ্জনী দেখিতে লাগিলাম।

প্রথমেই কতকগুলি রাজনৈতিক ঝাঁটা; তাহার সর্ব্বপ্রথমেই রেসিডেণ্টা সম্মার্জ্জনী। একটু বাঁকা ভাবে ওঁচান আছে; নীচে কেবল লেখা আছে,—Beware of the Engine। "গাড়ী যাতায়াত করে সাবধান!!!" সেইস্থলে আর একটি সম্মার্জ্জনী দেখিলাম। উপরে নাম দেওয়া আছে 'কাশ্মীরী'। কাশ্মীরী খেম্‌টাই জানিতাম এইবার কাশ্মীরী ঝাঁটা দেখিতে বড়ই কৌতূহল হইল। হাতে তুলিয়া পরীক্ষা করিলাম, সেটি ঝাঁটি শাখার ঝাঁটা; কিন্তু শালের হাঁসিয়া দিয়া বাঁধা। নীচে লেখা আছে—'বাঙ্গালি বিচালনে অনন্ত শক্তি।'

এই স্থলে একগাছি সম্মার্জনী রহিয়াছে তাহার নাম 'করময়ী'। তাহাতে সহস্র শিখা; রথ কর, পথ কর, আয় কর, ব্যয় কর, বিচারের কর, অত্যাচারের কর, শোষণ কর, লবণ কর, জল কর, বায়ু কর, জীবন কর, নানাবিধ কর শিখা অমনই খর খর করিতেছে। নীচে লেখা আছে—"ইহাতে ধূলি গুঁড়ি কিছু এড়াইতে পারে না।"

এক গাছির নাম 'দন্ত শাসনী'। তাহার কাটিগুলি শাদা শাদা; কিন্তু গোঁড়ায় লাল; যেন রক্ত মাখান। পরিচয় স্বরূপ লেখা আছে—

তদ্বিরে মিলিবে মুক্তি, তর্কে বহুদূর,
বেতদ্বিরে শ্রীনিবাস বুঝিবে চতুর।

'সিবিল সর্ব্বিস সম্মার্জ্জনী'র শলাগুলা কেবল কাঁটায় পূরা। কোন বয়সের কাঁটা, কোথাও জাহাজের কাঁটা, কোথাও বর্ণের কাঁটা কেবল কাঁটা। পরিচয় আছে—

কণ্টকে গঠিল বিধি সর্ব্বিস উত্তমে।
অকূলে রাখিল তারে, বুঝিয়া মরমে॥

তাহার পর কতকগুলি ঔপন্যাসিক ঝাঁটা। এস্থলে ঝাঁটাগুলি মূর্ত্তিমন্ত করিয়া রাখিয়াছে। আর দলে দলে বাঙ্গালি বাবুরা আশে পাশে ঘুরিতেছেন, দুপাশে বনাতের পর্দ্দা দেওয়া, সুমুখ খোলা, এক একটি কুঠারী তাহারই মধ্যে এক এক রূপ সম্মার্জ্জনী লীলা। একটি প্রকোষ্ঠে, একজন এক হারা ছোকরা পায়ে পম্প চটি, মাথায় নেয়াপাতি সিঁথি; গায়ে একখানি লুই, পৈতার মতন ভাবে এড়ো করিয়া দেওয়া; বাঁকা হয়ে পীঠ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর পার্শ্বে একটি কালো বৈষ্ণবের মেয়ে—কপালে উল্‌কি, কাণে দুল, পরণে কস্তা পেড়ে সাড়ী, গায়ে কাঁচুলি, শুকনো গোবর

গোলা মাখা একগাছ মুড়ো ঝাঁটা হাতে, সেই প্রস্তুত পীঠের উপর লক্ষ্য করিয়া আছে। উপরে লেখা আছে, 'দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া।' নীচে লেখা আছে "প্রেম নানাপ্রকার।"

আমি একমনে গিরিজাযার সম্মার্জ্জনী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি,—এমন সময় আশপাশ দিয়া কয়েকজন থিয়েটারে বাবু হঠাৎ আমাকে "মহাশয় যে" বলিয়া নমস্কার করিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম, বিলম্বে প্রতিনমস্কার করিলাম, বলিলাম—"এই দেখিতেছি।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন ; "কেমন দেখিতেছেন ?" আমি বলিলাম "দ্বিগ্বিজয় কিছু গালি ধরণের হইয়াছে।" দিগ্বিজয় আপনিই বলিয়া উঠিল "নহিলে মহাশয়! এ মুড়ো ঝাঁটা পীঠ পাতিয়া আর কেহ কি লইতে পারে ?" গিরিজায়া হাসিয়া উঠিল, আমি বিরক্ত হইয়া একটু সরিয়া গেলাম।

দেখি—'জলধর জগদম্বা', জগদম্বা সোনার কঙ্কন হাতে দিয়া একখানি মটরা চেলী ঘোড়বেড় করিয়া পরিয়া এক বিরাট সম্মার্জ্জনী হস্তে দণ্ডায়মান। সম্মার্জ্জনীতে বড় টিকিট লাগান আছে—"লম্পট দমনী।" জলধর ছিলেন, আমি আসিবার পূর্ব্বেই কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ (বোধ হইল সকলেই বাঙ্গালী) তাঁহাকে খুঁজিতে ও ডাকিতে লাগিলেন।

এক প্রকোষ্ঠে রৈবতকের সুলোচনার সম্মার্জ্জনী। সুলোচনা সুভদ্রার সহচরী। হাতে তাড়, বাজুবন্দ, কানে সোনার মুচকুন্দ ; একখানা পাঁচরঙ্গা সাড়ী সুমুখটা ঘাঘরার মত করিয়া খানিক গোঁজা, আর খানিকটা, বুকের ফতুয়ার উপর দিয়া ঘাড বেড়িয়া কোমরে জড়ান ; তাহার উপর নীল রেশমি ওড়না। গড়ন খানি মাটো মাটো, নাক টীকল, মুখখানি ছাঁচি পানের মত, কথা কহিলে জিহ্বাটি টং টং করিয়া বাজিতে থাকে। পশ্চাতের লাল পরদায় শ্বেত অক্ষরে এই পদ্যটুকু অঙ্কিত আছে,—

কৃষ্ণ। গালি দিস্, বিষমুখি, টানি বজ্র জিহ্বা তোর,
সাজাইব অনার্য্যের কালী।

সুলোচনা।

বোকা পুরুষের বুকে নাচি তবে মনসুখে,
রণরঙ্গে দিয়া করতালি।
ব্রহ্মাস্ত্র জিহ্বায় ধরি, বরুণাস্ত্র নেত্র কোণে
করে বজ্র ধরি ভীমা ঝাঁটা,
এরূপে দুর্য্যোধনের দেখি পৃষ্ঠ পরিসর,
ইচ্ছা করে দেখি বুক পাটা।

[শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত রৈবতক ২৭২ পৃষ্ঠা।]

সুলোচনার হস্তে সম্মার্জ্জনী। হাঁ ঝাঁটা বটে। বেণা গাছের ঝাটা, বেণার শিকডগুলি পাকাইয়া একটি ছোট খোঁপার মত ঝাঁটার গোড়া করিয়াছে। তাহার সুগন্ধ বাহির হইতেছে। হলে কি হয়? উপরের শলা গুলি যেন এক একটি বাঘ ছপ্‌টি। অমনই লক্‌ লক্‌ করিতেছে। মনে করিলাম, ইহারই একগাছি পাই, বড় বৌয়ের হাতে দিয়ে শম্ভু দাদার রাত্রিবেশ ক্লাবে যাওয়া ঘুচাই।

একটি কুঠরিতে, মধ্যে একটি পুরুষ জোড়পদে, নিশ্চল ভাবে, দুইহস্ত সমানভাবে প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান দুগাছা ঝাঁটা কেবল দুপাশ হইতে ওঁচান রহিয়াছে, সম্মার্জ্জনী দুইগাছির অধিকারিণীদের মূর্ত্তি নাই। নিম্নে লেখা আছে—"চোর নিবারণী দুই সতিনী সম্মার্জ্জনী।" পার্শ্বে এক কোণে কালি ঝুলি মাথা, টেনা পরা, একটা লোক যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। আমি নিকটস্থ হইবামাত্র সম্মার্জ্জনী মধ্যস্থ বাবু মুখ না বাঁকাইয়া, না হেলিয়া দুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ-চোর চোর।" লোকটা কোণ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া কর যোড়ে বলিল "প্রভু আমি চোর, উনি সাধু"।

কিছু দূরে, এক গাছি বড় উলুর বাডন। বাড়নের গোডায় পরিস্কার করিয়া উলু বিনাইয়া বেশ একখানি সুন্দর মুখ গডিয়াছে। তাহাতে চক্ষু ভ্রূ আঁকিয়াছে। নাকে একটি ক্ষুদ্র মুক্তার নোলক দিয়াছে। কিন্তু মাথার উপর লিখে দিয়াছে—"উপরে নীচে দেখিয়া কার্য্য করিবে।"

একদিকে কতকগুলি প্রকোষ্ঠে ঐতিহাসিক ব্যাপার। দুইগাছি তাহার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ; লোকে দেখিছে, পড়িছে, হাসিছে, কত কি বলিছে। একগাছির নাম "দরিয়ার নারিকেলী বা সাগরী সম্মার্জ্জনী।" আর গাছির নাম "নদিয়ার নারকেলী বা নাগরী সম্মার্জ্জনী।"

সাগরী সম্মার্জ্জনীর কিছুই বিশেষত্ব দেখিলাম না। এই সাধারণ ঘব কন্নার ঝাঁটাই বটে। বার-ফট্‌কা পুরুষগুলার অদৃষ্টে বা পৃষ্ঠে ঐরূপই ঘটে; তবে এবার আধারের গুণে আধেয়ের কিছু অধিক গৌরব হইয়াছে। গৃহমধ্যে কেবল ঝাঁটাই বিরাজমানা, পৃষ্ঠ-পাতক কেহই নাই। তবে পরদার উপর পূর্ব্বমত কয়েক পংক্তি গদ্য চিত্রিত আছে;—

"আমার স্ত্রী কোন ক্রমেই নির্ব্বোধ নহেন, বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও সাধুশীলা। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোস আছে; আমার বাটীতে বিলম্ব হইলে, তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্ত প্রায় হন, এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অকারণে আমার সঙ্গে কলহ উপস্থিত করেন।" আর কি করেন, তা ইনিই জানেন। সম্মার্জ্জনী সংগ্রাহক।

[ভ্রান্তিবিলাস, উপাখ্যান ভাগ-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংকলিত।]

নদীয়ার নারকেলী বা নাগরী সম্মার্জ্জণীও সাধারণ ধরণের তবে শুনিলাম, এবার আধারের গুণে নহে, ধারিণীর গৌরবে সম্মার্জ্জণী গৌরবান্বিতা।

এমন ঐতিহাসিকী সম্মার্জ্জণী-বাঁকা, টেরা ঝুলান দোলান যে কত রহিয়াছে, তাহা গণিতে পারিলাম না,বিশেষ কৌতূহলও হইল না।

সংস্কারণী সম্মার্জ্জনী মধ্যে সুরাবারিণী অনেকের লক্ষ্য হইয়াছে। কাটিগুলি বেউড় বাঁশের শলা—তবে আগাগোড়া ক্লোরাইড মাখান। বড় দুর্গন্ধ। মনে করিলাম ঝাঁটাতেও হোমিওপ্যাথি আছে নাকি—Like cures like ?

'সভা নিবারণী' ও 'বক্তৃতা বারিণী' সম্মার্জ্জনী উভয়েই নূতন আবিষ্কৃত। যুবতীরা স্বয়ং ক্রয় করিলে অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন, বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। মনে করিলাম, এখন অর্দ্ধমূল্য, পরে অবশ্য উপহার হইবে; সেই সময়ে কোন আত্মীয়াকে সঙ্গে আনিতে পারিলে, চলিবে। তবে বিশেষ আত্মীয়াকে আনিলে চলিবে না—কাজ কি, শেষে আপনার গায়ে আপনি কুড়ুল মারিব কি ?

তাহার পর "মূল দোষ নিবারণী" অনেক প্রকার সম্মার্জ্জনী দেখিলাম। মূলের মধ্যে নানা প্রকার আলুই বেশী। কিন্তু আর ঘুরিতেও পারিলাম না। পরদার চিহ্নিত গন্ধ পংক্তি কয়টি মনে পড়িতে লাগিল। দ্বার দেশের বিরাট সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ক্ষুদে বিবিকে আর দেখিতে পাইলাম না।

নবজীবন।
পৌষ। ১২৯৩।

১৯
সিংহের উপাধি বিতরণ

কস্মিংশ্চিদ্বনে ভাস্বরকো নাম সিংহ প্রতিবসতি স্ম। কদাচিৎ তাঁহার প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিল "হে পশুপতি! মনুষ্যলোকে রাজবর্গ আপন আপন প্রজাবর্গকে এক্ষণে নানাবিধ উপাধি প্রদান করিতেছে। অতএব পশুলোকে কেন তাহা হইবে না, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব হে শ্বেতপুরুষ সাম্রাজ্য—ধ্বজ-বিহারিন্ মহাকেশরিন্! শশ-মূষিক-চর্ব্বণ কারিন্! প্রসীদ! প্রসীদ! প্রসন্ন হও! আমাদের উপাধি প্রদান কর! তোমার মসৃণ কেশর

দাম চিরকুঞ্চিত হউক! তোমার শিলাস্ফালন-কর্কশ মহালাঙ্গুলের চিরন্তন পরিপুষ্টি হইতে থাকুক।”

তখন পশুরাজধিরাজ শ্রীমান্ ভাস্বরক দংষ্ট্রা-ময়ূখ-জালে গিরি গহ্বর কানন কুঞ্জ কান্তার প্রভৃতি প্রভা-ভাষিত করিয়া বলিলেন, “সাধু! সাধু! উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না উপাধি ব্যতীত তোমাদিগের এই সকল দীর্ঘায়ত, শ্রীমান্, কোমল, বিচিত্র এবং লোমশ লাঙ্গুল সকল, ফলশূন্য লতার ন্যায় এবং পতাকা শূন্য বাঁশের ন্যায় জনসমাজে সম্যক সম্মানিত হয় না। অতএব হে বনচারি বৃন্দ! তোমরা উপাধি গ্রহণ কর।”

তখন সেই কাননারণ্য-প্রমথন-কারী বনচারী বৃন্দ সহস্র সহস্র জিহ্বা নিষ্ক্রামণ পূর্ব্বক তুমুল গর্জনের সহিত রাজাজ্ঞার অনুমোদন করিল। তখন কাননেশ্বর শ্রীমান্ ভাস্বরক, যথাবিধি উপাধি শাস্ত্র অবগত হইয়া প্রজাবৃন্দকে উপাধি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

পশুশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রকে অগ্রে সম্বোধন করিয়া, মৃগেন্দ্রবর আজ্ঞা করিলেন, “হে শার্দ্দুল! বলে, ছলে, কৌশলে তুমি সর্ব্বপ্রধান। আহারে, প্রহারে, সংহারে এবং অপহারে তোমার তুল্য কেহই নাই। তুমি দংষ্ট্রী, তুমি নখী, তুমি চোর এবং তুমি গর্জ্জনকারী—এজন্য অগ্রে তোমাকেই উপাধি প্রধান করিব। এই ভারত ভূমে প্রায় সর্ব্বপ্রদেশই রাত্রিকালে তোমার ভয়ে ভীত স্বল্প পরিমিত নাগরিক প্রদেশ ভিন্ন, ভারতের সর্ব্বত্রই রাত্রিকালে তোমারই আয়ত্ত। এজন্য আমি তোমাকে উপাধ ছিলাম—“Night commander of the Indian Empire।”

ব্যাঘ্র মহাশয় সন্তুষ্ট চিত্তে, রাজপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দে লাঙ্গুলাস্ফালন করিলেন। তখন, রাজা সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে বিষধর! তুমি মহাবীর তোমার তুল্য বার আর দেখি না। বরং ব্যাঘ্রের নখ দংষ্ট্রা হইতে নিস্কৃতি আছে, কিন্তু তোমার বিষদন্ত কাহারও নিস্কৃতি নাই। শত্রুবধে তুমি এই মহা-বল-বিক্রমশালী শার্দ্দুল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে জানা যায়। শার্দ্দুল কেবল বনে বনে শত্রুনিপাত করেন কিন্তু তুমি গৃহে গৃহে। এই ভারতভূমে রাত্রিকালে কে তোমার সঙ্গছাড়া? অতএব হে নিঃশব্দ সঞ্চারী রাত্রিচর তোমাকে “Night companion of the Indian Empire।” উপাধি দেওয়া গেল।

ক্ষুদ্রজীবী ভুজঙ্গমের এইরূপ সম্মানে প্রধান প্রধান পশুগণ অসন্তুষ্ট ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন মহাকায় ভল্লুক অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “মহারাজ! আমি উপাধি পাই না?”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" ভল্লুক বলিল, "আজ্ঞে, আমি The great Bear।"

তখন পশুরাজ বলিলেন. "আর পরিচয় দিতে হইবে না। তুমি হইলে Grand commander of the star of India"

ভল্লুক একটি মার্জ্জারকে দেখাইয়া বলিল, "এই কাবুলি বেরালটির কি হইবে ? এটি আপনারই আশ্রিত।"

পশুরাজ বলিলেন, "companion to the star of India।"

কুক্কুর বলিল, "তবে আমি কি ?" পশুরাজ বলিলেন "companion to the comets of India।"

এইরূপে অন্যান্য পশুগণ নানাবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইলে পর, সভাস্থ গর্দ্দভ মণ্ডলী সহসা ঘোর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের বিকট শব্দ, দীর্ঘকর্ণ, আরূঢ় কেশর এবং স্থূল উদর দর্শন করিয়া রাজা সভাপণ্ডিতের নিকট কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন রাজ-সভাপণ্ডিত নিবেদন করিলেন যে উহারা উপাধি প্রার্থনা করে। পশুরাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন , "সে কি ? এই মূঢেরা কি উপাধি পাইবার যোগ্য ?"

সভাপণ্ডিত বলিলেন. "মহারাজ উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন। ইহারা মূঢ বটে। মূঢ়ের গুণ বিচার করিয়া উপাধি প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক।"

পশুরাজ। সে কি প্রকার ?

সভাপণ্ডিত। মুহ্ ধাতু হইতে মূঢ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মূঢ়ের গুণ মোহ। শুনিয়া মৃগেন্দ্র বর আজ্ঞা করিলেন. "ইঁহারা মহামোহোপাধ্যায় হউন।"

শুনিয়া গর্দ্দভমণ্ডলী আহ্লাদে তুমুল খ্যাঁকঃ খ্যাঁকঃ শব্দ করিল। মহারাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন আর কতকগুলি সভ্যতা-ব্রত-নিষ্ঠ উচ্চাসনস্থিত সভাসদ-বৃক্ষশাখা সকল হইতে কোমল-বল্লী-সন্নিভ দীর্ঘ সংসর্পিত লাঙ্গুলশ্রেণী বিমুক্ত করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ধরণীমণ্ডল পবিত্রিত করিলেন। তাঁহাদিগের হেম-কলধৌতসন্নিভ মসৃণ লোমাবলী অনুপাকে নিয়ত গভীর কৃষ্ণ হাণ্ডিকা, তওল সদৃশ বদনমণ্ডল এবং কররেণ এবং সর্ব্বোপরি আনন্দোৎসব-দিবস-রস-বিকাশকারী পতাকা শ্রেণী শ্রেণী তুল্য উর্দ্ধোত্থিত লাঙ্গুল মালা সন্দর্শন করিয়া কেশরীরাজ প্রীত হইলেন, এবং প্রীতিব্যাঞ্জক হাস্য হুঙ্কারে কানন বিটপী সকল কম্পিত করিয়া কহিলেন, "ভো ভো বানরাঃ ! অহং প্রীতোস্মি। তোমরাই আমার রাজ্যের গৌরব। তোমরা প্রভুভক্ত; রামচন্দ্রাদি প্রাচীন রাজগণ তাহার সাক্ষী ; এবং তোমরাই আমার প্রজাবৃন্দের মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ, কেননা ডালে ডালে বেড়াও। আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে উপাধিবিশিষ্ট

করিতেছি তোমরা 'মহারাজা' এবং 'রাজা বাহাদুর' বলিয়া পুরুষানুক্রমে বিখ্যাত হইবে। তোমাদের জয় হউক ; তোমরা সচ্ছন্দে কিচির মিচির কর, এবং পুরুষানুক্রমে লাঙ্গুল বিক্ষেপ বিসর্পাদির দ্বারা বনবাসীবৃন্দের মনোহরণ করিতে থাক।" তখন কিচির মিচির হুপ্ হাপ্ ইত্যাদি কৈষ্কিন্ধ্য জয়ধ্বনিতে রাজারণ্য পরিপূর্ণ হইল।

উচ্চস্থ মহাশয়দিগের অভিনন্দন নিনাদ কিঞ্চিৎ স্থগিত হইলে রাজা প্রতিহার-ভূমে কিঞ্চিৎ স্থগিত হইলে রাজা প্রতিহার ভূমে কিঞ্চিৎ অস্ফুট এবং দীন ভাবাপন্ন কণ্ঠধ্বনি শুনিলেন। প্রতিহারী বর্গ ছুঁচাকে সেই মহা সভাতলে সমাগত দেখিয়া রুষ্টভাবে তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু সর্ব্বসমদর্শী সেই পশুনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, এবং আজ্ঞা করিলেন যে, "এই পশুকে তোমরা গুণহীন বা উপাধির অযোগ্য বিবেচনা করিও না। ইনি বিনীত লজ্জাশীল এবং সৌরভ* পরিপূর্ণ। বিশেষ ইনি ধনবান্। অনেক গোলা লুট করিয়া ইনি ধনধান্যে আপনার বিবর পরিপূর্ণ করিয়াছেন। অতএব মনুষ্য লোকের প্রথানুসারে ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করা গেল।"

তারপর মহাকোলাহলের সহিত সেই মহতী রাজসভা ভঙ্গ হইলে, সভ্যগণ উর্দ্ধ-লাঙ্গুল হইয়া স্ব স্ব বিবরাভিমুখে গমন করিলেন।

* Lingua Valgaris—সৌরব।

"নবজীবন"
চৈত্র / ১২৯৩

২০
যম-যাত্রীদের সেতোগণের সভা

এখন সকল রকমেই সুবিধা হইয়াছে পূর্ব্বে বিলাতে যাইতে হইলে ছয় মাস লাগিত, এখন একুশ দিনের বেশী লাগে না,—পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে গয়া কাশী যাইতে হইলে তিন মাস লাগিত, এখন দুই দিনেই যাওয়া যায়। এই অনুপাতানুসারে যমালয়ের পথও অনেক নিকট হইয়াছে। কিন্তু হৈম পথ, জলীয় পথ, তাড়িত পথ প্রভৃতি নূতন নূতন পথ হওয়াতে "এলো পথের" যাত্রীর সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, সেই পথের সনন্দ প্রাপ্ত ইজারাদারগণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন ; বিশেষ, কালিঘাটের হালদার-দিগের ন্যায় ইহাদের অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে লাভের অংক সংকীর্ণ

হইয়া আসিতেছে। তাই ইহারা ধর্ম্মঘট করিয়া অপরাপর পথগুলি বন্ধ করিবার এবং অপ্রাপ্ত সনন্দ পাণ্ডাগণকে অনর্থক অংশদান করিতে না হয়, তাহার চেষ্টায় আছেন।

ইতিমধ্যে ইজারাদারগণ গুপ্ত সভা আহ্বান করেন। সকল সভ্য সভাস্থ হইলে একজন সভ্য এই প্রস্তাব করিলেন যে, আজকাল গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ক্ষিপ্র হস্তে সনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধহয় যে অতি অল্পকাল মধ্যেই যাত্রী অপেক্ষা সনন্দপ্রাপ্ত অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আর গভর্ণমেণ্ট যেরূপ উদার, তাহাতে সনন্দ বিতরণে বাধা জন্মাইবার আশাও দুরাশা মাত্র। বরং সেরূপ চেষ্টা করিলে গভর্ণমেণ্টর বিরাগভাজন হইবার সম্ভাবনা। অথচ অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইলে, "কুতের" ভাগ ক্রমশই হ্রস্ব হইয়া আসিবে; অতএব যাহাতে সকল দিক বজায় রাখিয়া পূর্ণ মাত্রায় যম যাত্রী পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ একটি উপায় উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সভ্যগণ "সাধু সাধু—" উচ্চারণ করিয়া প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। অতঃপর আর একজন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবকারীকে ধন্যবাদ প্রদান করত বলিলেন, বর্তমান বিপদ দূরীকৃত করিবার একটি সুন্দর উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি, সভ্যগণের মনোনীত হইলে কৃতার্থ হইব। উপায়টী এই যে অনেকযাত্রী আমাদের সাহায্যে একেবারেই যম কবলে নিপাতিত হয়, তাহাদের কাছে আমরা একবার বই "কুত" পাই না। আমরা আবহমানকাল যমরাজের সাহায্য করিয়া আসিতেছি, এইক্ষণে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যদি ক্ষুধা নিরোধ করেন, কোন লোককে কবলিত না করেন, অথচ প্রত্যেককে বৎসরে ৪।৫ বার তলপ করিয়া কাছে নিয়া ছাড়িয়া দেন, তবে আমরা প্রত্যেক মানুষের নিকট প্রতিবারে যাইতে আসিতে দুইবার করিয়া বৎসরে ৮।১০ বার "কুত" পাইতে পারিব; আর যাত্রীগণ যমের কবলের অগ্রাহ্য হইলে, আমাদের লাভের অংক অনন্তকাল পর্য্যন্ত এমনই অসংখ্য রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতএব এই গুপ্ত সভা হইতে এই বিষয়ের জন্য যমরাজকে অনুরোধ করা হউক। এই প্রস্তাব শ্রবণান্তে সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আত্মহারা হইলেন এবং সজোরে করতালি দ্বারা গুপ্তসভা ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর তৃতীয়ব্যক্তি সভ্যগণকে গম্ভীরভাবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— আপনারা উল্লাসে মত্ত হইয়া অধীর হইবেন না ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে উপস্থিত কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাবকারীকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, প্রস্তাবকারীর সারগর্ভা বক্তৃতা তাঁহার অগাধ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে, কিন্তু যমরাজের ক্ষুধা নিরোধ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে আমরা যখন যমরাজের এত উপকার করিয়াছি। তখন তিনি যে আমাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষুধা স্বাভাবিক বৃত্তি, ইচ্ছা করিলেই ইহাকে নিরোধ করা

যায় না; ক্ষুধার্ত ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না, এ অবস্থায় যমরাজ আহার না করিয়া যে সহজে সুস্থ থাকিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। তবে আমাদিগকে ঔষধের সাহায্যে এরূপ করিতে হইবে, যাহাতে যমরাজের ক্ষুধা বৃত্তির উদ্রেক না হইতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে ক্ষুধা বৃত্তিকে নির্ব্বাণ মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

এইকথা শুনিয়া চতুর্থব্যক্তি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—কথার ভাবে বোধ হইতেছে আপনি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বিজ্ঞানের অসাধ্য কি কোন কাজ আছে ? আমি এইক্ষণেই তিব্বতীয় কোন মহাত্মার নিকট অনুরোধ পত্র দিতেছি, সেই পত্র নিয়া যমরাজ মহাত্মার নিকট গিয়া যদি কিছুদিন শিক্ষানবিশী করেন, তবে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ক্ষুধাকে "নির্ব্বাণ" দেওয়া কতদূর সহজ। অবশ্য একথা আপনাদিগকে বলিয়া দিতেছি, মহাত্মার উপদেশে যমরাজ স্বীয় জিহ্বাকে কণ্ঠোর্দ্ধস্থ রন্ধ্রের মধ্য দিয়া ব্রহ্ম-তালুতে ঠেকাইতে পারিলে আর তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকিবে না। অনন্তর আর একজন সভ্য উঠিয়া বলিলেন, এ বড় দুঃখের বিষয় যে আপনারা সকলেই "উপায়ের" চিন্তা করেন কিন্তু "অপায়ের" চিন্তা করেন না। ব্রহ্মতালুতে জিহ্বা ঠেকাইতে পারিলে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা রোধ হয়, তাহা যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় সত্য, সেকথা কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ অবস্থায় মানুষের বহিরিন্দ্রিয় সকল কার্য্য না করিয়া জড়ভাব ধারণ করে। আমরা তো আর যমরাজকে যোগী করিতে বসি নাই। যমরাজের নির্ব্বাণ মুক্তি বা অনন্ত শক্তি লাভও আমাদের লক্ষ্য নহে। যমরাজের বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইলে আর তিনি সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না সুতরাং কাহাকেও তিনি তলপ করিবেন না। আর তলপ না করিলেই বা কে ইচ্ছা করিয়া যমপুরে যাইবে ? এর ফল এই হইবে যে এখন তবু আমরা ভাগের ভাগ দুই দশজন পাইতেছি, যমপুরী যোগরাজের আবাস হইলে, তাও যাইবে ; আমাদিগকে অনশনে জীবন হারাইতে হইবে। অতএব জিহ্বা ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইয়াও যমরাজ যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়ের পরিচালন দ্বারা লোকের প্রতি আধিপত্য খাটাইতে পারেন, তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। এই কথার পর, গুপ্তসভা গুপ্ততর রূপধারণ করিল, কাহারো মুখে আর কথা ফুটেনা, সকলেই নির্ব্বাক্।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিশাল দেহ একজন সভ্য গম্ভীর ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির মুখাবলোকন করত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আপনারা যে সম্পূর্ণ আত্ম বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝতে পারিতেছি, নতুবা এ অধীনকে আজি আপনাদের সমক্ষে বাচলতা করিতে হইত না। আমি প্রস্তাব করিতেছি, যে যমরাজকে

প্রত্যহ ষাইট গ্রেন করিয়া কুইনাইন দেওয়া হউক, তাঁহার ক্ষুধা অত্যন্ত মন্দা থাকিবে, অথচ তিনি গাত্রজ্বালায় যাত্রীগণকে অনবরত তলপ তাগাদা করিতে থাকিবেন। এই কথায় সকলেই স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চট্‌কা ভাঙ্গিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ইহাই সাধু পরামর্শ ; তখন সেই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল ; ও আনন্দে সভা ভঙ্গ হইল।

নবজীবন
মাঘ ১২৯৪।

২১
ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন

ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন বর্ণনা করার পূর্ব্বে ভোলাদাদা আমার কে? কি রকমের মানুষ ছিলেন? তাহা আপনাদিগের নিকটে না বলিলে চলিবে কেন? অতএব শুনুন।

ভোলাদাদা পূর্ব্ববঙ্গের লোক এবং সকল পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীর ন্যায় তিনিও স্বদেশ বৎসল ছিলেন কিন্তু তাঁহার দেশবাৎসল্য অনেকের অপেক্ষা কিছুমাত্রায় প্রবল ছিল। তিনি জানিতেন যে ঢাকার মতন সহর নাই, পদ্মানদীর ন্যায় বড়নদী নাই, বিক্রমপুরের লোকের ন্যায় বিদ্বান নাই, গণী মিঞা সাহেবের ন্যায় বড় মানুষ নাই, এবং তাঁহার নিজের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নাই। যে দিবস সংবাদপত্রে পাঠ করিলেন যে, আনন্দমোহন বসু ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঙ্গলার হইয়াছেন, সেই দিবস ভোলাদাদা দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিলেন, এবং অর্দ্ধ পয়সার বাতাসা কিনিয়া সন্ধ্যার সময় গ্রামের বালকদিগকে ডাকিয়া হরিলুঠ দিলেন এবং বলিলেন যে "এখন কল্‌কাতার বেটারা যাইয়া গলায় দরী দিয়া মরুক।" এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, আনন্দমোহন বাবু পূর্ব্ববঙ্গে জন্মিয়াছেন। কিন্তু ভোলাদাদার নিজের বিদ্যাসাধ্য ঢাকা কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে শেষ হয়, তথাপি তাঁহার অহঙ্কার ও সাহসের সীমা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে এমন চাকরী নাই যাহার জন্য তিনি দরখাস্ত করেন নাই।

ভোলাদাদা তাঁহার পিতৃঅস্থি গঙ্গায় দেওয়ার জন্য একবার কলিকাতায় গিয়া কয়েক দিবস কালীঘাটের বাঙ্গাল পাড়ায় থাকিয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে তিনি গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, লাটসাহেবের কুঠী, যাদুঘর এবং পশুশালা প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়াছিলেন এবং দুই একবার শেয়ারের গাড়ীতে কলিকাতায় দুই একজন

লোকের সহিত কথাবার্ত্তাও কহিয়াছিলেন, ইহাতেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে তিনি কলিকাতার সব দেখিয়াছেন, সব জানেন এবং সকল বড় বড় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছেন। সেইকথা প্রমাণার্থ তিনি সর্ব্বদা কলিকাতাবাসীর ন্যায় 'গেলুম, খেলুম' শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন যে উক্ত নগরের সভ্য সমাজে প্রতিনিয়ত থাকাতে তাঁহার কথা ফিরিয়া গিয়াছে। কথায় কথায় কেশব সেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেন যে, ঐ সকল মহোদয়েরা তাঁহাকে পাইয়া বড সম্মান ও সমাদর করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুপারিশে তিনি ছোটলাটের দ্বারা এক ডেপুটী মাজিষ্টেরী লইতে পারিতেন কিন্তু লবণাম্বু স্থানের জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়াতে, তিনি কলিকাতায় দীর্ঘকাল থাকিতে ও ঐ চাকরী হস্তগত করিতে পারিলেন না।

ভোলাদাদার রূপের ব্যাখ্যা কত করিব ? শরীর যদি তাঁহার কিঞ্চিৎ হৃষ্টপুষ্ট না হইত এবং অঙ্গে ভদ্রলোকের পরণ পরিচ্ছদ না থাকিত, তাহা হইলে কাওয়া বাগদীরাও তাঁহাকে স্বজাতির ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিত না; কিন্তু ভোলাদাদার মনে উল্টা ধারণা ছিল, তিনি আপনাকে আপনি বড শ্রীযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং কিসে রূপের আধিক্য হইবে, তৎপ্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। প্রত্যহ প্রাতে স্নানের পরে কোশাকুশী পুষ্পপাত্র প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম লইয়া তাঁহার পৈতৃক দীঘীর ঘাটের আধখানা জুড়িয়া বসিতেন, কিন্তু পূজাতে যত সময় ক্ষয় না হইত, তাহার অধিক সময়, তিনি একখানা চারি পয়সার টিনের পুরাতন আয়না সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে ঘাড় গুঁজিয়া আপনার মুখ দেখিতে ও ফোঁটা কাটিতে এবং একখানা কাষ্ঠের দ্বারা কেশবিন্যাশ করিতে ক্ষয় করিতেন। ঈশ্বর তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও কুরূপ করিয়াছেন বলিয়া ভোলাদাদা সকল সুন্দর ও গৌরবর্ণ ব্যক্তিকে হিংসা ও দ্বেষ করিতেন। এই জন্য তিনি গৌরাঙ্গদেবকে অবতার স্বীকার করিতেন না, বলিতেন যে, "গোরা ব্যাটা আবার কিসের দেবতা" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রং কালো ছিল বলিয়া তাঁহাকে তিনি পূর্ব্বাবতার বলিয়া মানিতেন এবং বলিতেন যে, "অবতার ত কৃষ্ণাবতার এবং দেবী ত মা কালী, আর সকল ঝুট।"

পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ নিয়মানুসারে ভোলা দাদাও অত্যন্ত পরিমিত ব্যয়ী ছিলেন এবং মুদ্রা তাঁহার এমনই প্রিয় এবং যত্নের দ্রব্য ছিল যে তাঁহাকে কেহ কখনও গোটা টাকা ভাঙ্গাইতে দেখে নাই এবং তাহা বাঁচাইবার জন্যে এমন কর্ম্ম ছিল না যাহা তিনি না করিতে পারিতেন। তাঁহার হিসাবের একটা দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ অরুচিকর ঘটনার রুচিধর্ব্বজী পাঠক তজ্জন্য আমাকে কৃপাপূর্ব্ব মার্জ্জনা

করিবেন। ভোলাদাদার পরিবারের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও একটী পুত্র। পুত্রটি বড় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভোলাদাদা ব্যয়ের ভয়ে তার এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পারেন নাই। পুত্রের গুণাগুণও পিতার ন্যায়, অতএব যৌবনের দোষ দমন করিতে তার ক্ষমতা হয় নাই। ২২।২৩ বৎসরের সময় সে একটী স্ত্রীলোককে টাকা অভাবে তাহার পিতার গৃহের দ্রব্যসকল চুরি করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভোলাদাদা দেখিলেন যে আজ বাক্সটা, কাল পিতলের কলসীটা, পরশ্ব তাঁহার স্ত্রীর এক জোড়া নূতন বস্ত্র অন্তর্ধান হইতে লাগিল এবং ভবিষ্যতে আরও ঐরূপ হইবে। পুত্রকে ধমকাইয়া নিবারণ করিবার সাধ্য নাই—বিশেষ লোকে শুনিলে পুত্রকে কেহ দোষী করিবে না, পিতাকেই দোষী সাব্যস্ত করিবে, কারণ তিনি পুত্রের এখনও বিবাহ দিলেন না, এবং সকলে ভোলাদাদাকে পুত্রের বিবাহ দিতে অনুরোধ করিবে; বিবাহ দিতে হইলে অন্যূন ৭।৮ শত টাকা ব্যয় হইবে, কিন্তু ভোলাদাদা প্রাণ থাকিতে এত টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন না। এমন সঙ্কটে তিনি উভয়কূল বজায় রাখার জন্য এক মতলব আঁটিয়া এক দিবস পুত্রের অসাক্ষাতে সেই স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে বলিবেন যে, "বাছা পচা, (ভোলাদাদার পুত্রের আদরের নাম) ছোঁড়া দেখিতেছি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এবং তুমিও শুনিলাম তাহাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাক, লুকাচুরি করিয়া তোমরা আর এইরূপে কতদিন কষ্ট পাইবে? আইস তুমি আমার বাড়ীতে যাইয়া থাকিবে চল, স্বামী স্ত্রীর ন্যায় থাকিবে, কোনও কষ্ট হইবে না।" স্ত্রীলোকটী সামান্য চাকরাণী শ্রেণীর স্ত্রীলোক। সে ভোলাদাদার কথা শুনিয়া হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বিছানা পত্র লইয়া ভোলাদাদার সঙ্গে ভোলাদাদার গৃহে যাইয়া সংস্থাপিত হইল। ভোলাদাদার একটী বেতনভোগী চাকরাণী ছিল কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী আসিবামাত্র ভোলাদাদা চাকরাণীকে জবাব দিয়া স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন যে, "বাছা তুমি যেখানে ছিলে, সেখানে ত আপনার কাজকর্ম্ম করিয়া খাইতে এই বাড়ীও এইক্ষণে তোমার বাড়ী হইল, অতএব গৃহস্থালীর সকল কাজকর্ম্ম তোমাকেই নির্ব্বাহ করিতে হইবে।" এইরূপে ভোলাদাদা তাঁহার চাকরাণীর বেতনগুলি বাঁচাইলেন, এবং পুত্রকে গৃহের দ্রব্য সকল অপচয় করার রোগ হইতে মুক্ত করিলেন। পুত্রের কিম্বা অপর সকল লোকের চোক্ষে ইহা একজন বেতনভোগী চাকরাণীর পরিবর্ত্তে আর একজন অবৈতনিক চাকরাণী আনিয়া নিযুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন ত আপনারা বুঝিলেন যে, আমার ভোলাদাদা কেমন সুবুদ্ধি লোক, তবে আর আমি ব্রাহ্মণ ভোজনের বিলম্ব করিব না। শুনুন।

পূর্ব্ববঙ্গের এক জেলার সদর স্থানে ভোলাদাদা এক চাকরী উপলক্ষ করিয়া

সপরিবার বাস করিতেন এবং সেই স্থানেই উপরোক্ত ঘটনা হয়। ভোলাদাদা কেবল তাঁহার বেতনের উপর নির্ভর করিতেন এমন নহে, তাঁহার স্ত্রীর নামে তিনি অনেক টাকার মহাজনীও করিতেন এবং তাহাতে বেতন অপেক্ষা তাঁহার বিলক্ষণ দশ টাকা আয় ছিল। ইতিমধ্যে একদিবস সংবাদ আসিল যে তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে। কি করেন একদিকে স্ত্রীর অনুরোধ আর একদিকে লোকনিন্দা এড়াইতে না পারিয়া অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তীর পর ভোলাদাদা একটি ষোড়শ করিতে ও দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বদিবসে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "ভাই আমি ত এই সকল কার্য্য কখনও করি নাই, অতএব এখানে আসিয়া কাল ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়াইতে হইবে।" তাহাতে আমি কহিলাম যে "তবে কি ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য একটা ফর্দ্দ ধরিতে হইবে?" তিনি উত্তর করিলেন যে, কেবল শাস্ত্র রক্ষা করিবার জন্য দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাওয়াইতে হইবে, তাহার আবার ফর্দ্দের প্রয়োজন কি, আয়োজন যাহা করিতে হইবে তাহা আমি নিজেই করিব; ভোজনের সময় কেবল তুমি আসিয়া পরিবেশন করিলেই যথেষ্ট উপকার হইবে।" আচ্ছা বলিয়া আমি সম্মত হইলাম এবং পরদিবস যথাকালে ভোলাদাদার গৃহে গমন করিলাম—দেখিলাম ঘরের এক কোণে একখানা ডালাতে আন্দাজ এক সের মোটা লাল চিঁড়া ও ছোট এক মালসা দধি, এক সের ক্ষীর, এক সের কদর্য্য গুড় ও এক সের অপকৃষ্ট চিনি, কয়েকখানা কলাপাতা ও কয়েকখানা কুশাসন সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ আয়োজনের স্বল্পতা দেখিয়া ইহার দ্বারা ১২ জন ব্রাহ্মণের ভোজন কার্য্য নির্বাহিত হওয়া কঠিন বলিয়া, আমি প্রকাশ করাতে ভোলাদাদা বলিলেন যে "না হয় আরও জিনিস বাড়ীর মধ্যে আছে, আবশ্যক হইলে আনাইয়া কার্য্য সমাধা করা যাইবে।" ইহা শুনিয়া আমি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম, ক্ষণকাল বাদে দেখিলাম যে একটি লাঠিতে ভর দিয়া একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভোলাদাদা তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং মুখুর্য্যা মহাশয় বলিয়া আহ্বান করিলেন। মুখুর্য্যা মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনেক কষ্টে আসনের উপর বসিলেন। দেখিলাম যে তাঁহার হস্ত পদ মাংস শূন্য, উদরটী স্ফীত এবং সেই উদরের বামভাগের উপরে তিন চারটী ক্ষতস্থানে তৈলাক্ত, তসায় পটি বসান আছে, মুখের রঙ পাণ্ডুবর্ণ এবং শরীরে বিন্দুমাত্র রক্তের চিহ্ন নাই। জানিলাম যে ব্রাহ্মণটী প্লীহা অগ্রমাস ও যকৃৎ রোগে আক্রান্ত এবং তাঁহার যা অবস্থা তাহাতে তিনি আর দীর্ঘকাল এইরূপ নিমন্ত্রণ খাইতে আসিতে পারিবেন, এমন বোধ হইল না। তাঁহার পরে দুই ব্যক্তি ক্ষক ক্ষক করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; ইহারা উভয়েই অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ; পঞ্জরের অস্থি সকল বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা এক একটি করিয়া গুনিতে

পারা যায় ; প্রত্যেকের গলায় কয়েকটি মাদুলী এবং বুকে পুরাতন ঘৃত লেপিত ছিল, ইহাদের একজনের যক্ষ্মা ও আর একজনের হাঁপানী কাশী। এই দুই ব্রাহ্মণ বসিতে না বসিতে চতুর্থ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার উদরী রোগে পেট ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে এবং তাহার উপরে সবুজ বর্ণের শিরগুলি ভূগোলের মানচিত্রের নদীর ন্যায় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিলম্বে পঞ্চম ব্রাহ্মণটী কর্ণের উপরে পৈতা উঠাইয়া "ভোলাবাবু ঘটি কৈ ? জলপাত্র কৈ ?" বলিয়া দ্রুতবেগে ঘরের মধ্য হইতে একা গাড়ু লইয়া বাহিরে গেলেন, বুঝিলাম যে ইনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছেন। ষষ্ঠ ব্যক্তি যিনি আসিলেন তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ভেড়ার রোমের এক একটী অঙ্গুরী এবং বামকর্ণে সূত্রদ্বারা এক কড়া কানা কড়ী ঝুলিতেছে। সপ্তম ব্যক্তি অতিশয় দুর্ব্বল দুই বাহুতে দুইটী গুল বসান আছে এবং দন্তগুলি মিসী দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন যে রসবাতে কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। অষ্টম ব্যক্তির আধকপালে শিরঃপীড়া। নবম ব্যক্তির অম্ল শূল রোগ ; আহার করিলেই বমন হইয়া সকল উঠিয়া যায়, কখন কিছুমাত্র ক্ষুধা হয় না। দশম ব্যক্তির বিসূচিকা রোগে জীর্ণ করিবার শক্তি এক কালেই লোপ পাইয়া গিয়াছে, এবং আহারের কিছুমাত্র অনিয়ম হইলেই পীড়ার আধিক্য হয়; এই যে দুই প্রহর বেলা হইয়াছে তথাপি তিনি যেন সদ্য আহার করিয়াছেন এইরূপ ঢেকুর তুলিতেছেন। একাদশ ব্যক্তির যদিও যথার্থ এবং দ্রষ্টব্য কোন পীড়া ছিল না, তথাপি তিনি মনে মনে আপনাকে সর্ব্বদাই অত্যন্ত পীড়িত বিবেচনা করিতেন এবং নিয়মিত আহার্য্য লঘু দ্রব্য ভিন্ন নূতন কোন দ্রব্য খাইতে হইলেই তাঁহার যৎপরোনাস্তি আশঙ্কা হইত। দ্বাদশ ব্রাহ্মণটী যুবা এবং বলিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বড় ওলাউঠা হইয়াছিল, এবং সেই পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত বাছিয়া গুছিয়া এবং সাবধান হইয়া আহার করেন। এই দ্বাদশটী মূর্ত্তি সমবেত হইলে পরে ভোলাদাদা আমাকে তাঁহাদের শুনাইয়া বলিলেন যে, "দেখ ভায়া ইহারা সকলে বড় সম্ভ্রান্ত এবং মহামান্য ব্রাহ্মণ, অশূদ্রক পরিগ্রাহক, কাহারও বাড়ীতে আহার করেন না। কেবল আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি ঠাকুরদের খুব করিয়া খাওয়াইবা যেন কোন বিষয়ে ক্রটি না হয়।" কিন্তু আমি দেখিলাম যে তাহাদের মধ্যে কেহই খুব করিয়া খাইবার লোক নয়, অধিকাংশের একখানা বাতাসা খাইয়া হজম করা দুষ্কর, তবে বলিতে পারি না, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণ না পারেন এমন কর্ম্ম নাই ; সহস্র পীড়িত হইলেও ব্রাহ্মণ ফলারে মজবুত। সে যাহা হউক, পরন্তু আমি পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণের পাতায় চিঁড়া দিতে উদ্যত হওয়ায় ; তিনি পাতার উপরে দুই হস্ত বিস্তীর্ণ করিয়া চিঁড়া দিতে

নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ যতই নিষেধ করেন, ভোলাদাদা ততই "দেও দেও" বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে বলিতে লাগিল যে, "ভোলাবাবু রক্ষা কর আমাকে চিড়া দিও না, চিড়া খাইলে অদ্যই ওলাউঠা হইয়া মরিব, আমি কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে যাই না, কেবল তোমার কয়েকটা টাকা ধারি বলিয়া সেই খাতিরে তোমার নিমন্ত্রণে আসিয়াছি, নচেৎ আমার এখন নিমন্ত্রণ খাবার সময় নহে, রক্ষা কর চিড়া দিও না।" তথাপি ভোলাদাদার "দেও দেও" শব্দ থামে না। এইরূপে আরও কয়েকজনে চিড়া লইলেন না, যাঁহারা লইলেন তাঁহারা কেহ এক মুষ্টি, কেহ অর্দ্ধ মুষ্টি লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। তামাসা দেখিলাম যে, যাঁহারা নিষেধ করেন, তাঁহাদের বেলাই ভোলাদাদা বারম্বার "দেও দেও" বলিতে লাগিলেন, কিন্তু যাঁহারা লইলেন তাঁহাদের সময় তিনি একটি কথাও বলিলেন না। পরন্তু দধি দেওয়ার সময়ও ঐরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল। এক বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেই দধি দেওয়ার সময় হস্ত দ্বারা পাতা ঢাকিয়া রহিল—বিশেষ যাঁহাদের কাশী ও রসবাত, তাঁহারা আমি তাঁহাদের নিকট দধি লইয়া উপস্থিত হইবা মাত্র "না না আমাদের দই দিও না, দই আমাদের বিষ দই খাইলে মরিয়া যাইব" বলিয়া নিষেধ করিলেন। ক্ষীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ, কেহ দুই ফোটা কেহ এক ফোটা মাত্র লইলেন। বস্তুত অধিকাংশ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এক কালেই কিছু খাইলেন না, কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য এক চিমটী গুড় কিম্বা চিনি মুখে দিয়া এক চোক জল পান করিলেন। এবম্প্রকারে ভোলাদাদার শ্বশুরের শ্রাদ্ধে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজনের কার্য্য সমাধা হইল। পরে জানিলাম যে উঁহারা সকলেই ভোলাদাদার খাতক এবং সেইজন্য তাঁহারা ভোলাদাদাকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের কেহই নিমন্ত্রণ খাইবার ব্যক্তি নহেন। দেখিলাম যে আহারের যে সকল দ্রব্য দেখিয়া অতি স্বল্প বিবেচনা করিয়াছিলাম, ফলে তাহা প্রচুর অপেক্ষাও অধিক হইল কারণ সকল দ্রব্যই কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া রহিল। ব্রাহ্মণেরা চলিয়া যাওয়ার পরে ভোলাদাদা হাস্য বদনে আমাকে বলিলেন "দেখলে ভায়া কেমন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম, শাস্ত্রও রক্ষা হইল এবং পয়সাও অধিক খরচ হইল না; এইরূপ না করিলে গৃহস্থালি চলে না।" আমি ভোলাদাদার পদধূলা লইয়া প্রস্থান করিলাম।

নবজীবন

বৈশাখ ১২৯৫

২২
ভূতের গল্প

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল কিন্তু কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না। একদিন বেজীবনের লেখক শ্রেণীর ভিতর আমার নাম ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুমতেই (বৈয়াকরণ মাপ করিবেন) আজি পর্যন্ত লেখা হয় নাই। হাড় বাহির করিতে পারি নাই।

* * *

কোন এক শহরে (নাম বলিব না কেন না, সত্য ঘটনা) একটি বাটী ছিল। ভূতের উপদ্রব আছে বলিয়া সে বাটিতে ভাড়াটিয়া জুটিত না। দৈব যোগে একদিন এক সাহেব সে শহরে আসিয়া উপস্থিত। সাহেব বড় Economical, হিসাবী সুতরাং কম ভাড়ার বাটী খুঁজিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিয়া কথিত ভূতের বাটীই তাঁহার পছন্দ হইল। সাহেব সস্ত্রীক ছিলেন। আপনার ডেরা ডাণ্ডা আনিয়া বাটীর ভাড়া লইলেন। সঙ্গে মেম সাহেব এবং একটি ছয় মাসের বাচ্চা।

বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সময় সাহেবের নাসা রন্ধ্রে, কি এক প্রকার গন্ধ বাবুর্চিখানা হইতে প্রবেশ করিল। ঢুকিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, জানিলেন, যে বাবুর্চি সুখাদ্য খিচুড়ী রাঁধিতেছে ও ইলিস মাছ ভাজিতেছে। সাহেব হুকুম দিলেন, “এই খাদ্য আমি ও মেম সাহেব খাইব ও খাইবেন।” বাবুর্চি তটস্থ। সাহেব বেড়াইতে গেলেন, সেই খাদ্য প্রস্তুত ও প্রচুর ঠাঁই করিতে বলিলেন। বাড়া হইয়াছে, এমন সময় খড়ম পায়ে, বৃহদাকার এক পুরুষ, নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া আসিয়া সেই খাদ্য ভোজন কারতে লাগিল। বলা বাহুল্য বাবুর্চির নিবারণ শুনিল না। তখন বাবুর্চি নিরুপায় হইয়া ও আগন্তুকের বৃহদাকার দেখিয়া, সাহেবের কাছে আসিয়া নালিস বন্ধ হইল। সাহেব কথা অবিশ্বাস করিয়া প্রথমত তাহাকে প্রহার করিলেন। তাহাতে তাহার প্লীহা কাটিল না দেখিয়া স্বয়ং যাইয়া ব্যাওরা দেখিলেন। ঘর হইতে রিবলবার আনিয়া পাঁচবার আগন্তুকের প্রতি গুলি করিলেন। গুলি লাগিল না। আগন্তুক এই খিচুড়ী খাইতেছে এই ইলিশ মাছ ভাজা খাইতেছে,—আবার খিচুড়ী খাইতেছে, আবার ইলিশ মাছ ভাজা খাইতেছে আবার দুই খাইতেছে নিশ্চিন্ত ভাবে খাইতেছে—কোন বাধা কেহ দিল না এইভাবে খাইতেছে আবার খাইতেছে চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে যেন অনন্তভাবে, অনন্ত খিচুড়ী

ও অনন্ত ইলিশ মাছ ভাজা অনন্তভাবে চিবাইয়া চিবাইয়া গিলিতেছে। তখন সাহেবের প্রাণে একটু আতঙ্ক হইল। আহার অবসানে আগন্তুক উঠিয়া দিল দুনিয়া সব আমারই এই ভাবে পা ফেলিয়া মেম সাহেবের কামরার দিকে শনৈ শনৈ গমন করিতে লাগিলেন। মেম সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিয়া সমস্ত আলো একেবারে নিভাইয়া দিলেন। সাহেব এবারে নিতান্ত অস্থির।

বাবুর্চিখানা হইতে আলো আনিয়া দেখিলেন, যে মেম সাহেবের খাটিয়া কড়ি সংলগ্ন। তখন সাহেব একেবারে উন্মাদ। মাধ্যাকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া মেম সাহেবের খাটিয়া কড়ি সংলগ্ন। এমন সময় বাবুর্চি আসিয়া বলিল "সাহেব আমি কোরাণ পড়িতে জানি পড়িব কি ?" সাহেব সম্মত হইলে পর বাবুর্চি সেই ঘরে জলদ গম্ভীর স্বরে কোরাণ পাঠ আরম্ভ করিল। সাহেব ও বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টার পর ঘড়ীর ছোট কাঁটার চালে সেই খাটিয়া নামিতে আরম্ভ করিল এবং শেষে মেজেতে নামিল। পরদিন প্রাতঃকালে সাহেব সেই বাটী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

* * * *

দিন যায়। রাত যায়। মাস যায়। বছর যায়—ভাড়াটিয়া জুটে না। কতদিন পরে একজন সাহেব সেই বাটীতে আবার ভাড়াটিয়া হইল। জমিদার বলিলেন কিছু দিন আগে বাটীতে বাস কর পরে এগ্রীমেণ্ট হইবে। তাই মঞ্জুর রাত্রি আটটা—সাহেব ব্যাচিলার অর্থাৎ অস্ত্রীক—বসিয়া আছেন। অদূরে খট্ খট্ করিয়া খড়ম পায়ে কে আসিতেছে। দেখিলেন বৃহদাকার এক পুরুষ। দেখিয়া কেদারা ছাড়িয়া আপন খাটিয়ায় চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। আগন্তুক আসিল এবং কেদারায় বসিল। আগন্তুকের চক্ষু সাহেবের উপর—সাহেবের চক্ষু আগন্তুকের উপর। এই ভাবে ১৫ মিনিট গেল। তখন আগন্তুক টেবিলের জিনিষ আদি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন টেবিলে একখানা ক্ষুর আছে। খশ্ করিয়া ক্ষুর ধরিয়া—গেলাস হইতে জল লইয়া ভাড়াটিয়া সাহেবের দাড়িতে মাখাইতে লাগিল। সাহেব নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তায় আকুল কিন্তু নাড়িলেনও না, চড়িলেনও না। এ গাল, ও গাল, গোঁফ দাড়ি, ঘাড় শেষে বগল সব কামান হইল কিন্তু নখ কাটা হইল না।

* * *

সাহেব খাটিয়ায় শুইয়া—আর আগন্তুক চেয়ারে বসিয়া। কিছুক্ষণ পরে খপ্ করিয়া উঠিয়া সাহেব আগন্তুকের গালে জল মাখাইতে আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক নিশ্চেষ্ট, নিস্পন্দ। কামান শেষ হইল। সাহেব আবার খাটিয়ায় শুইলেন, আগন্তুক আবার চেয়ারে বসিলেন, অনেকক্ষণ বাদে—

আগন্তুক বলিল, "বাঁচিলাম কি আরাম। ভূত হইয়া পর্য্যন্ত কামাইনি। আজ তোমার হাতে কামাইয়া বড আরাম হইল।

দেখ, এই বাডী আমার ছিল। আমাকে খুন করিয়া বর্ত্তমান জমিদার এই বাড়ী লইয়াছে। সেইজন্য আমি ভূত হইয়া উপদ্রব করি এবং কাহাকেও বাটীতে থাকিতে দিই না। কিন্তু আজ তোমার উপর বড সন্তুষ্ট হইয়াছি—তুমি সমস্ত ভূতের চুল কামাইয়া দিয়াছ, বাটী তোমায় দিলাম। কাঁঠাল তলায় যে টাকা পোতা আছে তাহাও তোমার হইল তুলিয়া লইও।"

না। কোন দোষ ত হবে না, জমিদার কি বলিবে?

ভূত। বিপদে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।

একদিন প্রাতঃকালে জমীদারের লোক ছয় মাস পরে ভাডার তাগাদা করিতে আসিল। সাহেব হুকুম দিলেন যে মারিয়া ভাগাইয়া দেও। তাহা হইল। পরে, জমীদার স্বয়ং আসিলেও তাহা হইল। তখন ফৌজদারী কার্য্য বিধির ধারানুসারে জমীদার জয়েণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট বাটী দখলের নালিস বন্দ হইলেন। নালিস—এজেহার —শমন—আসামী হাজির মোকদ্দামা। ফরিয়াদীর এজেহার অন্তে হাকিম আসামী-কে জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিলেন যে ভূতে আসামীকে বাড়ীটি দান করিয়াছে। হাকিম প্রমাণ আছে কি না আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আসামী বলিল "হাঁ আছে।" তখন হাকিম প্রমাণ তলব করিলেন। আসামী ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিল। তখন মট্ মট্ করিয়া শব্দ হইল। হাকিমজী চাহিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার টানা পাখার দারুণ পা ঝুলাইয়া কে এক জন বসিয়াছে। আসামী কহিল "ঐ আমার সাক্ষী।" হাকিমের সওয়ালে টানা পাখা আসিল আগন্তুক কহিল যে, "হাঁ সে আসামীর পক্ষে সাক্ষী বটে।" আরও কহিল যে সে একজন ভূত। জোবনবন্দী লইবার উদ্যোগ হইল। ভূত সাক্ষী কহিল "আমি হলফ পড়িতে পারিব না।" তখন হাকিম মহা বিপদে পড়িলেন। শেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে ব্রাডলার মত ভূত সাক্ষীকে সলেম্ আফরমেশন দেওয়া হইবে। ভূতের জোবনবন্দীতে প্রকাশ পাইল যে, সে বাটী আসামীকে দান করিয়াছে। সে তাহার বাটীতে ছিল এবং জমীদার তাকে হত্যা করিয়া বাটী অধিকার করিয়াছে। হাকিম তখন রুমাল সাহায্যে তিনবার ঘর্ম্ম মুছিলেন। পরে ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভূতসাক্ষীকে জেরা করিবে কিনা। ফরিয়াদীর উকীল জেরা করিতে অস্বীকার হইল। তখন হাকিম মহোদয় উভয় পক্ষের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া (তিনি ইষ্ট-তুচ্ছ-চুরি) আসামীর দখল বাসের আজ্ঞা দিলেন। ফরিয়াদী খরচা দিতে বাধ্য হইল।

শুনা যায় সে শহর কলিকাতা হইতে ৬৬ মাইল দূরে অবস্থিত, কিন্তু কোন দিকে তাহার কিছু নির্ণয় নাই।

হাড় বাহির হইল।

[খানিকটা বটে। নবজীবন সম্পাদক।]

নবজীবন

অগ্রহায়ণ ১২৯৫

২৩

সমালোচন বিভ্রাট।

জগু বাবু খাতা মুখস্থ করণে গাঢ় নিবিষ্ট।

জগু। (দুলিতে দুলিতে) মেকলে, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট্ স্পেন্সার ; মেকলে, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্বার্ট্ স্পেন্সার ; মেকলে, হার্বার্ট্ মিল, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ স্পেন্স্—আ-হা হা-হা ! দূ-র হোক্ গে ছাই—বেটাদের নামগুলো এমন বদ্ যে মুখস্থ কর্ত্তে না কর্ত্তে উল্টে পাল্টে একাকার হয়ে যায়। আর পোড়া কালও এমন পড়েছে যে, এমন লিখ্‌তে পারি, এমন কইতে পারি এমন সমালোচনা কর্ত্তে পারি এমন স-ব পারি, তবু সেই ইংরেজি দুএকটা বোল, দুএকখান বইএর নাম, দু একটা মানুষের নাম, এ না কর্ত্তে পারলে লোকে বাহবা দিতেই চায় না !

(রঘুর প্রবেশ।)

আসতে আজ্ঞা হয়, রঘু বাবু। কবির সঙ্গে তিন তিনটা দিন দেখা না হওয়া আমি বড় দুর্লক্ষণ মনে কচ্ছিলেম।

রঘু। (উপবেশনান্তে) মনে করলে দুর্লক্ষণের হাত এড়াতে না পারতেন এমন বোধ হয় না।

(কানাই এর প্রবেশ)

কানাই। বেশ হয়েছে আজ আপনারা দুজনে উপস্থিত আছেন ; দেখে শুনে আমার বই এর যা হয়, একটা এস্পার ওসপার ক'রে দিন।

জগু। তাই ত, আপনাকে আজ আসতে বলেছিলেম বটে, কিন্তু আমার হয়েচে কি জানেন, অবকাশ আজকাল বড় কম। অনেক লিখ্‌তে হয়, ভাব্‌তে হয়, মেলা ইংরেজি বই পড়তে হয়, কখন্ আপনার বই দেখি ?

রঘু। (কানাই এর প্রতি) কি বই ? সে দিন যে উপন্যাস খানি এনেছিলেন সেই-খানি নাকি ?

কানাই। আজ্ঞে হাঁ, সেইখানি। তা দেখুন. আজ আপনারা দুজনেই আছেন. এমন সুবিধে সব দিন হবে না।

জগু। তা আচ্ছা, আজ যতটা হয় হোক্। তা আপনিই পড়ুন, আমরা শুনে যাই।

কানাই। (পুস্তক খুলিয়া) "বিজয় গ্রামের একটি পর্ণকুটীরে জনৈক বৃদ্ধা বাস করিতেন—

জগু। ও হ'ল না, উপন্যাস ধরাই হোল না :

রঘু। ও হ'ল না, হ'ল না।

কানাই। তবে কি ক'রে ধরবো বলুন।

জগু। উপন্যাস লেখা কি আপনি সহজ মনে করেন. মশায় ? আপনি মেকলের এ-টা পড়েন নি ?

কানাই। কি-টা বলুন দেখি ?

জগু। ঐ যে এ-টা, বেশ নামটি. মনে পড়চে না। তা যাই হোক. সে-টা কি আপনি পড়েন নি ?

কানাই। কি-টা বল্‌চেন ভাল বুঝতে পাচ্চিনে তা উপস্থিত স্থলে কি দোষটা হয়েছে সেটাই বলুন না কেন ?

জগু। দোষটা কি হয়েছে জানেন ও উপন্যাস ধরাই হয়নি। (একটু ভাবিয়া) ভাল, ঐ বুড়ী বই কি ওদের ঘরে আর কেউ ছিল না ?

কানাই। হাঁ—ছিল, তা এর পরেই জানতে পারবেন :

জগু। কে ছিল ?

কানাই। একটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী কন্যা—দুঃখের সময়ে বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন।

জগু। বেশ ছিল। আপনার উপন্যাসে জিনিস আছে; কিন্তু আপনি তা সাজাতে পারেন না।

কানাই। তা ভাল, কি ক'রলে সাজে তাই না—হয় বলুন ?

রঘু। ঐখান থেকেই উপন্যাস ধরুন।

কানাই। কোন্‌খান থেকে ?

রঘু। ঐ যে ঐ দুঃখের সময়ে একমাত্র অবলম্বন—

কানাই। তা এখন কি ক'রে হবে ?

জগু। কেন ? ধরুন—“বিজয় গ্রামের একটি অট্টালিকার বাতায়নে জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয়া বালিকা আজ কি ভাবিতেছিল—”

কানাই। অট্টালিকা তো ছিল না—অট্টালিকা কোথা পাবে ? আপনাকে ত বল্লুম একটি পর্ণকুটীরে—

রঘু। ছি ছি ছি, আপনি কবি হ'য়ে এমন কথা বল্‌চেন ? অট্টালিকা সেত আপনার হাত—বিশেষ তাতে যখন খরচ পত্র কিছুই নেই, তখন আপনি কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন ?

কানাই। কুণ্ঠিত কি জানেন, বইখান লিখে শেষ করেছি, মিছামিছি মাঝখানটা তুলে নিয়ে এসে গোড়ায় লাগিয়ে দিয়ে—সে আবার এখন একটা কি হবে ?

জগু। ঐ ! ঐটি বোঝেন নি বলেই ত এত গোল। সামান্য গল্প আরাম্ভ করার চেয়ে উপন্যাস আরাম্ভ করার যে একটু কৌশল, একটু কারদানি আছে, সেটুকু সকলে জানে না।

কানাই। বল্লেও কি বুঝ্‌তে পারব না ?

জগু। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি। আপনি আইভ্যান-হো—আচ্ছা তার দরকার নেই. আপনাকে একটা ছোট বই থেকেই বুঝিয়ে দিচ্চি. গল্প কি রকম জানেন ? যেমন—

“যাদব নামে একটি বালক ছিল। তার বয়ক্রম নয় বৎসর। সে পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত। স্কুল হইতে সমপাঠীদের কাগজ কলম চুরি করিয়া আনিত। শিক্ষক মহাশয় এই দোষে তাহার নাম কাটিয়া তাড়াইয়া দিলেন।”

—বুঝতে পাল্লেন ?

কানাই। তা বুঝ্‌লেম। এখন একে নিয়ে উপন্যাস আরাম্ভ ক'রতে হবে কি রকম কারদানি ক'রে বলুন।

জগু। উপন্যাসের বেলা পৈত্রিক নিয়মানুযায়ী 'যাদব নামে' বলে গোড়া থেকে. আরাম্ভ করলে চলবে না।

কানাই। তবে কি করতে হবে ?

জগু। তখন আপনাকে ঐ 'চুরি করা' থেকে ধরতে হবে। তারপর তাকে নিয়ে পথে পথে খেলিয়ে বেড়াতে হবে ; তারপর তার বয়ক্রম নয় বৎসর হবে ; তার পরে. সে যাদব হবে। শেষে যখন দেখ্‌বেন সে যাদব হ'ল, তখন উপসংহারে যেমন আছে—নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেই উত্তম উপন্যাস হবে।

রঘু। এথ তা জানি ! (একটু চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে) কিন্তু, জগু বাবু ! যাদব রিক ররাদরুণ দণ্ডটা পাবে কি ? তাহ'লে উপন্যাসে ধর্ম্ম ভাবটা এসে পড়ে না ?

জগু। হাঁ হাঁ, ভাল মনে ক'রে দিয়েছেন। বটে বটে, নাম কেটে তাড়ালে চল্‌বে না!

কানাই। তবে কি তাকে কোলে ক'রে নিয়ে নাচ্‌তে হবে?

জগু। আঁ—আঁ, কোলে ক'রে নিয়ে নাচবেন?—না, তা কেন? কি বল হে, রঘু বাবু!

রঘু। ভাল, তার জন্য আট্‌কাচ্ছে না, ও কিছু কঠিন কথা নয়, ওটা আপনাকে এখনি বলে দিচ্চি!

কানাই। কি বলুন?

রঘু। আচ্ছা, তার জন্য ব্যস্ত কি? ততক্ষণ আর একটা জায়গাই পড়ুন না শুনি?

কানাই। (কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে একটা জায়গা খুলিয়া) শুনুন—"নিদাঘ রজনীর নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে; মলয়ানিল ধীরে ধীরে বহিতেছে; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল কুটীরের সম্মুখে তেঁতুল গাছের তলায় একটি পলায়িত গাভী রোমন্থন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে হম্বা রব করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।"

জগু। ঐ দেখুন, হ'ল না!

রঘু। ঐ দেখুন, আপনি কি কর্‌তে গিয়ে কি করে ফেল্লেন!

কানাই। কেন মহাশয়! এতে কি দোষ হ'ল আবার?

জগু। আগেই ত ব'লেছি আপনি সব জিনিস ধরে টান দেন, কিন্তু সাজাতে পারেন না।

কানাই। কি কর্‌লে তবে সাজ্‌তো বলুন?

জগু। সাজ্‌তো? বলি, গাভীটে ওখানে কেন? ঐ বিজয়গ্রামে কোকিল কি ছিল না?

কানাই। তা কেন থাক্‌বে না?

জগু। তবে কি ম'রে ছিল?

রঘু। এমন জ্যোৎস্নালোকে যদি তাকে পাওয়া না গেল, ত সে থাকায় ফল কি? তেমন কোকিলের বাপ নির্ব্বংশ হোক্ না?

কানাই। সে যা হোক্, এই—না আর কিছু ভুল আছে?

জগু। ভুল ভুল কি? ঐ ত এক বিষম ভুল—গাভী ওখানে থাক্‌তেই পারে না।

রঘু। ওর বাবার সাধ্য কি 'কুহু কুহু' রব করে?

কানাই। তা এখন কর্‌তে বলেন কি?

জগু। এখনি ও পাভীটে কেটে দিয়ে ওখানে 'কোকিল' ক'রে দিল।

রঘু। 'হম্বা' টা কেটে 'কুহু কুহু' ক'রে দিল।

কানাই। ভাল, তা হল, আর কিছু কর্ত্তে হবে ?

রঘু। ও গাছটা বদ্‌লাতে হবে।

কানাই। বদ্‌লে কি কর্‌ব ?

রঘু। 'তমাল' করে দিন।

কানাই। তাও হ'ল।

জগু। এবার একবার পড়ুন দেখি ?

কানাই। "নিদাঘ রজনীর নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে ; মলয়ানিল ধীরে ধীরে বহিতেছে ; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল কুটীরের সম্মুখে তমাল গাছের তলায় একটি পলায়িত কোকিল রোমন্থন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কুহু কুহু রব করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।"

জগু। হাঁ অনেকটা হ'য়ে এসেছে।

রঘু। অনেকটা ; কিন্তু কোকিল কি যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ?

জগু। হাঁ হাঁ, ঐটা 'নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে না' ক'রে দিতে হবে।

কানাই। আজ্ঞে, আজ তবে এই অবধিই ভাল, আবশ্যক হয় ত আর একদিন তখন এসে ভাল ক'রে সব জেনে যাব।

রঘু। না না, তা হয় কি—কোথা যাবেন—বসুন বসুন ! ঐ যে কবিতার মতনও একটা কি দেখা যাচ্ছে ?

জগু। হাঁ হাঁ, বসুন বসুন—আজ আমরা দুজনেই আছি—ঐ যে ও একটা কি দেখা যাচ্ছে ?

কানাই। ও একটা ঐ উপন্যাসেরই কবিতার মত কয়েক ছত্র।

রঘু। ভাল ওটা পড়ুন দেখি ?

কানাই। আচ্ছা—তবে না হয় শুনুন :—

উৎসবের হাসি গিয়াছে ফুরায়ে,
হাহারব শুধু নিশি দিন,
শ্যাম বিনে আজ আঁধার সকল,
গোকুল যেন প্রাণহীন।

রঘু। থাক্ থাক্, ও আর বল্‌তে হবে না, বোঝা গেছে—বোঝা গেছে !

কানাই। কেন কি হ'ল মশায় ! শেষ হতেই দিন—এর মধ্যেই কি বুঝলেন ?

জগু। কবিতার ও রকম নিয়ম নয়, (রঘু বাবুর দিকে ফিরিয়া) কি বল রঘু বাবু ?

রঘু। ও ত কবিতাই হল না—'সজনি' নেই, 'বাঁশী' নেই, 'স্বপন' নেই, 'কি-যেন-াক' নেই—আর ওর সবই ত বুঝতে পাল্লেম।

কানাই। বুঝতে পাল্লেন—তাতে দোষ হ'ল কি ? সেটা ত বোধহয় ভালই হোল।

রঘু। আজ্ঞে, না মহাশয় ! প্রকৃত কবিতা—হৃদয়ের কবিতা যে কি তা আপনারা মোটেই বোঝেন না, তাই এমন কথা বলচেন।

কানাই। তবে কি আপনি বলতে চান, যা বুঝতে না পারা যায় সে গুলোই ভাল কবিতা।

জগু। অনেকটা তাই বটে, (রঘু বাবুর প্রতি) কি বল রঘু বাবু ?

রঘু। নিশ্চয়ই তাই। আপনি বোধ হয় ইংরেজি কবিতা বেশী পড়েন না ? ইংরেজিতে এমন ঢের ভাল কবিতা আছে, আমরা ত এখনও তা বুঝতে পারিই নাই, তা ছাড়া মাষ্টারমশাই বলেছিলেন যে, ইংরেজদের ত জাতি ভাষা—তারাও বুঝতে পারে না।

কানাই। ভাল যদি তাই-ই হয়, তা হ'লেই কি এমন প্রমাণ হ'চ্চে যে সরল হলে, বোঝা গেলে, সেটা কবিতা হবে না ?

রঘু। হাঁ তাই বটে, তবে ঠিক তাই নয়। ইংরেজি ভাষায় এমন অনেক সরল কবিতা আছে যে পড়লে বা শুনলে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। আমার এমন সহস্র সহস্র কবিতা মুখস্থ আছে।

কানাই। একটা শুনতে পাইনে ?

রঘু। তা এখনি বলতে পারি, আজ পারি, কাল পারি, আপনার যে দিন-যখন ইচ্ছা শুনতে পারেন।

কানাই। তা একটা এখুনি বলুন না ?

রঘু। তা কেন বলতে পারবো না ? এখনি পারি, আজ পারি, কাল পারি—আপনি কি মিথ্যা কথা মনে কচ্চেন ?

কানাই। এ আপনি কেমন বলচেন ? মিথ্যা মনে করবো কেন—আমি একটা শুনবো বলেই ত আপনাকে বলতে বলচি ?

রঘু। আচ্ছা বলচি। আপনি ড্যান্টির এ-টা পড়েছেন ?

কানাই। কিটা ?

রঘু। আচ্ছা, তার আর কাজ নেই, আপনাকে সমাস্ত বই থেকেই একটা শোনাচ্ছি, কবিতাটা কেমন চমৎকার দেখুন দেখি.! কবিতা আছে।—

Thirty days have September,
April, June and November ;
February hath twenty eighet alone,
And all the rest have thirty-one ,

কানাই। (একটু হাসিয়া) এটা কি বড়ই সুন্দর কবিতা ?

রঘু। আপনি বুঝতে পাচ্চেন না ?

জগু। (কানাইএর প্রতি) বলেন কি মশাই, একি কম কবিতা ? আপনি এতে কবিত্ব দেখতে পাচ্ছেন না ? এর যে অক্ষরে অক্ষরে কবিত্ব, বিশেষতঃ—তৃতীয় পংক্তিটা পড়ুন দেখি “February hath twenty-eight alone”—উঃ, কি গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস ! এই অসার সংসারে এইক্ষণ ভঙ্গুর মানব জীবনে ফেব্রুয়ারির কি অল্প পরমায়ু! আমি যখনি ফেব্রুয়ারির কথা মনে করি, তখনি অবসন্ন হ'য়ে পড়ি ! উঃ, আপনি এখন ভেবে দেখুন দেখি, এতে কি কম কবিত্ব—কম উচ্ছ্বাস—কম আধ্যাত্মিক ভাব ! এ লিখ্‌তে কি কম ফিলজফির দরকার ?

কানাই। তা ভাল, এবার থেকে না হয় ঐ রকম লিখ্‌তে চেষ্টা করবো। আজ এখন তবে আমি চল্লেম মহাশয়। (কানাইয়ের প্রস্থান।)

রঘু। আমি এখন তবে আসি। (রঘুর প্রস্থান)

জগু। (পকেট হইতে খাতাটুকু বাহির করিয়া তুলিতে তুলিতে) মেকলে, জন ষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্বার্ট স্পেন্সর (ইত্যাদি মুখস্থ করণ)।